সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সাহিত্যের সেরা গল্প

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সাহিত্যের সেরা গল্প

দীপ প্রকাশন

১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

Sahityer Sera Galpa

A collection of bengali short-stories

by Sayed Mustafa Siraj

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৭ ◆ প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : মার্চ ২০১৩

পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১৮

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল

দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : কল্পনা অফসেট প্রাঃ লিঃ, কলকাতা - ৭০০ ০১৫

গল্পক্রম

সাহিত্যের সেরা গল্প

এই মুহূর্তে সিরাজ

"এখন একটা কষ্ট হয়, কত কথা বাকি রয়ে গেল—এখন মনে হচ্ছে আরো কত কী লিখতে পারতাম—কিছুই যে বলা হল না। ইদানীং প্রচণ্ড একটা কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ করে কেন জানিনা আমার সমস্ত অতীত আমার সামনে হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ছে। মনে হচ্ছে যা লেখা হয়নি, যা লেখা হল না, তা ঝটপট লিখে ফেলি। কিন্তু সময় বড় নিষ্ঠুর। তার ওপর আমার এ জীর্ণশীর্ণ শরীর—মনের ক্ষমতা থাকলেও শরীরের ক্ষমতায় আমি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছি। মনের মধ্যে কে যেন আমায় বারবার বলছে, 'ক্ষমতা নেই'—অথচ একটা দুর্নিবার প্রেরণা বা শক্তি আমার শরীরেই উৎসারিত হচ্ছে। আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে চাইছে।"

এই ভাবেই সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ সেদিন সকালে তাঁর কথোপকথন শুরু করেছিলেন। যিনি নিজেকে 'বক্তব্যজীবী' লেখক বলে বরাবরের একটা ঘোষণা করে দিয়েছেন, আর যার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সমস্ত সাহিত্য সাধনার ভিত্তি—জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে সেই মানুষটি পুনরায় নব উদ্যোগে শুরু করতে চাইছেন তাঁর লেখনী—কোন এক অজানা অতৃপ্তিতে তাঁর মনে হচ্ছে "কিছুই তো হল না বলা।' এর কিছুদিন আগেই সিরাজ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। রোগ শয্যায় জীবনমরণের লড়াই-এ তিনি জিতলেও ফিরে এসেছেন চুড়ান্ত দুর্বল এক শরীর নিয়ে। ক্ষমতা এমনই যে দুই আঙুলের চাপে কলমটিকেও পূর্বের মতো আর সামলে উঠতে পারছেন না। জীর্ণ ফুসফুস দুটিও উগড়ে দিয়েছে রক্ত—শিউরে উঠেছেন সবাই। তবে শেষ রক্ষা হয়েছে। গভীর রক্তপাতের মধ্যেই সিরাজ আবার তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন। সেদিন বললেন, গল্পের যে বোধ ও সৃষ্টির যে প্রেরণা নিয়ে তিনি তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন তা থেকে আজ পর্যন্ত তিনি সরে আসেন নি। রাস্তাটা একই রয়েছে—অনেকটা দীর্ঘ, কিছুটা বা দুর্গম কিন্তু এঁকে বেঁকে এগোলেও তিনি একই জায়গায় রয়ে গিয়েছেন। 'আমার লাইন অব অ্যাকশান চেঞ্জ হয় নি।' হয়ত সে কারণেই বিদগ্ধজনে ও সুধী পাঠক সিরাজকে গভীর উপলব্ধির বক্তব্যজীবী লেখক বলেই স্বীকার করেন।

সেদিন বললেন, শারদীয়া আজকালে সন্দীপনের (চট্টোপাধ্যায়) ডাইরি পড়ছিলাম। ওর মৃত্যুর পর বেরিয়েছে, ও ঠিকই বলেছে তৃতীয় ছবি এমনই উঠে আসে। তবেই মৌলিক কাজের সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ জীবন, মানুষ, সময়, স্থিতি ও কাল আমার গল্পের বিষয়। নগর জীবনও আমি একই চোখে দেখেছি। গ্রাম ও নগর জীবনের যে দ্বন্দ্ব, যে বৈপরীত্য আর যে সংঘাত তা আমার চোখের বাইরে কখনই যায়নি। কিন্তু এই দুটি ছবির পাশাপাশি আমরা কি পারলাম নিজস্ব কোন এক তৃতীয় ছবি তৈরী করে নিতে সন্দীপন এই চেষ্টার কথাই বলেছে।

গ্রামীণ জীবন নিয়ে সিরাজ কম লেখেননি। কিন্তু তবুও এই মুহূর্তে তাঁর মনে হচ্ছে তৃতীয় একটা ছবির প্রয়োজন ছিল। হয়তো ইতিহাসের গর্ভে থেকে যায় এই তৃতীয় ছবি। লেখকরা শুধুমাত্র তাকে তুলে আনেন পাঠকের চোখের সামনে। সেদিন সিরাজ নিজেই স্বীকার করেছেন যে সিঙ্গুরের ঘটনা কখনোই কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। তা জীবনেরই একটা ভিন্ন আঙ্গিক এবং কঠোর সত্য।

'দীর্ঘকাল আমি গ্রামে কাটিয়েছি। চাষীদের আমি চিনি, জানি। জমি তাদের কাছে মায়ের মতো। সিঙ্গুরের চাষীদের জমি নিয়ে যে যন্ত্রণা তা কারোর ব্যক্তিগত যন্ত্রণা নয়, তা সমাজের, যার আধার সাহিত্য। একদিন যারা উদ্বৃত্ত জমি পেল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে আজ তাদেরই জমি ছেড়ে দিতে হল। যে জমি ছিল বাঁচার জন্য তা হয়ে গেল আজ লড়াইয়ের ময়দান।'

সিঙ্গুরের ঘটনা যে সিরাজের মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে তা আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি অবশ্য এজন্য সরকার বা বিরোধী কোন পক্ষকেই দায়ী করতে চান না। তাঁর মতে সিঙ্গুরের ঘটনাই ইতিহাসের এক জঘন্যতম আত্মপ্রকাশ।

'আমার একটা গল্প আছে। সেখানে নায়ক এক খোঁড়া চাষী। সে জমি পেয়েছিল, ঘটনাক্রমে তার জমি গেল, তার বউ ছিল, একটা বাচ্চা ছিল। ভূমিহীন হলে তার বউ তাকে ছেড়ে গেল, বাচ্চাটিও রইল না। এমন যন্ত্রণার গল্প আমি লিখেছি। আমি ভাগ্যবাদী নই। তবে জীবনে যা ঘটছে তা কোনটাই হয়তো আমাদের হাতের মধ্যে নয়। এখানেই হয়তো আমাদের সেই তৃতীয় ছবি তৈরী হয়। যখন ভাবি সিঙ্গুরের মতো ঘটনা ঘটে কেন? তখন আমায় অনেক প্রশ্ন হন্ট করে। হয়তো কোনো ঐতিহাসিক মুহূর্তে সেইসব প্রশ্নের উত্তর পাব। আমরা সকলেই দুটো ছবি দেখেছি পাশাপাশি। 'উড়ো চিঠি' বলে আমার একটা গল্প আছে, যার মধ্যে গ্রাম জীবনের অতীত সামাজিক ঐক্যের কথা বলতে চেয়েছি। কার্ল মার্কস ভারতীয় সেই জীবনকে উদ্ভিদের জীবন বলেছেন। এই গল্পে উদ্ভিদের লক্ষ্মণ সবই আছে কিন্তু তা সত্বেও মানবতার যে উচ্ছ্বাস আছে তা দূরে বসে মার্কস টের পান নি।

এখানে, সাহিত্যের সেরা গল্পের ভূমিকায় সৈয়দ মুজতবা সিরাজ নামের মহতী কথা সাহিত্যিকের জীবনী লেখার সুযোগ বড়ো কম। করলে তা পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট হত। বরেণ্য এই লেখকের জনপ্রিয়তা এমনই যে তার জীবন, কাল, সাহিত্য, রচনার খুটিনাটি তথ্য প্রায় সকলেরই জানা। আমরা স্বল্প পরিসরে তার ভাবনার একটা মুহূর্তকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র।

সিরাজ বক্তব্যজীবী লেখক হলেও তিনি যে গভীর উপলব্ধির লেখক তা তাঁর গল্প পাঠ করলেই বিদগ্ধজন তো বটেই, এমনকি সাধারণ পাঠক ও বুঝতে পারেন। তাঁদের কৌতূহলও তাই সীমাহীন। সিরাজের উপলব্ধির গভীরতা এমনই যে তাঁকে নিয়ে জানার শেষ হয় না—তাঁকে ছুঁয়ে ছোঁয়া দুরূহ। সিরাজের লেখার বিষয়ও কোনো লক্ষ্মণরেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—

তার সাহিত্য রচনা বৈচিত্র্যময়তায় পূর্ণ। এই সংকলনে সিরাজের বেশ কয়েকটি বক্তব্যমূলক গল্প রয়েছে।

সঙ্গতকারণেই তাত্বিক ও সাহিত্য সমালোচকরা সিরাজকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং পরবর্তী তিন বাঁড়ুজ্যের উত্তরাধিকারী বলেন। নিজেকে বক্তব্যজীবী লেখক বলতে চেয়ে সিরাজ উপলব্ধির কথাই হয়তো বুঝিয়েছেন কেন না বক্তব্যের উত্তরাধিকার তার সাহিত্যে থাকলেও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে পেরেছেন। তাই মানব জীবনের কথার সঙ্গে সঙ্গে মানব জমিনের গাঢ় উপলব্ধি তার সাহিত্যে প্রকট ও রহস্যময়। তবুও এখনও সহজেই সিরাজ বলতে পারেন যে তাঁর দিক পরিবর্তন হয় নি। বহুপথ পরিক্রমা করেও সঠিক জায়গাতেই রয়ে গিয়েছেন। সময়ে, কালে শুধু পরিবর্তিত হয়েছে অভিজ্ঞতার ভাষা। কখনো তা রঙিন কখনো সাদা কালো। যে কারণেই আশ্চর্য মানুষগুলি তার গল্পের চরিত্র হয়। এখানে তিনি একান্ত নিজস্বের। কোনো ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের প্রায়

পাশাপাশি হেঁটেও তিনি আকর্ষণীয় এক 'অলীক মানুষ' এর জনক শুধু দশবারোটি গল্প দিয়ে সিরাজকে চেনানো যায় না— যে চেষ্টাও এখানে করা হয়নি। কেবলমাত্র 'লালীর জন্য' গল্পটি পড়লেই বোঝা যায় বিশ্বসাহিত্যে বরেণ্য লেখকদের সারিতে সহজেই সিরাজ তাঁর স্থান করে নিতে পারেন। সিরাজের যে কোনো গল্পেই পাঠক তাঁর গভীর উপলব্ধির সঙ্গী হয়ে ওঠেন।

আমাদের আশা সিরাজ তাঁর সেই 'তৃতীয় ছবি' এখনো না আঁকতে পারার আক্ষেপ থেকে খুব শীঘ্রই নিজেকে মুক্ত করবেন।

কল্যাণ মৈত্র

বীরেন্দ্র দত্ত

বন্ধুবরেষু—

হরবোলা ছেলেটা

সকাল থেকে সাদেরালির মনে ধাঁধা, ছেলের পেণ্টুল কাচতে গিয়ে পকেটে কাঁইবিচির সঙ্গে একটা দু টাকার নোট পেয়েছিল।

বছর দশেক বয়েস হল ছেলেটার। এখনও মাঝে মাঝে বিছানা ভেজায়। শোবার আগে মাথায় ফুঁ, তুকতাক, পীরের সিন্নি, মৌলবির তাবিজ, এমন কী মা ষষ্ঠীর থানের ধুলোতেও ফল ফলেনি।

পাশের বাড়ির আয়মন বুড়ির এক পেল্লায় মোরগ আছে। ভোরবেলা দরমা থেকে ছাড়া পেলেই সে সাদেরালির খড়ের চালে নখের আঁচড় কাটতে কাটতে মটকায় ওঠে। আর তক্ষুণি টের পায় সাদেরালি। তার কলজেয় নখের আঁচড় পড়ছে খর খর খর খর। একঠেঙে ভিখিরী-সিখিরী মানুষ সে। ক্রাচে ভর করে কষ্টেসিষ্টে সারাটা শীতকাল মাঠে মাঠে ঘুরে চেয়েচিন্তে ওই খড়গুলো এনেছিল। আয়মনের মোরগ চালটা ঝাঁঝরা করে ছেড়েছে। মটকায় চড়ে বাং দিলে পাড়ার মুর্গির ঝাঁকও তার সঙ্গে প্রেম করতে আসে।

তাই রোজ ভোরে সাদেরালির প্রথম কাজ মোরগ তাড়ানো। দ্বিতীয় কাজ কাঁথাকানির তলায় হাত চালিয়ে ছেলের পেণ্টুল পরখ। ভিজে থাকলে ছেলের ঘরপালানী মায়ের নামে একনাগাড়ে গালমন্দ দেয়। শুকনো থাকলে ওর কপালে হাত রেখে ডাকে, সোনা রে! মানিক রে! হরবোলা রে!

হরবোলা বলার কারণ, ছেলেটা পাখপাখালি আর জন্তু জানোয়ারের ডাক নকল করতে পারে। যখন আপন মনে একলা হেঁটে যায়, দুপুরবেলার নিঃঝুম ঘোরলাগানো ঘুমঘুম স্বরে ঘু ঘু ডাকে—ঘু ঘু ঘু...ঘু ঘু ঘু। ওই তার যেন নিজের ডাক।

আগে জীবন্তীর বাজারে বেড়ালের ঝগড়া শুনিয়ে দুটো লেবনচুস কী একটা জিলিপি রোজগার করত। রিকশোওলারা কুকুর শেয়ালের ডাক শুনতে চাইত। এক গেলাস চায়ের লোভে ছেলেটার কচি গলা চিরে যেত। সাদেরালি বারণ করেছিল। খামোকা গলার কষ্ট করা। লোকেরা মাঙনি আমোদ লুটতে চায়। দুনিয়া জুড়ে খালি আমোদগেঁড়ের ভিড়।

আজকাল বাপব্যাটা আলাদা হয়ে বেরোয়। খোঁড়া মানুষ। খানতিনেকের বেশি গাঁ ঘুরতে বেলা গড়িয়ে যায়। আর ছেলেটা ধুকুর ধুকুর হেঁটে পাঁচ-সাতটা গাঁ সেরে আসে। বাজারের মুখে খালের ধারে বটতলায় দুজনের দেখা হয়। ওখানেই সকালবেলা ছাড়াছাড়ি, সন্ধেবেলা ফের দেখা। কাল সাদেরালি ভেবে সারা হচ্ছিল। মাঠে তখন বুনোপায়রার পাখনায় মুখ গুঁজে থাকার মতো ছাইরঙা সন্ধেবেলাটা ঝিম মেরে আছে। গাঁয়ের গোরস্থানে শিমুল গাছটা কুয়াশার জোব্বা আর টুপি পরে নমাজে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা। এমন সময় খালের ওপরে কোথাও ঘুঘু ডাকল। ঘু ঘু ঘু...ঘু ঘু ঘু। সাদেরালির বাপের হৃদয় খুব নাড়া খেয়েছিল।

কিন্তু তখনও টের পায়নি ওর পেণ্টুলের পকেটে একগুচ্ছের তেঁতুল বিচির সঙ্গে একটা লালচে নোট আছে।

একসঙ্গে কে ওকে দু-দুটো টাকা দিতে পারে, কে এমন দয়াল দাতা, সাদেরালির মনে পোকা ঢুকেছে। বটতলা থেকে বাজার, বাজার থেকে কয়েক একর নীচু মাঠ পেরিয়ে বাড়ি পৌঁছনো অব্দি ছেলে তাকে সারাদিনের পুরো বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে বলতে ভোলে না।

সাদেরালিও জিগ্যেস করতে ছাড়ে না, কারণ তার বাপের মন। আর ছেলেও বাপেরটা জেনে নেয়। কে কত কামাতে পেরেছে, তাই নিয়ে ঠাট্টাতামাশাও চলে। হঠাৎ কাল সন্ধে থেকে তাল কেটে গেছে, সাদেরালি আজ সকালে সেটা ঠাহর করেছে।

কাল সন্ধে থেকে ছেলেটার মুখে অন্য ভাব। টুকটুকে ফর্সা ছেলেটা ধোঁয়াটে নীল চোখ। মাছের মতো তাকাচ্ছিল লম্ফের আলোয়। আঙুলের ডগায় ভাত ঘাঁটছিল।

আর কী যেন বলতে যাচ্ছিল অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে, সাদেরালির চোখে ঘুমের পাথর তখন। সকালে পেণ্টুল কাচতে গিয়ে তেঁতুলবিচি আর লাল রঙের নোট দেখে একে একে সব মনে পড়েছিল। তারপর থেকে লাল নোটটা তার খুলির ভেতর খসখস করে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। মাথা থেকে ভাপ বেরুচ্ছে। বার বার ছেলেকে জেরা করছে। ঠিকঠাক জবাব নেই। খালি বলে, পেয়েছি।

পেয়েছিস, তো বুলিস নি ক্যানে? ধমক দেয় সাদেরালি। থাপ্পড় তুলে চ্যাঁচায় ফের, একটো লয় আধটো লয়। দু-দুটো টাকা। টাকা কি গাছের ফল?

ছেলেটা ঘাড় গুঁজে আবার বলে, পেয়েছি।...

বেরুতে খানিকটা দেরি হল আজ। আলপথে গিয়ে ইটভাটার কাছে সাদেরালি হঠাৎ দাঁড়াল। ছেলেটা পিছনে হাঁটছে। কেমন ঝিমধরা আড়ষ্ট চেহারা। ফাঁড়ির সেপাইদের কাছে পাখপাখালির ডাক শুনিয়ে কবে একটা খাকি পেণ্টুল পেয়েছিল। হিসির দিন ওটা অনিচ্ছাসত্বেও পরতে হয়। পেণ্টুলটা হাঁটু পেরিয়ে ঝোলে। আর এই শীতের হিম থেকে বাঁচতে ওই সাইজেরই একটা ঘিয়ে রঙের সোয়েটার আছে। মেদীপুরের হিঙন আলি হাজি পেল্লায় মানুষ। তার বাড়ি দিনকয়েক রাখালী করতে গিয়েছিল গত বছর। দাতা হাজিসায়েব তাকে টুটাফাটা ওই সোয়েটার পরিয়ে বলেছিলেন, যা ব্যাটা! বাদশা বানিয়ে দিলাম। কদিন পরে হাজিসায়েবের বদনার গুঁতো খেয়ে পালিয়ে আসে। গায়ে তখন সোয়েটারটা ছিল। তারপর আর বাপ ব্যাটা ভুলেও মেদীপুরের দিকে পা বাড়ায় না।

সাদেরালি চাপা স্বরে বলল, হ্যা রে বাছা, চুরিচামারি করিস নি তো?

ছেলেটা জোরে মাথা দোলায়।

ভয় পাওয়া গলায় সাদেরালি ফের বলে, বাপ নাদেরালি! এখনও খুলে বল। আমি তোর জন্মদাতা। চুরি করিস নি তো?

ছেলেটা এবার ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, ন্না।

তবে কে দিলে টাকা?

দিয়েছে।

কে দিয়েছে রে?

সেই ধোঁয়াটে নীল চোখ। নিষ্পলক মাছের মতো চাহনি। নাকের ফুটো একটু একটু ফুলছে। পাতলা চিমসে রুক্ষু ঠোঁট চাটল একবার। দুপায়ে শিশিরভেজা ঘাসের কুটো, নিস্পন্দ দু একটা পোকাও লেগে আছে।

উঁচু রাস্তায় এক্সপ্রেস বাসটা জীবন্তীর বাজার ছেড়ে জোরে বেরিয়ে গেল। রোজ সকালে দুজন গিয়ে নৈমুদ্দির চায়ের দোকানে বসে এই বাসটার অপেক্ষা করে। দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে বাসটা। যাত্রীরা চা খেতে নামে। সাদেরালি আর তার ছেলে নাদেরালি দু গেলাস চা

আর অন্তত এক টুকরো পাঁউরুটির পয়সা কামিয়ে নেয়। সাদেরালি হেঁড়ে গলায় সুর ধরে বলে :

ঘরবাড়ি বালাখানা...

নাদেরালি চেরা গলায় বলে ওঠে :

রবে না রবে না।

ধনদৌলত খানাপিনা...

রবে না রবে না।।

রূপযৌবন পোশাক আশাক...

রবে না রবে না।।

সাদেরালি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে পা বাড়াল। ছেলের স্বভাব সে জানে। একবার গোঁ ধরলে আর কিছুতেই নোয়ানো যাবে না। জবাই করতে গলায় ছুরি ঠেকালেও না। তবে একথা ঠিক, চুরিচামারি করা স্বভাব নয় ছেলেটার। সেই এতটুকু থেকে দেখে আসছে। শিক্ষা সহবতও দিয়েছে। ন্যায়-অন্যায় ভালমন্দ সমঝে দিয়েছে। বার বার বলেছে, দ্যাখ বাপ! কপালদোষে ভিক্ষ মেঙে খাই বটে, আমরা ভিখমাঙা বংশ নই। নেহাৎ এই পাটা কাটা গেল, শরীলে আধিবেধি ঢুকল। গতর খাটিয়ে খেতে পারিনে বলেই ভিখ মাঙি দোরে দোরে। তুই বড়োসড়ো হ। খাটতে শেখ। তখন আমার জিরেন।...ছেলে বাপের কথা কান করে শুনেছে। জিগ্যেস করেছে, পা কিসে কাটা গেল বাপজী? সাদেরালি একটু হেসেছে। ...সে শুনে তুই কী করবি বাছা? সে বড়ো অনাছিষ্টির কথা।

না শুনে ছাড়বে না। ছেলেটার এই স্বভাব। কথাবার্তা কমই বলে। হাসেটাসেও যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু জেদ ধরলে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবে। ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। একঠেঙে কমজোরী মানুষের পক্ষে তাকে নড়ানো কঠিন। অগত্যা সাদেরালি তার পা খোয়ানোর কাহিনী ইনিয়ে-বিনিয়ে শুনিয়েছে। শোনালে মনটাও হাল্কা হয়। কতজনকে তো শুনিয়ে ছেড়েছে।

আমার এই পা, বুঝলি বাপ—এই পায়ে হেসোর কোপ মেরেছিল তোর মা। বলেই সাদেরালি ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েছে। মনের ভাবটা আঁচ করতে চেয়েছে। মায়ের কথা জানতে-টানতে ওর আগ্রহ নেই কোনদিনও। মা কী জিনিস, হয়তো বোঝেও না। সেই দেড় বছর বয়সে মায়ের সঙ্গছাড়া।

ক্যানে মেরেছিল বাপজী?

এই প্রশ্ন শুনে সাদেরালি মুশকিলে পড়ে গেছে। সত্যি কথাটা অতটুকু ছেলেকে বলা যায় না। অথচ খালি মনে হয়েছে, ও জানুক। ওর জানা উচিত। অগত্যা ভেবেচিন্তে সাদেরালি বলেছে, তোর মায়ের সঙ্গে আমার কাজিয়া হয়েছিল।

ক্যানে বাপজী?

ভুরু কুঁচকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছে সাদেরালি। বলবে নাকি, বলা কি উচিত হবে অতটুকু দুধের বাচ্চাকে—তোর মা ছিল খানকী মেয়ে?

মুখে বলবে কী, মনের ভেতর ছবি এখনও স্পষ্ট। সেই খরার দুপুরবেলাটা চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। কাঁকরগড়ার সোলেমান ঠিকেদার রাস্তা মেরামতের কাজে মুনিশ খুঁজতে আসত এ গাঁয়ে। তখন সাদেরালির শরীরে জোর ছিল। মাটি কোপানোর

কাজে তার জুড়ি ছিল না। সেই সুবাদে সোলেমান সাইকেলে চেপে তার বাড়ি আসত। বোকাসোকা সরল মানুষ সাদেরালি হুঁশ করে নি কেন ঠিকেদার সকালসন্ধে তার মতো মুনিশখাটা লোকের বাড়ি আড্ডা দেয়। তারপর একটু করে সন্দ জেগে উঠেছিল। এক খরার দুপুরে মাথা ধরেছে বলে সাদেরালি কাজ ফেলে হুট করে বাড়ি ফিরেছিল। এসেই দেখে, উঠোনে দেড় বছরের বাচ্চাটা আপনমনে খেলছে। ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল, ঠেলতেই খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠেলে বেরিয়ে গেল হারামজাদা সুলেমান ঠিকেদার। ভেতরে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মেয়েটা তখন আলুথালু চুল আর গতরের কাপড়খানা সামলাচ্ছে। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সাদেরালি। গলা টিপে ধরতে গিয়েছিল কিন্তু মেয়েটা যেন তৈরী ছিল। আচমকা হেসো ছুড়েছিল। হেসোটা হাটুর নীচে লাগল। সাদেরালি আর্তনাদ করে বসে পড়েছিল।

সেই ফাঁকে মেয়েটা বেরিয়ে যায়। দেড় বছরের ছেলেটা তখন মোরগঝুঁটি ফুলগাছটা ছিঁড়ে কুচিকুচি করছে।

পরে পায়ের ঘা বিষিয়ে যায়। ওই নিয়ে মুনিশ খেটেছে। জলকাদা ঘেঁটেছে। ছেলেটাকে বাঁচিয়ে রাখতে মেহনত করেছে। পা ফুলে ঢোল হয়েছে। যন্ত্রণা বেড়েছে। তখন অগত্যা জীবন্তীর হাসপাতালে গিয়েছিল সাদেরালি। ছেলেটাকে রেখে গিয়েছিল আয়মন বুড়ির কাছে। মাস দুই পরে ক্র্যাচে ভর করে বাড়ি ফিরল। দয়াবতী আয়মন ছেলেটার যত্নআত্তির ত্রুটি করেনি।

ভেবেছিল, হারামজাদী মেয়েটা ছেলের টানে ফিরে আসবে। আসে নি। আরও কিছুদিন পরে তার বাপ এসে তালাক চাইল মেয়ের জন্যে! লোকের পরামর্শে সাদেরালি পাঁচশো টাকা চেয়েছিল। শেষঅব্দি দুশোয় রফা হয়। সাদেরালি পরে জেনেছিল, টাকাটা সোলেমানের।

টাকাগুলো পুঁজি করে তিন-চারটে বছর সে কত কী করেছে। একটা গাই গরুও কিনেছিল। দুধ বেচে খাওয়া-পরাটা জুটছিল। তার কপাল! গাইগরুটার কী অসুখ হল। পিরিমল হাড়ি নামকরা গোবদ্যি। সারাতে পারল না। ব্লকে পশুডাক্তার আছেন। সেও ছমাইল দূরে। শেষঅব্দি হাল ছেড়ে দিয়েছিল। নকড়ি কসাই এসে নিয়ে গেল। পঞ্চাশ টাকার বেশি দেয় নি। সেই টাকায় অল্পস্বল্প মনোহারী জিনিস কিনে জীবন্তীর বাজারে হাটবারে গিয়ে বসত। চুড়ি, সেপটিপিন, চুলের ফিতে আর প্লাস্টিকের কাঁটা বেচত। ছেলেটা ভারি বশ। বাপের সঙ্গে ধুকুর ধুকুর হেঁটে আসে। তেলেভাজা খায়। চটের কোনায় চুপ-চাপ বসে থাকে। খোঁড়া সাদেরালি দোকানদারি করে। পুঁজি ভাঙিয়ে পেট চালায়।

এইসব কথা ছেলেকে ইনিয়েবিনিয়ে অনেকবার বলেছে। শুধু ওই কেলেঙ্কারিটুকু গোপন করেছে। অথচ যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে, ওকে সবটাই বলা উচিত। ওর জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে। জানুক ওর মা মেয়েটা কেমন ছিল। আজ আট-নটা বছর কেটে গেল। নিদয়া মেয়েটার মনে একবারও ছেলের কথা বাজল না। বড় তাজ্জব লাগে সাদেরালির। লোকের কাছে বরাবর খবর পেয়েছে, হারামজাদী কাঁকরগড়ায় সোলেমান ঠিকেদারের ঘর করছে। খুব সুখেই আছে। কয়েকটা বাচ্চাকাচ্চাও বিইয়েছে! দামী শাড়ি আর গয়নাগাঁটি পরে মাঝেমাঝে শহরে সিনেমা দেখতে যায়। সাদেরালি গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘোরে বলেই আবছা নানান কথা কানে আসে।

কিন্তু ভুলেও সে কোনদিন কাঁকরগড়া যায় নি। না খেয়ে মরে গেলেও ওদিকে পা বাড়াবে না। আর ছেলেটাকেও বলা আছে, হুঁশিয়ার বাপ! কাঁকরগড়ায় যদি পা দাও, আমার মরা মুখ দেখবে।

ক্যানে বাপজী?

প্রশ্ন শুনে মুশকিলে পড়েছে সাদেরালি। ছেলেটা মায়ের খবর জানতে চায় না। সাদেরালি তাকে ভুলেও বলে নি, তার মা আছে কাঁকরগড়ায়! অন্য কেউ বলেছে কি না, তাও কৌশলে জেনে নিয়েছে। ছেলেটা এমন কিছু বলে না যাতে বোঝা যায়, ব্যাপারটা সে টের পেয়েছে।

ফের প্রশ্ন করলে সাদেরালি একটা রূপকথার গল্প শুনিয়েছে ছেলেকে। আহিরজান নামে এক বাদশার ব্যাটা ছিল। সে গেল শিকারে। বনের মধ্যে হরিণ চরে। বাদশার ব্যাটা তীর ছুঁড়ল। সেই তীর বিঁধল হরিণের বুকে। কিন্তু মারা পড়ল না। পালিয়ে গেল গহন বনের ভিতরে। আহিরজান তাকে ঢুড়ে হয়রান। হেনসময়ে দেখা এক ফকিরের সঙ্গে। ফকির বললেন, হরিণ গেছে উত্তরে। কিন্তু হেই বাপ হুঁশিয়ার। ক্যানে? না—সবদিকে যাও, উত্তরে যেও না। গেলেই বিপদ। কি বিপদ? না, ওই হরিণ হরিণ না। তবে কী? না—আক্কুসী। মানুষের কলজে খায়।...

দম নিয়ে সাদেরালি অনেক বলেছে, তাই বলি নাদেরালি, সব বাগে যেও। খোদাতালার দুনিয়াটা অনেক বড়ো। ইচ্ছেমতো চরে ফিরে খেও। কিন্তু হুঁশিয়ার, উত্তরে পা দিও না। আর দ্যাখো বাপ, আমি একদিন গোরে যাব। তুমি লায়েক হবে। তখনও কথাটা মনে রেখো।

উত্তরে কাঁকরগড়া মাইল তিনেকের বেশি দূরে না। পাকা রাস্তায় যাওয়া যায়। মাঠের পথেও যায়। কতবার ওই মাঠ পেরিয়ে দুজনে দূর-দূরান্তের গাঁয়ে গেছে। সাদেরালি ওদিকে তাকালেই চোখে কাঁকর পড়ে। তাকায় নি। ছেলেকেও নানান কথায় ভুলিয়ে রেখেছে। যদি কখনও বলেছে, চলো না বাপজী, আজ ওই গাঁয়ে যাই।

অমনি সাদেরালি রেগে ধমক দিয়েছে। কতবার বলেছি না ওদিকে যেতে নেই? গেলেই বিপদ। কাঁকরগড়ায় কলজেখাকী ডাইনী আছে।

ছেলেটা যেদিন থেকে আলাদা হয়ে ঘুরছে, সেদিন থেকে সাদেরালি আরও হুঁশিয়ার। কাঁকরগড়ার কথাটা রোজ সকালে তুলতে ভোলে না। সন্ধ্যাবেলায় ও ফিরে এসে বটতলায় দাঁড়ালো। ছল করে জেনে নেয়, ও তল্লাটে গিয়েছিল নাকি। তবে সাদেরালি বুঝেছে, ছেলে বাপকে ভীষণ মানে। এতটুকু অবাধ্যতা তো কোনদিন করে নি। যা বলে তাই শোনে।

তবু মাঝে মাঝে কাঁটার মতো সংশয় বেঁধে। নাবালক ছেলে। দৈবাৎ গিয়ে পড়তেও তো পারে। শেষে ভাবে, যদি গিয়েও পড়ে, মাকে তো চিনবে না। আর ও নিদয়া হারামজাদীও ছেলেকে কি চিনতে পারবে? কত ছেলে-পুলে ভিখ মেঙে গাঁয়ে-গাঁয়ে।

কাল সন্ধেবেলা কি যে হয়েছিল, কাঁকরগড়ার কথাটা অভ্যাসমতো জিগ্যেস করে নি। সকালে পেণ্টুলের পকেটে কাঁইবিচির সঙ্গে লাল নোটটা পেল, তখনও মাথায় আসে নি।

এতক্ষণে নৈমুদ্দির চায়ের দোকানে বসে চা আর পাঁউরুটি তারিয়ে তারিয়ে খাওয়ার পর সাদেরালি সেই লাল নোটটা বের করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার কলজেয় কী চিড়িক করে উঠল। তার খুলির ভেতরটা ফাঁপা মনে হল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দেখল, হাতটা কাঁপছে।

কোনরকমে পয়সা মিটিয়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে সে বাকি পয়সাগুলো ফতুয়ার পকেটে রেখে ক্রাচটা ওঠায়। রোজকার মতো ছেলেটা তাকে অনুসরণ করে। পীচের রাস্তায় ক্রাচটা

আওয়াজ করে সাদেরালি একটু জোরেই হাঁটতে থাকে। সাঁকো পেরিয়ে খালের ধারে বটতলায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এখানেই দুজনে ছাড়াছাড়ি হবে। কে কোন গাঁয়ে যাচ্ছে, পরস্পরকে জানাবে।

কাল সকালে ছাড়াছাড়ির সময় ছেলেটা হাসি মুখে বলেছিল, আজ আমি চণ্ডীতলা যাব বাপজী! নাককাটীর গান শুনে অনেক চাল দিয়েছিল।

নাককাটীর গানটা সাদেরালি শেখায় নি! কী ভাবে কোথায় শিখেছে কে জানে।

...নাকটি ছিল বাঁশির মতো

কতজনায় দেইখ্যে যেতো

পথেঘাটেতে হায় গো...

মোড়লবুড়া বদের গোঁড়া

কেইট্যে লিলে নাকের গোড়া

পথেঘাটেতে হায় গো...

গানটা শুনলে সাদেরালি হাসিতে গা ঘুলোয়। সে বলেছিল, তাই যাস চণ্ডীতলা।

তা পরে যাব কাপাসী।

তাই যাস বাপ! যেথা মোন চায় যাস। হরবোলার খুব কদর হয়েছে। তার কুকুর ডাক শুনে গাঁয়ের সব কুকুর ছুটে এসেছিল। বাপ-ব্যাটায় হেসে খুন। খানিক পরে ছেলেটা খালের ধার দিয়ে চলে গেল। ঘু ঘু ঘু...ঘু ঘু ঘু...দূর থেকে ভেসে আসছিল তার ঘুঘুপাখির ডাক।

আজ বটতলায় দুজনের মনে অন্য ভাব। মুখে থমথমে ছায়া কাঁপছে। সাদেরালি ভুরু কুঁচকে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেটা তাকিয়েই দৃষ্টি সরালো। ধোঁয়াটে নীল চোখে দূরের দিকে তাকাল। রুক্ষু ঠোঁটটা চাটল একবার। তারপর ঘড়ঘড়ে গলায় সাদেরালি ডাকল, নাদেরালি!

হাঁ?

তুই কাল কাঁকরগড়া গিয়েছিলি, তাই না?

হুঁ।

দম আটকানো স্বরে সাদেরালি বলে, হুঁ! তাই বটে। তো টাকাটা তোকে কাঁকরগড়ায় দিয়েছে?

ছেলেটা গলার ভেতরে বলে, হুঁ।

হাঁ করে দম নেয় সাদেরালি। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, তো মরদমানুষ দিলে, কী মেয়েমানুষ দিলে টাকাটা?

ছেলেটা মুখের দিকে তাকায়।

সাদেরালি গর্জন করে, মরদমানুষ, কী মেয়েমানুষ?

বাপের মূর্তি দেখে নাদেরালি কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলে, একটা মেয়েমানুষ দিলে। আমি... আমি তেঁতুলতলায় কাঁইবিচি কুড়িয়ে দীঘির ঘাটে গেলাম। পানির পিয়াস লেগেছিল।

তাপরে—তাপরে কলজেখাকীটা ধরে নিয়ে গেল।

হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ওঠে ছেলেটা। তখনি খোঁড়া লোকটা তার কাঁধ খামচে ধরে। থাপ্পড় মারে গালে। নেমকহারাম!

ছেলেটা পড়ে যায়। কান্না সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে। নিষ্পলক তাকিয়ে বাপের মার খায়। সাদেরালি হাঁফাতে হাঁফাতে তাকে টেনে ওঠায় ফের। বেধড়ক মারতে থাকে। কষা কেটে রক্ত ঝরে। হিঙন হাজির ঘিয়ে রঙের সোয়েটারে ধুলো আর রক্তের ছোপ।

সাদেরালি চ্যাঁচায়, আজ থেকে তুই ফের আমার সঙ্গে ঘুররি। তারপর পকেট থেকে সেই পয়সাগুলো ছুড়ে ফেলে খালের জলে। বার বার থুতু ফেলে। ছেলেটা আস্তে আস্তে উঠে বসল।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটার কাঁধ খামচে ধরে সে মাঠের পথে নেমেছে। খোদাতালার আসমানকে শুনিয়ে বলছে, আজ আমি শুওর খেলাম। যতদূর যায়, খোঁড়া লোকটা ধুয়োর মতো আওড়ায় কথাটা।

কাঁকরগড়ার দীঘির ঘাটে আনমনে দাঁড়িয়ে আছে সোলেমান ঠিকেদারের বউ। পাড়ের তেঁতুলবনে বৃষ্টি। কাঁকে একটা পেতলের ঘড়া।

ঘু ঘু ঘু.....ঘু ঘু ঘু!

তেঁতুলবনে ঘুঘু ডাকল। হরবোলা ছেলেটা এসে গেছে। হেই বাপ! আর অমন করে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিখ মেঙে ঘুরিস নে। সোনার গতর কালি হয়ে যাবে। রোজ এই তেঁতুলতলায় এসে দাঁড়াস। রোজ তোকে টাকা দেব। চাল দেব। খন্দ দেব। পেণ্টুল দেব। জামা দেব। সব দেব।

চঞ্চল চোখে চারদিকটা দেখে নিয়ে সোলেমানের বউ পাড়ে ওঠে। কেয়া ফণিমনসা নাটাকাঁটার জঙ্গলে চুপিচুপি হেঁটে যায়। ঘুটিঙ কাঁকরে ঢাকা মাটিতে পায়ের তলায় কষ্ট। আর ওই ঘু ঘু আজ তুরপুনের মতো ঘুরে ঘুরে কলজের শুকনো ঘায়ে ঢুকে যাচ্ছে। বড্ড টাটায়।

ঘু ঘু ঘু...ঘু ঘু ঘু!

বুকের কাছে চালের পুটুলিটা লুকোনো, তাতে একটা দশ টাকার নোট। ঠিকাদার টের পেলে জবাই করবে। রূপসী বউয়ের আর সে রূপ নেই। চুলেও পাক ধরেছে একটা দুটো। ঠিকেদারের চোখে আর সেই নেশার রঙটা খেলে না। কথায় কথায় তেড়ে আসে। শহরের মেয়ে নিকে করে আনবে বলে শাসায়।

তেঁতুলবনে ঢুকেই সোলেমান ঠিকেদারের বউ থমকে দাঁড়ায়। জাং দুটো ভারী লাগে। মাথার ওপর ডালপালায় বসে একটা ঘুঘু ডাকছে।

রাগে দুঃখে সে বলে ওঠে, মর মর! তারপর মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে ঝাপসা চোখে। বিশাল মাঠ হু হু করে জ্বলে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে ঘাটে ফিরে আসে। ভাবে, তাহলে কি একটা স্বপ্ন দেখেছিল? ঘড়ায় জল ভরে তেঁতুলবনের দিকে তাকাতে তাকাতে সে বাড়ি ফেরে। হরবোলা ছেলেটা এল না। কিন্তু কাল থেকে তার মাথার ভেতর যে ঘুঘু পাখিটা ঢুকে গেছে সে সমানে ডাকছে আর ডাকছে।

আর তখন দূরের গাঁয়ে এক মোড়লের বাড়ির উঠোনে হরবোলা। ছেলেটাকে মেয়েরা সাধাসাধি করছে ঘুঘু পাখি ডাকতে। সে পাথরের মতো চুপ। তার খোঁড়া বাপটা তার চুল

খামচে ধরলে এবার সে কাঁদে আর শুধু বলে জানি না।

লালীর জন্য

'এই ঝোপে লালীর মড়াটা আটকে ছিল।'

দয়াময় এমন করে বলায় আমার খুব খারাপ লাগল। মড়া না বলে শুধু লালী বললেই পারতেন! যারা মরে যায়, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে না পারলেও ঘেন্না থাকা উচিত কি? ধরা যাক, লোকটা বা মেয়েটা কিংবা কেউ হাড়জ্বালানী বদমাস ছিল—কিন্তু মরার পর তো আর কিছু করারই রইল না।

আর মৃত্যু, আজও এক রহস্য। মরে গিয়ে কী ঘটে? কেউ ফিরে এসে তো বলার উপায় নেই। অন্তত মৃত্যুর এই রহস্যময়তার খাতিরেও লালী একটা মূল্য দাবি করতে পারে। বিশেষ করে নিজের বাবারই কাছে। ওর বাবা দয়াময় অবশ্য বরাবর নিষ্ঠুর মানুষ বলে প্রসিদ্ধ। কথায় কথায় চাষীদের বেদম ঠ্যাঙান। লালীকেও সারাজীবন ঠেঙিয়ে গেছেন। লালী বলত—এটা বাবার একটা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স থেকে হয়েছে। সত্যি করে কেউ তো এ পৃথিবীতে দয়াময় থাকতে পারে না।

আমি ঝোপটা খুঁটিয়ে দেখছি লক্ষ করে দয়াময় ফের বললেন—সেই বন্যায় সব উপড়ে ভেসে গিয়েছিল, শুধু একটা বাদে। চিনতে পারছ, এটা একটা শ্যাওড়া ঝোপ? খুব শক্ত শেকড়-বাকড়।

ভাগ্যিস শক্ত এবং উপড়ে যায়নি, তাহলে লালী এই নদী বেয়ে সোজা গঙ্গায় পড়ত। তবে, গঙ্গায় পড়লে লালীর ভালই হত—সব পাপ ঘুচে মোক্ষ পেত তার আত্মা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল আমার। কেন কে জানে, তার পরমুহূর্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। বললুম—তারপর কী হল?

দয়াময় একটু বাঁকা হেসে বললেন—তারপর কী হয়?

—মানে, ওকে কী অবস্থায় পেয়েছিলেন?

দয়াময় ঝোপটা দেখতে দেখতে বললেন—শকুন বসতে পারেনি, জল ছিল। তবে দুটো শেয়াল ওর নাড়িভুঁড়ি খাচ্ছিল। আর একটা দাঁড়কাক স্তনে ঠোঁট ঠুকরে লাং বের করছিল। আরও শুনবে?

—জ্যাঠামশাই কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

দয়াময় নিষ্ঠুর হেসে উঠলেন—কেন? তোমাদের আজকালকার ছেলে ছোকরাদের বোঝাই দায়—এত সেন্টিমেন্টাল। এস, তোমাদের জমিটা দেখিয়ে দিই।

দয়াময়ের কাঁধে এবার বন্দুকটা উঠল। পা বাড়ালেন। কাঁধে কার্তুজের ঝোলাটা নড়ে উঠল। আমার কিন্তু পা ডুবে গেছে শক্ত পলির তলায়, শেকড় গজাচ্ছে, এবং সেই সব সাদা বিন্দু বিন্দু শেকড়ের আঁকুর ভ্রূকুটির মতন আমার শরীর থেকে পৃথিবীর গভীরতা লক্ষ করতে চায়। খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করছিলুম এটা।

দয়াময় ঘুরে বললেন—কী হল?

—কিছু না। বেচারী লালীর কথা মনে পড়ছে!

দয়াময় ফের হাসলেন—তুমি বরাবর ব্রডমাইণ্ডেড আর মডার্ন। জানি। কিন্তু আমি প্রিমিটিভ ধরনের মানুষ। মেয়ের প্রেমিকদের....

বাধা দিয়ে বললুম—ছিঃ! কী বলছেন?

—মাঝে মাঝে আমি খুব সরল হয়ে যাই, অমিত! একে সেই প্রিমিটিভ সরলতা বলতে পারো। দেখ, ও যখন বেঁচে ছিল—তোমার বাবার কাছে কথাটা তুলেছিলুম। অরবিন্দ বলেছিল, তা কী করে হয়? এখন অমিত পড়াশোনা করছে। তা ছাড়া, বিয়ের বয়সও তো হয়নি। হুম! তোমার বাবা আরও বলেছিলেন, অমিতের অনেক অ্যামবিসন আছে!

—জ্যাঠামশাই, প্লীজ! ওসব ভুলে যান।

—ভুলেছিলুম তো। তুমি আবার মনে করিয়ে দিলে। চলো, এগোনো যাক।

—আজ থাক বরং। জমি তো উঠে পালাচ্ছে না। কাল যাব বরং।

দয়াময় আমার দিকে কেমন দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—ও, আচ্ছা! তাহলে তুমি বসে-বসে অশ্রুপাত করো। আমি বরং দেখি দুএকটা তিতির পাই নাকি।

বলেই উনি বড় বড় পা ফেলে চলে গেলেন। বিশাল ওই মানুষ, পায়ে গামবুট, কাঁধে বন্দুক ও কার্তুজের ঝোলা, মাথায় টুপি। বাঁয়ে ঘুরে চরে নামলেন। কিছুক্ষণ নদীর তলায় হারিয়ে রইলেন। তারপর ওপারে বাঁধে বিরাট আকাশের গায়ে তাঁকে আবার দেখতে পেলুম। অমন একলা ওঁকে কখনও এর আগে মনে হয়নি। এখন একটু ভয় হল। চারদিকে ওঁর শত্রু। এভাবে একটা বন্দুক নিয়ে কি আত্মরক্ষা করতে পারবেন? এলাকায় তিনজন জোতদার ইতিমধ্যে খুন হয়েছে। উনিও যে-কোনও সময় খুন হতে পারেন। তখন লালীর মা বলবেন, অমিতই ষড়যন্ত্র করে ওঁকে মাঠে নিয়ে গিয়েছিল। পুলিস বলবে, তাই তো! হঠাৎ এই ছোকরা আচমকা শহর থেকে বাবার সম্পত্তি দেখার ছলে গ্রামে এল এবং..

বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। তারপর বাঁ চোখের কোণ দিয়ে যেন লালীকেই দেখতে পেলুম। —কী অমিত, কেমন আছ?

—তুমি ভাল আছ তো লালী? মৃত্যুর পর জায়গাটা কেমন বল তো? প্রেমিক পেয়েছ কি এখানকার মতো? কথায়-কথায় তাদের সঙ্গে কি শুয়েপড়া এখনও সহজ? লালী, আমি কিন্তু সেদিক থেকে এখনও ব্যর্থ।

—তুমি যে ভীতু! মেয়েদের দিকে চোখ তুলে কথা বলতেই পারো না। অথচ, তোমার সারা দেহে তীব্র কামনা পোকার মতন কিলবিল করে। অমিত তোমাকে তাই পোশাক খুলতে বলেছিলুম, মনে পড়ছে তো? ওই ওখানটায় জলের মধ্যে ভাসতে ভাসতে তুমি আবিষ্কার করেছিলে আমি উলঙ্গ, আর বলেছিলে—এ কী লালী! তোমার শাড়ি কোথায়? আমি বলেছিলুম—কেড়ে নিয়েছে। তুমি চেঁচিয়ে উঠেছিলে—কে? কে? তখনই বৃষ্টি আর বাতাস বেড়ে গেল। আমার জবাব তুমি শুনতে পেলে না!

—কী বলেছিলে লালী?

—বলেছিলুম, যে কাড়বার সেই কেড়েছে। এতদিনে আমার সম্পূর্ণতা। এবার তাই ভেসে গেলুম। বিদায়, অমিত! বিদায়!

—আর বলেছিলে, হাসতে হাসতে বলেছিলে, তুমিও প্যাণ্টটা খুলে ফেল। পারিনি। আমার সাঁতার দিতে অসুবিধা হচ্ছিল। তবু জলের তলায় সভ্যতাকে বাঁচাতে চাইলুম!

—অথচ........

—অথচ কি লালী?

—অথচ পোশাক খুলে ফেললেই কত সহজেই মানুষ সম্পূর্ণতা পায়।

—সে কী লালী, সম্পূর্ণতাটা কী?

—তার নাম স্বাধীনতা।....

স্বাধীনতা! আমার চোয়াল আবার শক্ত হয়ে উঠল। লালী খুব ছেলেবেলা থেকেই তাহলে আমাকে এই স্বাধীনতার দিকে ডেকেছিল! তখন বুঝতুম না। পরেও কোনদিন বুঝিনি! নাটাকাঁটা কুঁচফল শ্যাওড়া-ঝোপের গুহায় ছায়ায় নির্জনে শুয়ে পড়ার মানে আরেক জন্মের দিকে লক্ষ্মীন্দরের মতো ভেসে যাওয়া—শিয়রে বেহুলা। জানতুম না। পদ্ম-শালুক-ফোটা ঝিলের জলে সেই স্বাধীনতার ডাক ছিল। চৈত্রের নির্জন মাঠে সেই স্বাধীনতার হাওয়া ছিল। নদীর চড়ায় জ্যোৎস্নায় গা এলিয়ে পড়ে থাকত সেই সোনালী রূপোলী স্বাধীনতা। কী বোকা ছিলাম এতদিন!

আমি ভালবাসতুম ব্রিজে শব্দকারী রেলগাড়ি, গলায় নীল রুমাল জড়ানো, দাড়িওলা ফায়ারম্যান, পাহাড়ের চূড়ার ওদিকে ব্লাস্ট ফার্নেসের ছটা, সবুজ ল্যাণ্ডমাস্টার গাড়ি, রাতের আকাশে এরোপ্লেন আর গালিভারস ট্রাভেল এক খণ্ড। ভালবাসতুম পুরনো কালের সাহিত্য, কিংবা পিকাসো আর দালির ছবি। রবিঠাকুরের কবিতা হেনরি মুরের ভাস্কর্য। ক্লাসিকে-রোমান্টিকে মাখামাখি এক বিরাট সভ্যতাকে জানতুম শ্রেয় ও প্রেয়। সভ্যতার কয়েক হাজার বছর আমার মগজে ঢুকে পড়েছিল।

আর লালী ভালবাসত কুঁচ ফল, বিষাক্ত ধুঁদুল, লালপোকা নীলপোকা নির্জন বালিয়াড়ির পাখি, জ্যোৎস্না রাতে পরীর নাচ মাঠের বিশালতা।

দুইয়ে কোন মিল ছিল না। আমি শহর থেকে নিয়ে যেতুম জাঁ পল সাত্রের অস্তিত্বমূলক গল্প। লালী কুড়িয়ে আনত মাঠের নিঃসঙ্গচাষা ইবাজ সেখের রূপকথা। লালী গাইত প্রাচীন লোকসঙ্গীত, আমি আওড়াতুম আধুনিক কবিতা। কোনও মিল ছিল না, কোনও মিল!

অথচ লালীকে দয়াময় লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। ক'বছর দিব্যি আধুনিক মেয়ে সেজে সে মফঃস্বল শহরের কলেজে বাসে যাতায়াত করত।

একদা লালী নদীর ধারে জামবনে আমাকে বলেছিল—তোর সঙ্গে একটা ভারি দরকারি কথা আছে, অমিত।

বলেছিলুম—কী কথা রে? এক্ষুনি বল না।

হঠাৎ চাপা গলায় ও বলেছিল—এখন বলা যাবে না। বলব'খন।

এই ছিল লালীর স্বভাব। কৌতূহলকে ফুটিয়ে দিয়েই নিঃশব্দে হেসে চলে যেত। তখন তাকে মনে হত সবে ফুল ফুটবে এমন টানটান শাখা-প্রশাখার উত্তেজনা দিয়ে সে চলে যাচ্ছে। এবং তার ওই না-বলা কথাটা আমাকে তার-পর কতদিন উত্যক্ত করেছিল বলার নয়। ভাবতুম—কী কথা বলবে লালী? কোনো গুরুতর শরীর-বিষয়ক, নাকি তার আর সব উদ্ভট কথামালার অন্তর্গত? সে কি বলবে তার হাঁটুর নিচে আঁকুর গজাচ্ছে উদ্ভিদের? তার শরীরে কোথাও ফুল ফোটবার ষড়যন্ত্র চলেছে সেই গূঢ় খবর জানাবে?

মাঝে মাঝে ওকে দেখতুম কত সহজে মিশে যাচ্ছে উদ্ভিদের রাজ্যে। জড়িয়ে পড়ছে দুর্বোধ্য প্রাকৃতিক সব খেলাধুলায়। কেন যে চলতে চলতে রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল মাঠে

এবং দৌড়ুতে শুরু করল দিগন্তের দিকে, বুঝতেই পারতুম না।

ওর কাছে ছিল গভীর অথৈ কোন জলজগতের খবর, যেখানে মানুষেরা মৃত্যুর পর ঝিনুক হয়ে যায়। ও শোনাত, পাহাড়ের ওপর কোথায় আছে ডাকিনীর গুহা, যেখানে ঘণ্টা বাজলেই পৃথিবীতে রাত্রি আসে।

লালী একদিন বলেছিল, গ্রামের এই নদীর চড়ায় দেবদূত নেমেছিল। কেমন তার চেহারা? তাও সে বর্ণনা করেছিল। গলার রেশমি রুমাল, নীল চোখ, হলুদ দুই ডানা কাঁধে, লাল টুকটুকে ঠোঁট। আর সেই দেবদূত লালীকে কী একটা ভাল খবর দিয়েই কেটে পড়েছিল। এ খবরটা অনেক পরে বলেছিল লালী। রাঙা বউদির অর্থাৎ দয়াময়ের ভাইপো সুধাকান্ত—যে সেটেলমেণ্টের বড় অফিসার, তার বউয়ের ছেলে হবে।

এই সুধাকান্ত সারাক্ষণ আমাকে লালীর ব্যাপারে সন্দেহ করত। সে সেই বন্যার পর শহরে চলে গেছে। আর সে গ্রামে আসবে না। কারণ, লালীকে পাহারা দেবার দরকার ফুরিয়ে গেছে। লালীকে সভ্যতার দিকে টানতে তারই কারচুপি ছিল। দয়াময়কে ফুঁসলে বদলে ফেলেছিল। অথচ দয়াময়ের ইচ্ছে ছিল, লালীকে তিনি খাঁটি মেয়েজোতদার করে ছাড়বেন। অল্পস্বল্প লেখাপড়াই সেজন্য যথেষ্ট।

দেখতে দেখতে লালী বড় হল। কিন্তু তবু তার ওই বন্যতা গেল না। সভ্যতাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে সে ঘুরে বেড়াত বিষাক্ত ধুঁদুল, লালপোকা, নীলপোকা, পাখি, প্রজাপতি, কুঁচফলের পৃথিবীতে। আমাদের এই পাড়াগাঁর পাশে কাঁচা রাস্তাটায় ইতিমধ্যে পিচ পড়েছিল। মাঠে বিশাল ফ্রেমে টাঙানো হয়েছিল বিদ্যুতের ভারী তার। ফ্রেমের গায়ে লাল ফলকে সাদা মড়ার মাথা ও দুটো আড়াআড়ি হাড় আঁকা ছিল। তাতে নাকি লেখা ছিলঃ সভ্যতা। অতএব সাবধান!

অবশ্য এ কথা লালীর। আমি পড়তুম : এগারো হাজার ভোল্ট সাবধান। ও পড়ে বলত —সভ্যতা। অতএব সাবধান।

একদিন লালী বলেছিল—কেন আমার পিছনে ঘুরঘুর করিস বল তো?

তখন সে নদীর ধারের বাঁধে যেতে যেতে হঠাৎ জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিল। আমি তার পিছু ছাড়িনি। জারুল গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে আমাকে ওই প্রশ্ন করেছিল। জবাবে চোখ বুজে বলে ফেলেছিলাম—আমি তোকে চাই, লালী।

লালী বাঁকা ঠোঁটে হেসে বলেছিল—সে আবার কী রে?

—না লালী। বল কেমন করে তোকে পাব?

—আমাকে পেতে হলে তোকে দেউড় বাঁশের জঙ্গল পেরোতে হবে।

—তার মানে?

লালী বলেছিল—ওটা আমার শর্ত। ওই বাঁওড়ের মুখে কাঁটাভরা বাঁশের জঙ্গল আছে, ওটার পূর্বধারে তোর জন্য অপেক্ষা করব। তুই পশ্চিম থেকে ঢুকবি। পেরিয়ে গেলেই আমাকে পেয়ে যাবি।

—বেশ, তাই হবে।

অস্থির হয়ে বাঁওড়ের দিকে হেঁটে গিয়েছিলুম। কথামতো লালী পুবে চলে গেল। আমি গেলুম পশ্চিমে। তারপর সে এক অনাছিষ্টি কাণ্ড। হাঁটু না ভাঁজ করে বাঁশবনটায় ঢোকা যায় না। কোথাও বুকে হাঁটতেও হল। চার পাশে শুধু থরে থরে তীক্ষ্ণ কাঁটা। কেটে ছড়ে

একাকার হল কপাল, চিবুক, হাতের তালু। জামাপ্যাণ্ট ছিঁড়ল। স্যাঁতসেঁতে মাটির কালো রসে সব বিচ্ছিরি হয়ে গেল। তারপর যত এগোই, তত শরীর শিউরে ওঠে। এ কোথায় চলে এসেছি? হাল্কা নীলচে অন্ধকার এক জগতে—যেখানে সরীসৃপদের রাজত্ব। পোকামাকড় ব্যাঙ খরগোশ জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আমাকে দেখছে। সাপের খোলস, ছত্রাক, শ্যাওলা আমার বুকের তলায় জমে উঠছে। মাকড়সার ঝুল আমার সারা মুখে জড়িয়ে গেছে। দেখতে দেখতে ক্রমশ বদলে যাচ্ছি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা—অতি ঠাণ্ডা সবুজ সাপ ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে কোথায়। আমি বদলাচ্ছি। নিজেকে দেখতে পাচ্ছি এক হলদে ধূসর নীল লালে বিচিত্র এক গিরগিটি, সারা গায়ে শিহরণের কাঁটা শক্ত আর খসখসে। ভাঙা ডিমের খোলস মাড়িয়ে আমি কোথায় চলেছি, কোন আদিমতম পৃথিবীর দিকে? ক্রমশ আমার পোশাক অসম্ভব ভারি হয়ে এল। ছায়া হতে থাকল ঘনতর। তারপর অন্ধকারে বুকে হেঁটে যেতে যেতে, রক্ত ঝরার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা পেতে পেতে, চিৎকার করে উঠেছিলুম—লালী! লালী! মনে হল, কোথাও লালীর খিলখিল হাসি শোনা গেল। তারপর সে আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল। শব্দটা অনুমান করে এগোলুম। তবু অন্ধকার শেষ হল না। কতক্ষণ কেটে গেল। সময়ের অস্তিত্ব বলতে কিছু আর রইল না। সেই গভীর প্রাকৃতিক অন্ধকারে পথ হারিয়ে আমি ক্রমশ অবশ হয়ে পড়লুম।....

সেবার লালী খবর দিয়ে লোকজন এনে আমাকে খুঁজে বের করেছিল। উদ্ধার করার পর সবাই প্রশ্ন করেছিল—কেন ওখানে ঢুকতে গেলে তুমি? কোন যুক্তিপূর্ণ জবাব দিতে পারিনি। লালীর ব্যাপারে আমাদের প্রচলিত যুক্তির বালাই থাকতে পারে না। শুধু বলেছিলুম—এমনি।

এবং এই ছিল লালীর স্বভাব।

সেই 'দরকারী কথার' ব্যাপারটাই ধরা যাক না কেন! আমার কৈশোর থেকে যৌবন সে ওই না-বলা কথাটার জোরে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। তারপর তো কলেজে পড়তে গেলুম। মাঝে মাঝে ছুটিতে গ্রামে আসতুম। লালী যেমন ছিল তেমনি।

সময় হুহু করে চলে যাচ্ছিল। প্রতিশ্রুতি থাক বা না থাক, লালীকে আমার চাই-ই এই গূঢ় প্রতিজ্ঞায় তবু স্থির থেকে গেলুম। তারপর এক পুজোর ছুটিতে গ্রামে আসার পরই হঠাৎ নদীর বাঁধ ভেঙে প্রচণ্ড বন্যা শুরু হল।

বৃষ্টি পড়ছিল ক'দিন থেকে। নদীর জল ব্রিজের কাছে বিপদ-সীমা পেরিয়ে যাচ্ছিল। তারপর এক শেষ-রাতে গ্রামে জল ঢুকতে থাকল। সে এক ভয়ঙ্কর দিন এল গ্রামের। ঘরবাড়ি ধসে পড়ল। পালিত পশু-পাখিরা ভেসে গেল। কিছু মানুষও বেপাত্তা হয়ে গেল। আমাদের মাটির বাড়িটা ধসে গেলে পরিবারের সবাই দয়াময়ের একতলার ছাদে গিয়ে আশ্রয় নিল। বন্যা এলে দয়াময় তাঁর নিষ্ঠুরতাকে কদিনের জন্যে ছুটি দিয়েছিলেন।

তখন বিকেল। রিলিফের নৌকো আসতে শুরু করেছে। দয়াময়ের এক-তলা চার পাঁচটা ইটের ঘরের ছাদ থেকে আশ্রিতরা নৌকোয় চলে যাছে। আমি লালীকেই খুঁজছি। কোথায় গেল সে?

দয়াময় ক'বার জিজ্ঞেস করলেন—লালীকে দেখেছো অমিত?

—না তো!

—আশ্চর্য! সকাল থেকে তার পাত্তা নেই। শুনলুম বাঁধের দিকে গিয়েছিল—খুব খোঁজা হল, পাওয়া গেল না।

—তাহলে আপনার ফ্যামিলির সঙ্গে নৌকোয় চলে গেছে।

দয়াময় মাথা নাড়লেন—নাঃ!

লালী বাঁধের দিকে যাচ্ছিল? আমার মধ্যে একটা তীব্র উত্তেজনা জাগল। এক ফাঁকে নিচে নামলুম। কেউ আমাকে কোন প্রশ্নও করল না—কোথায় যাচ্ছি। প্রশ্ন করার এটা সময় নয়।

উঠোনের জল এক-বুক। তীব্র স্রোত ঘুরপাক খাচ্ছে। বেরিয়ে যেতেই রাস্তায় জল বেড়ে গেল। সাঁতার কাটার অভ্যাস ছিল ছেলেবেলা থেকে। নদীর বাঁধের দিকে এগিয়ে গেলুম। চিতসাঁতার দিচ্ছিলুম। স্রোতের সপক্ষে ভেসে যেতে যেতে যখন একটা নিচু জায়গায় পৌঁছলুম, টের পেলুম, বাঁধের এই অংশটাই যা টিকে আছে। জায়গাটা আন্দাজ কুড়ি ফুট-বাই-ছ ফুট এবং লম্বাটে, তার গায়ে অনেক জড়াজড়ি গাছ। তার নিচে ঝোপগুলো ডুবে গেছে। দ্রুত সন্ধ্যা আসছিল। আমি উথাল-পাথাল জলের শব্দের ওপর তীব্র-তীব্র কিছু শব্দ ছুঁড়ে দিলুম—লালী! লালী!

পরক্ষণেই খুব কাছে সাড়া পাওয়া গেল—আছি।

আশ্চর্য! লালী আমার খুব কাছেই একটা হিজল গাছের ছড়ানো ডালে পা ঝুলিয়ে বসে রয়েছে। ভিজে শাড়িটা গায়ে জড়ানো। শেষ আলোয় ওকে দেখে মনে হল এক প্রাগৈতিহাসিক কোন সত্তা—হয়তো প্রাণী নয়, অন্যকিছু—মানুষের ভাষায় বর্ণনা দেওয়া যায় না।

—লালী! ওখানে কী করছ?

লালী হাত তুলে ডাকল।—চলে এস অমিত।

শশব্যস্তে গাছে ডঠে যেই তার দিকে এগিয়েছি, ও লাফ দিয়ে জলে পড়ল। মুহূর্তের ঝোঁকে আমিও ঝাঁপ দিলুম। ও দ্রুত এগোচ্ছিল। ওকে অনুসরণ করলুম। আর সেই সময় আবার বৃষ্টি নামল। আরও ধূসর হয়ে গেল সব কিছু। তবু মরিয়া হয়ে ওকে অনুসরণ করতে থাকলুম। ডাকলুম—লালী! এই লালী।

লালী বার বার সাড়া দিয়ে গেল।

স্রোতে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ হাতে কী একটা শক্ত ঠেকল। অমনি সেটা ধরলুম। মনে হল একটা প্রকাণ্ড লোহার রেলিং। সেটার ওপর পা রেখে উঠে বসলুম। তারপর শুনলুম লালীর কণ্ঠস্বর।—অমিত!

—লালী!

লালীকে রেলিঙের অন্যপ্রান্ত দিয়ে উঠত দেখলুম। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে সন্ধ্যার আবছায়ায় ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে কাছে এসে বলল—সাঁকোটা উপড়ে গেছে দেখছ? এখানে এসে আটকেছে!

আমরা পাশাপাশি বসে আছি, হঠাৎ লালী বলে উঠল—এই অমিত, আজ তোমাকে সেই পুরনো কথাটা বলব।

আমি ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরেই প্রচণ্ড অবাক হয়ে বললুম—একি লালী! তোমার কাপড়চোপড় কোথায় গেল?

—সাঁতার দেওয়া যায় না। তাই ফেলে দিয়েছি। তুমিও সব ফেলে দাও।

সেই রাতে পৃথিবী আমাদের দুজনকে শোবার মতো একটুও জায়গা দেয়নি। তা পেলে আমরা দুটি প্রাচীন সরীসৃপের মতো অন্ধ ভালবাসায় ঘনীভূত হতে পারতুম।

আমরা সেই রেলিঙে অতিকষ্টে বসে থাকলুম—অনেক অনেকক্ষণ। কথা খুঁজলুম। এবং এক অদ্ভুত বন্য গন্ধে আমাদের শরীরের ভিতরে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কিছু ফুল ফুটল। নাকি আমাদের দুই সভ্যতাবর্জিত নগ্ন শরীর থেকে অজস্র আঁকুর গজাল শেকড়বাকড়ের ষড়যন্ত্রে? তাই তখন দরকার ছিল একটুকরো মাটি। অথচ কোথাও তখন মাটি নেই।

এক সময় বললুম—লালী, তোমার সেই কথাটা?

—হ্যাঁ, কথা।

বলে সে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর খুব আস্তে বলল—কথাটা হয়তো ফুরিয়ে গেছে। নেই আর।

—লালী, হেঁয়ালি করো না!

হঠাৎ সে হেসে উঠল। কথাটা ফুরিয়েছে। তবু কথা আরো থাকে, অমিত। সে কথা শুনতে হলে আরো দূরে যেতে হবে। চলে এস!

সে তক্ষুণি অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপ দিল জলে। চেঁচিয়ে উঠলুম—লালী!

লালীর ডাক শোনা গেল।—চলে এস!

অসম্ভব। এই দুর্যোগে আর ঝাঁপ দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। পারলুম না। কাকুতি মিনতি করে ওকে ডাকতে থাকলুম। ও শুধু দূর থেকে দূরে যেতে যেতে বলল—চলে এস!

আমি রাগ উত্তেজনা দুঃখে অস্থির হয়ে বসে থাকলুম। ওই ডাকে সাড়া দিয়ে এগোবার সাহস আর শক্তিও আমার ছিল না।....

এখন বুঝতে পারি, ওই ছিল লালীর মুখে স্বাধীনতার ডাক। যে স্বাধীনতায় অতিক্রান্ত হয় দিনরাত্রি, সূর্য ওঠে, চাঁদ জ্যোৎস্না দেয়, এই ব্রহ্মাণ্ড চলে যেতে থাকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের ভেগা নক্ষত্রের দিকে, বুদ্বুদের মতো প্রসারিত হয় স্পেস, সময় হয়ে ওঠে গতিবান—আর যে স্বাধীনতায় মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদ আসে, ফুল ফোটে, প্রাণীরা জন্ম নেয়, লালী সেই খাঁটি স্বাধীনতাকে জেনেছিল। তার দিকে চলে যাচ্ছিল আমৃত্যু। ওই যাওয়াই তার জীবন।

হায়, সেই স্বাধীনতার ডাক কেউ শোনে, কেউ জানে—অনেকে শোনে না, অনেকেই জানে না! জন্মের পরই ইতিহাস চোখে পরিয়ে দেয় সভ্যতার ঠুলি।

লালী ছিল আমারই স্বাধীনতার টান। আমি ভাসতে পারিনি। সভ্যতায় আছি। পোশাকে কার্পেটে ফুলদানিতে, পিকাসো রবিঠাকুরে।

—এই ঝোপে লালীর মড়াটা আটকে ছিল।

যেন দয়াময় আবার খুব পাশ থেকে কথা বলে উঠলেন। আবার আমি ঝোপটা দেখতে থাকলুম। দেখলুম, কালো বিষ-পিঁপড়ে, লালপোকা, মাকড়সার জাল, ছত্রাক, সাপের খোলস, শ্যাওলা, ভাঙা ডিম, গিরগিটি, সবুজ সাপের ছায়াধূসর স্যাঁতসেঁতে উর্বর পৃথিবীতে আলুথাল চুলে লালী শুয়ে আছে। ভাঁড়ুলে গাছের নিটোল গুঁড়ির মতো খয়েরি

দুই উরু, ‘শঙ্খের মতন করুণ যোনি’, তার ধূসর দুই স্তনের বোঁটায় হাজার-লক্ষ বছরের মানুষের শৈশব জটিল হরফে লেখা। ফিসফিস করে ডাকলুম—লালী!

আর বাঁধের দিকে পরপর দু’বার শব্দ হল। চমকে উঠে দেখলুম, দয়াময় উড়ন্ত পাখির ঝাঁক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছেন। ঝাঁকটা ভয় পেয়ে আমার মাথার ওপর এসে পড়তেই আমিও ভয়ে মাথা নাড়ালুম। তারপর আড়চোখে দেখি দয়াময় এদিকে বন্দুক তুলছেন। পাখিগুলো দূরে চলে গেল। কাঠ হয়ে বসে আছি। তারপর দয়াময়ের জুতোর শব্দ হল। —এখনও বসে আছ, দেখছি!

—না। ফিরব। আপনি এরই মধ্যে ফিরলেন যে?

—ফিরলুম। তোমাকে একথা কথা বলতে বাকি ছিল।

—বলুন।

—নদীর ধারে সবজিচাষ করত একটা লোক। ওই ওখানটায়। তোমার মনে পড়ে?

—হ্যাঁ। গণেশ রাজবংশী। সে নাকি জ্যোৎস্নায় চরে পরী নামতে দেখেছিল। তার ছেলেকে মনে পড়ে?

—খুব। কী যেন নাম ছিল—

—সীতু।

—হ্যাঁ, সীতু। পাঠশালায় আমাদের সঙ্গে পড়েছিল।

দয়মায় ঘোঁত ঘোঁত করে হাসলেন।—সে রাতে লালী কোথায় যাচ্ছিল জানো? সীতুর কাছে।

আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম ওঁর মুখের দিকে।

—সীতুরা থাকত ওখানেই। আর লালী তাদের খবর নিতে যাচ্ছিল। তাছাড়া আর কী বলব?

—কেন?

—বুঝতে পারছ না কেন? দয়াময় জ্বলে উঠলেন। কয়েক মুহূর্ত চাপা শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ হল। তারপর বললেন—খুব ছেলেবেলা থেকে এটা চলছিল—একটুও তলিয়ে ভাবি নি। ওই শুওরের বাচ্চাটা লালীকে নষ্ট করেছিল। লালীকে সে......

অনেক কষ্ট পাচ্ছেন দয়াময়, তাই কথা আটকে গেল। চোখমুখ লাল হয়ে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে আবার বললেন—পরে গণেশ বলেছিল আমাকে। লালী বন্যার রাতে ওদের কুঁড়েয় যায়। তখন ছোঁড়াটা ছিল না। রিলিফের নৌকো ডাকতে গিয়েছিল গ্রামের দিকে। ওর বাবা গাছের ডালে বসেছিল। অন্ধকারেও ওর চোখে কিছু এড়ায়নি। ও লালীকে টের পেয়েছিল। খুব বকাবকিও করেছিল। কেন এই দুর্যোগে এভাবে এসেছে? তারপর ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে এ কি সর্বনেশে কীর্তি। তারপর—ঘোড়ার মতো মুখ তুলে হাসলেন দয়াময়।

—তারপর?

—তারপর লালী আবার ভেসে যায়। বুড়ো আর ওকে দেখতে পায়নি।

—তাহলে পথে এই ঝোপের মধ্যে...

কথা কেড়ে দয়াময় বললেন—কী ঘটেছিল আমি জানি না। হয়তো কাপড়ে আটকে গিয়েছিল।

—না। ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছিল তখন।

দয়াময় আমার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকালেন।

—আমার সঙ্গে সন্ধ্যায় ওর দেখা হয়। তারপর ও সাঁতার কেটে ওদিকে চলে গিয়েছিল।

—তুমি জানো, সীতু ছোঁড়াটাকে কী শাস্তি দিয়েছি?

—খুন করেছেন?

—এই ঝোপের তলায় মাটির অনেক নিচে তাকে লালীর জন্যে অপেক্ষা করতে পাঠিয়েছি।

—আর গণেশবুড়ো?

—তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। মাঝে মাঝে তার কাছে যাই, লালীর কথা শুনতে। লালীর আরেকটা জীবন ছিল। ও জানত, আমি জানতুম না।

—আমি একবার যাব বুড়োর কাছে।

—যেও। তবে কষ্ট পাবে। আমি বাবা। হয়তো কষ্ট পাই। হয়তো কষ্ট পেতেই যাই। তুমি কি কষ্ট পেতে চাইবে লালীর জন্য? তোমাকে তো ও ভালই বাসে নি!

বলে দয়াময় কেমন একটু হাসলেন। তারপর কিছু না বলে হনহন করে মাঠের দিকে এগোতে থাকলেন।

তা হলে সীতুর জন্যই লালী.....আমার গলায় কী আটকে গেল। তাই নিয়ে গণেশ রাজবংশীর কুঁড়েঘরটার দিকে চললুম। আমি লালীর অন্য জীবনের কথা শুনব, যা আমার আজও শোনা হয়নি। সবুজ তেজী উদ্ভিদের ভেতরে এখন বুড়ো চাষা হাঁটু দুমড়ে বসে আছে। আমাকে দেখলে বেরিয়ে এসে ভিজে ধুলোয় ধূসর শরীর ছায়ায় এলিয়ে রেখে ফ্যাকাসে চোখে পৃথিবীর একটা পুরানো গল্প শুরু করবে। সেই গল্পের কোন শেষ নেই। কারণ সেই গল্প লালী নামে এক মেয়ের—যে স্বাধীনতা জেনেছিল।.......

বাগাল

ধানু মোড়লের খড়কাটার কুঠুরিতে ওপরে খড় নিচে খড় মধ্যিখানে বছর আষ্টেক বয়সের এক মানুষ শীতের লম্বাটে রাতগুলোকে ভোর করে। একখানা চটও আছে। গুটিয়ে পড়ে থাকে একপাশে। মোড়ল বলে, 'তু এত খ্যাদোড় ক্যানে রে হরিবুলা?'

সেই ক্ষুদে মানুষ শুধু দাঁত বের করে।

খ্যাদোড় মানে নোংরা। মোড়লগিন্নি সন্দিগ্ধভাবে খড়গুলোর দিকে তাকাতে আসে। মানুষের হিসিমাখা খড় গরুকে খেতে দেওয়া অধর্ম। 'বল সত্যি করে, বিছানা লষ্ট করেছিস নিকি?' মোড়লগিন্নি তর্জনগর্জন করেন।

হরিবোলা নিজের কান ছুঁয়ে তিনসত্যি করলেও সন্দেহ ঘোচে না।

ধানু মোড়ল বলে, 'উই হুদমুসলোর তিনসত্যির কিছু মুইল্লো আছে? ছেড়ে দাও বরঞ্চ।'

হুদমুসলো মানে গোঁয়ার। এবার মোড়লগিন্নি তাকে মোক্ষম আখ্যাটিতে ভূষিত করে, 'হাসতে লজ্জা করে না রে ক্যালাগোবিন্দা?'

অর্থাৎ নির্বোধ। হরিবোলার এই তিনি আখ্যা। খ্যাদোড়, হুদমুসলো, ক্যালাগোবিন্দা। আঞ্চলিক ভাষায় নিকৃষ্ট এই শব্দগুলি রোজ সকালে হরিবোলার উপহার লাভ। এরপর তার কাজ শুরু বাসিমুখে গোয়ালঘর থেকে গরুগুলোকে বের করে বাইরে বেঁধে এসে ঘর পরিষ্কার। জমাট গোবর যাবে গোয়ালঘরের পেছনে—গোলাকার স্তূপ হয়ে থাকবে, চারদিক ঘিরে বড় বড় ফুলন্ত মেথো ঘাস। সেই ঘাসের মাথায় একটা গাব্দামোটা ধানফড়িং দেখতে পেলে সে তার শালিখ ছানাটির জন্য ধরার চেষ্টা করবেই। এতে দুদণ্ড সময় যাবে। তখন মোড়লগিন্নি খিড়কির দোরে উঁকি মেরে আবার খ্যাঁক করবে। হরিবোলা গোবরমাখা ভাঙা বালতি আর ফড়িংটাকে মুঠোয় ধরে আবার দাঁত বের করবে। যখন সে তরল গোময় আর মেঝের কাদার মিশ্রণে বালতি ভরছে, তখন ফড়িংটা তার হাফপেন্টুলের দড়ির খোপে ঢুকে গেছে।

এরপর ডোবার ঘাটে হাতপা ধোয়া। বাসনমাজার ছাই পড়ে থাকে সেখানেই। মোড়লগিন্নির ছায়া দেখলে সে ঝটপট সেই ছাই তুলে দাঁতে ঘষতে থাকবে। গিন্নিমা নোংরা একেবারে সইতে পারে না। বলবে, 'রগুড়ে মাজ দাঁতগুলান—নৈলে আজ খাওয়াদাওয়া বন্ধ।' কিন্তু গিন্নিমার নিজের দাঁতগুলো কালো কেন, সে কথা তুললেই রাক্ষুসী হয়ে তেড়ে আসবে।

একবোঝা খড় কেটে তবে খাওয়া। অর্থাৎ এককোঁচড় মুড়ি। একটুখানি গুড়ের ডেলা। নৈলে আধখানা পেঁয়াজ।

গরুগুলো রোদ্দুরে তখনও ঘুমঘুম চোখে তাকিয়ে পৃথিবী দেখছে। একটু তফাতে বসে হরিবোলা মুড়ি চিবোচ্ছে। শালিখছানাটি তার কাঁধে। তারও ঘাস ফড়িংটা খাওয়া হয়েছে। তার চোখদুটোও নিষ্পলক পৃথিবী দর্শন করছে।

তারপর এল হেমা গয়লানী দুধ দুইতে। মোড়লগিন্নির কোমরে বাত বলে পা দুমড়ে বসতে পারে না ইদানীং। হেমা যতক্ষণ দুইবে, হরিবোলার কাজ বাছুরটিকে কান ধরে

টেনে রাখা। বাছুরটি দুপা ঠোকে। কান ছাড়িয়ে নিতে মাথা এদিক ওদিক করে। হরিবোলা খিটখিট করে হাসে।

কেন হাসে সেই জানে। হেমা ধমকায়, 'অত হাসি কিসের রে ছোঁড়া সাত-সকালে?' তারপর দুধ দোহানো শেষ করে উঠে দাঁড়ায়। হাতে পেতলের চোঙায় দুধের ফেনা। কী মনে করে হরিবোলাকে দেখতে দেখতে বলে, 'তুই কি শীত-খরা বলতে নাই রে ড্যাকরা ছোঁড়া? এই শীতে মোষের শিঙ নড়ে যায়, আর খালি গায়ে দাঁত ক্যালাচ্ছিস কী করে বাপু?'

পেছন থেকে মোড়লগিন্নির অভিমানে আহত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'উয়াকে কি জামাকাপুড় দেওয়া হয়নি—জিগ্যেস করো না একবার! উটা কি মানুষ ভাবছ তুমি?' মোড়লগিন্নি ওর বিছানার শোয়ার বিবরণ দিতে থাকে। সেই চটখানির গুটিয়ে পড়ে থাকার বৃত্তান্ত। ভিজে খড়ের কুচ্ছো। লাল গেঞ্জি কিনে দিয়েছিল, দুদিনেই ছিঁড়ে ফালাফালা। বড়ই হুদমুসলো। বেজায় খ্যাদোড়। একের নম্বর ক্যালাগোবিন্দা।

হেমা দুধের পাত্র সমর্পণ করে বলে, 'তাই বটে বাপু!' হ্যাঁ গো, আঙাদাসীর কুনো খবর নাই?'

আঙাদাসী মানে রাঙা দাসী। এই হরিবোলার মা। গতবছর হঠাৎ মোড়ল বাড়ি থেকে চলে গেল তো গেলই। গিন্নির সঙ্গে নাকি ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। গিন্নি বলেছিল, 'রোজ চাল চুরি করে বেচে আসত। তার ওপর খানকীর স্বভাব। কেমন সাজের ঘটা দেখতে না মাগীর? বাজারী! বেউশ্যে!'

এমন মেয়ে রাঙাদাসীর খবর রাখার দায় পড়েছে কার? মোড়লগিন্নি চটে যায় হেমার কথায়। 'আবার সাতসকালে ওই অলুক্ষণে পাড়ামাতানীর নাম? অত দরদ থাকলে তুমি লিয়ে এস খবর!' দুধের পাত্রটি নিয়ে থম থম করে বাড়ির ভেতর যায়। ভেতরে গিয়েও রাঙাদাসীর খেউড়।

হেমা বাঁকা মুখে গুম হয়ে থাকে। তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে চাপা গলায় বলে, 'আর তু ছোঁড়ারও বলিহারি যাই রে! হাজার হলেও মা জননী! ধন্যি বাবা, উই পক্ষীটিও মা মা করে চ্যাঁচায়।'

সেও চলে যায়। তখন হরিবোলার চোখ মাঠের দিকে। মাঠের ওপর কুয়াসা জমে আছে। ওই কুয়াসার ভেতর আছে এক নদী। নদীর পারে কাশফুলের বন, বিল-বাঁওড়, হিজল ভাঁড়ুলে বাবলা গাছের টুঙ্গি। কখন সেখানে যাবে, সেই প্রতীক্ষা শুধু। নদী পেরুলেই তো হরিবোলা আর এই হরিবোলাটি থাকে না। তখন যেন চিতে বাঘের বাচ্চা। চেরা গলায় গান জুড়ে দেয়, 'দড়কা লধির উধারে/যৈবন পড়্যে আছে হে...' যৌবনের বৃত্তান্ত না জেনেও।

ধানু মোড়ল নদী পর্যন্ত সঙ্গে যায়। হরিবোলার তখন পান্তা খেয়ে পেটটি ঢোল। বাকি দিনটার ক্ষিধের জন্য বরাদ্দ ফের এক কোঁচড় মুড়ি। কিন্তু হরিবোলা তার বদলে দুমুঠো চালই পছন্দ করে। দুধসর নামে এক নালা আছে। তার ধারে ভাঁড়ুলেগাছের নেমে যাওয়া শেকড়বাকড়ে ন্যাকড়ার একদিকটা বেঁধে অন্যদিকে বাঁধা চালগুলো জলে ডুবিয়ে রাখে। দুপুর গড়িয়ে এলে সেই চাল তখন দুধের মত শাদা, ফুলো খই যেন, আর কী স্বাদ! চড় মারলেও মুখ থেকে ছাড়ে না।

নদীর ধারে বাঁধের বটতলায় দাঁড়িয়ে মোড়ল হরিবোলার নদী পেরুনো দেখে তারিয়ে-তারিয়ে।

গমক্ষেতের মুনিশকে শুনিয়ে বলে, 'ইঃ! যেন চিতেবাঘের বাচ্চা! যতক্ষণ লদির ইধারে, ততক্ষণ নিমুনমুখো ষষ্ঠি—যেন ক্যালাগোবিন্দাই বটে। যেই লদিটি পেরুলো, আর উইরকম। চেহারিটিও বদলে যায়।'

মুনিশ মুখ তুলে বলে, 'কার কথা বুলছেন মুরোলমশাই?'

'এই হরিবুলা হে।'

'অ, হরিবুলা!'

হরিবোলার চেরা গলার গান ভেসে আসে ওপারের প্রান্তর থেকে, 'দড়কা লধির উধারে/যেবন পড়্যে আছে হে...' মোড়লমশাই প্রত্যঙ্গ চুলকোতে চুলকোতে খিকখিক করে হাসে। 'অই, শুনছ শালোব্যাটার রসের কথা? এখনও গুয়োর ডিম ভাঙেনি। যৈবন চিনেছে।'

মুনিশ বলে, 'আচ্ছা মুরোলমশাই, হরিবুলার মায়ের খবর কী?'

'শুনেছি টাউনে আছে—ওইটুকুনই।'

'হরিবুলা মায়ের কথা কিছু বুলে না মুরোলমশাই?'

'নাঃ!' ধানু মোড়ল মুখ বাঁকা করে গম্ভীর হয়। 'আমার কাছে কি কষ্টতে আছে? থাউক না। টিকতে পারলে বিভা দুবো। বাড়ির পেছনে জায়গা-থল দুবো। থাউক।'...

রাঙাদাসী এক আশ্চর্য মেয়ে। আশ্চর্য—কারণ তার গায়ের রংটা ছিল বাবুবাড়ির মেয়েদের মতো ফর্সা। চোখদুটো কয়রা—বিড়ালচোখী বলে যাদের। সাজতেগুজতে ভালবাসত। ভালমন্দ জিনিসটাতে ছিল প্রচণ্ড লোভ। গউরের মতো একটা লোক কেমন করে তাকে ভাগিয়ে এনেছিল, সেও এক আশ্চর্য। গউরও অবশ্য একটু শৌখিন এবং টাউনমুখো মানুষ ছিল। রিকশোও চালিয়েছিল মাসকয়েক। তারপর হাঁপের অসুখ বাঁধিয়ে ঝটপট মরে গেল। রাঙাদাসী কোলের ছেলেটাকে নিয়ে সেই থেকে ধানু মোড়লের বাড়ি কাজকর্ম করত। ভিটেমাটি বেচে মোড়লবাড়িতে উঠেছিল শেষে। গিন্নির সঙ্গে কলহ করে টাউনে চলে গেল। গউর তাকে টাউন চিনিয়েছিল, নাকি সে গউরকে, এও একটা আশ্চর্য।

আরও কিছু আশ্চর্য আছে।

রাঙাদাসীর নাকি আরেক নাম ছিল হরিমতী। গউর ডাকত হরিমতী বলে। সেই শুনে সদ্য মুখফোটা ছেলেটাও হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ভিটেয় চরতে চরতে দুঃখকষ্ট পেলে চেঁচিয়ে ডাকত আধো-আধো 'হয়ি' বলে। রাঙাদাসী হাসতে হাসতে বলত, 'আরে আমার হরিবুলা সোনারে! হরি বলতে শিখেছে আমার ময়না পাখি রে!' সেই থেকে ছেলেটা হরিবোলা হয়ে গিয়েছিল।

ক্রমে ক্রমে চাউর হয়, মেয়েটা ছিল মল্লারপুরের ঝুমুরদলের। —সেই যারা মেলার আসরে মাঝরাতে কোমর মুচড়ে নাচে এবং গায়, 'বঁধু, লাও বা না লাও/মুখ দেখে যাও/বাসি কাচের আয়না।' বাসি ভাতের বাসি ফুলের মতো আয়নাও বুঝি বাসি হয়। নিঝুম দুপুরে মোড়লের ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে আনমনে রাঙাদাসী বা হরিমতী গুনগুন করে গান গাইত। মোড়লগিন্নি কান করে শুনে বলত, 'গাইবি তো ঝেড়ে গা দিকিনি বাবু!' রাঙাদাসী থতমত খেয়ে বলত, 'উ কিছু লয় গিন্নিমা!' সে বুঝত, গিন্নি বলছে বটে মুখে, পরে তাই নিয়ে খোঁটা দেবে। বাজারী গানেউলি, ঝুমরি-টুমরি বলতেও বাঁধবে না।

হরিমতী র‍্যাশংকাডে হয়েছিল রাঙাদাসী। সেই র‍্যাশংকাড ধানু মোড়লের জিম্মায় আছে। চিনিটা আর ক্যারাচতেলটার খুব আকাল পাড়াগাঁয়ে লেগেই আছে। লরেন্দ মাস্টের ডিলার। ঠাট্টা করে এখনও বলেন, 'কী মোড়লমশাই, রাঙাদাসীর কোটা আর কতকাল নেবে? ছেড়ে দিলে আরেক গরিবগুবরোর বেনিফিট হয়।'

মোড়ল হ্যা হ্যা করে হাসে। 'আঙাদাসী নাই। উয়ার ছেলেটা কি মিথ্যে মাশাই? তার চিনিটা ত্যালটা লাগে না?

লরেন্দ চোখের নৃত্যে বলেন, 'তোমার বাগালকেও চিনি দাও বুঝি? কিসে দাও মোড়ল? সরবতে, না গুড়ে?'

ধানু মোড়ল মনে মনে চটে। বলে, 'ক্যানে? চা। চা খায়।'

'বলো কী?! চা খায় তোমার বাগাল?'

লোকে হাসলেও রাখাল-বাগাল, মুনিশ-মাহিন্দার আজকাল চা খায়, এও সত্যি। ধানু মোড়লের কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু রাঙাদাসীও চা খেত। তার ছেলে হরিবোলাও মায়ের বাটির তলানিটুকু চুকচুক করে টানত। পরে সেও মায়ের কাছে রোজ সক্কালবেলা বাটিভরা চায়ের দাবি তুলত। তবে ছেলেটা যখন দ্বারকা নদীর ওপারে যেতে শিখল, তখন তার কাছে চা তুচ্ছ হয়ে গেল। দিনে দিনে বদলে গেল সে। রাঙাদাসী অবাক হয়ে তার ছেলের বদলে যাওয়া দেখত।

রাঙাদাসী গউরের কুঁড়েঘরের উঠোনে যে ছেলেকে পায়ের ওপর শুইয়ে তেল-কাজল দিতে দিতে সুর ধরে বলত, 'আমার ধোন ইস্কুলে পড়বে রে! নেকাপড়া শিখে চাকুরি করে আমাকে খাওয়াবে রে!'— সেই ছেলে যায় দ্বারকা নদীর ওপারে গরুর পাল নিয়ে। তার চুলে থাকে ট্যাঁসকোনা পাখির পালক। তার কাঁধে থাকে শালিখপাখির ছানা। নুড়ি দিয়ে ঘাসফড়িং খোঁজে। কতরকম নাম জানে ঘাস-ফড়িঙের—ঘরপোড়া, তল্লা, বাজ। রুক্ষ কাঁকরে ডাঙায় বেঁটে লালরঙের ফড়িংগুলো ঘরপোড়া। কুপির আলোয় বাঁশের চোঙা থেকে সারাদিনের সংগ্রহ সে মাকে দেখাত। লম্বাটে সবুজ ফড়িং দেখিয়ে বলত, 'ইগুলান তল্লা।' বেঁটে, ধূসর ডানা, তলার দিকটা ফিকে সবুজ আর পেট জুড়ে ফুটকি—'ই দ্যাখো মা, বাজ।' তার পাখিটাও ছিল পেটুক। খাঁচা ছিল না বলে তাকে বেড়াল এসে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হরিবোলা দুদিন পরে আবার একটা নিয়ে আসবেই। তার তখন পাখি-ঘাসফড়িংদের পৃথিবীতে চলাফেরা! ইস্কুলের উল্টোদিকে সেখানে যাবার রাস্তা, সেই রাস্তায় রাঙাদাসীর চোখের সামনে হেঁটে গেল তার হরিবোলাটি। দেখতে দেখতে একটুকুন হয়ে মিলিয়ে গেল কাশকুশের বিশাল প্রান্তরে।

আর প্রতিদিন ফিরে এসে সে মায়ের কাছে সেখানকার গল্প বলত। সিঙাকুড়ির জামগাছটার কাছে কী ঘটেছিল, বাঁওড়ের ধারে কত কুল পেকেছে (সেই কুলের কিছু নমুনাসহ), আজ বলাই সিঙ্গির সঙ্গে মেছুনীদের ঝগড়া হয়েছিল কী নিয়ে—এইসব। সে বলত কাশবনের কথা। জলে শাপলার ঝাঁকের কথা। একলা কোনো হিজলগাছের অন্ধ পেত্নীর কথা, বুড়ো যোগীবর আর একটা হট্টিটি পাখির কথা। দিনমান সে ট্টিট্টি করে ডেকে বেড়ায়। যোগীবরও জানে না তার বৃত্তান্ত। 'ক্যানে বেড়ায় মা?' রাঙাদাসী জানে না। চিমটি কেটে বলত, 'মুখ ধরে যায় না তুর? ইবারে লোক করে ঘুমোদিকিনি!'

হরিবোলা লোক (চুপ) করবে না। এরপর বলবে মাঠকুড়োনি মেয়েদের কথা। শেষে পরামর্শ দেবে। 'তু ক্যানে যাস নে মা লধির উধারবাগে! বীণামাসিরা যায়। সম্মাই যায়। ভাদুর মা যায়। তু ক্যানে যাস নে মা?'

রাঙাদাসী রাগ করে বলবে, ‘আমার মরণ!’

‘ক্যানে মা, মরণ ক্যানে?’

রাঙাদাসী আস্তে বলবে, ‘আমি মাঠঘাটে কখনও ঘুরিনি বাছা। ছরতে ওদবাতাস সয় না। চেরটাকাল টাউনবাজারে মানুষ হইছি—পারি না।’

প্রেম হরিমতীকে পাড়াগাঁয়ে ভাসিয়ে এনেছিল। সে রাঙাদাসী হয়েছিল। তার প্রেমের বয়স চলে যায়নি, কিন্তু প্রেমিকটি মারা পড়েছিল। এই ছেলেটা না থাকলে রাঙাদাসী আবার হরিমতী হবার জন্য পা বাড়াত। কিন্তু কোলে ছেলে থাকলে হরিমতী হওয়া বড় সমস্যা। সে যেন হরিবোলার বড় হওয়ার দিন গুণছিল। বড় হতেই চলে গেল...

মাঘে যখন দ্বারকা নদীর শিয়রে বুড়ো শিমুল গাছটা মাথায় লাল ফেট্টি জড়াল, ধানু মোড়লের আমের গাছে ফুটল লালহলুদ শিসালো মুকুল, তখন একদিন লরেন্দ মাস্টেরের ভাই মলিন্দ এসে বলল, ‘ও মোড়লমশাই, তোমার বাগাল কোথা?’

ধানু মোড়ল মোড়ায় বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল ঢ্যারা ঘুরিয়ে। অবাক হয়ে বলল, ‘ক্যানে বাবা মলিন্দ?’

মলিন্দ চোখে ঝিলিক তুলে বলে, ‘রাঙাদাসীর সঙ্গে কাল দেখা হল মেদিগঞ্জের বাজারে।’

মোড়ল শুধু বলে, ‘অ’।

মলিন্দ খিক খিক করে হাসে। ‘সে রাঙাদাসী আর নাই মোড়লমশাই। এক্কেবারে ফিলিম-ইস্টার।’

‘অ’।

‘কী পরনের ডেরেস, কী জেকচার-পশ্চার। ঠোঁটে লিপিস্টিক! বুঝলে তো?

‘অ’।

মলিন্দ আরও হেসে বলে, ‘ধুত্তেরি! খালি অ অ করে। বুঝলে কিছু?

ধানু মোড়ল একটু হাসে। ‘তা না হয় বুইলাম। কিন্তক কী কথাবাত্তা হল তুমার সঙ্গেতে?

‘প্রথমে তো চিনতেই পারে না, এমন ন্যাকামি মাগীর। তো আম্মো বাবা ছিনে জোঁক। শেষে নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।’ মলিন্দ বারান্দার চৌকিতে গিয়ে বসে। বিস্তারিত বলার ইচ্ছায় একটা সিগারেট ধরায় এবং মোড়লকেও দেয়।

মোড়ল ফুকফুক করে টেনে বলে, ‘হরিবুলার কথা জিগ্যেস কল্লে না?’

‘বলছি, শোনই না।’ মলিন্দ লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলে। ‘প্রথমে তো একথা, সেকথা—গাঁয়ের কার কী খবর। তারপর বললে, হরিবোলা কেমন আছে, কী করছে এইসব। আমি বললাম, মোড়লমশাইয়ের বাড়িতে আছে, ভালই আছে। খারাপ থাকবার তো কথা না। তবে তুমি এখানে কী করছ, তাই বলো।’

‘জিগ্যেসা কল্লে তুমি?’

'হ্যাঁ-অ্যাঁ। আমি বাবা ছিনে জোঁক। না শুনে ছাড়ব না। সেও কিলিয়ার করে বলবে না। শেষে বলল, এক বাবুর বাড়ি কাজ করছে। টাউনবাজারে আজকাল ঝিয়ের অভাব—ভালই মাইনেকড়ি পাচ্ছে।'

মোড়ল বলে, 'মিথ্যে।'

'মিথ্যে তো বটেই—সে কি আমি বুঝি না? ঠোঁটে লিপিস্টিক!' মলিন্দ খ্যা খ্যা করে হাসে। শেষে বললাম, 'তা তুমি তো দেখছি ভালই আছ। ছেলেটাকে দেখে আসবে না একবার? চলো আমার সঙ্গে।'

'ত্যাখন কী বল্লে?'

'বললে সময় পাই না—এত কাজ। পেলেই যাব। নিয়ে আসব।'

মোড়ল নড়ে উঠে সোজা হয়। 'কী বল্লে, কী বল্লে?'

মলিন্দ আশ্বস্ত করে বলে, 'নিয়ে যাবে কোথা? ছেলে সঙ্গে থাকলে ও বিজনেস তো পণ্ড। বুঝলে না? শেষে আমাকে সঙ্গে করে জামাকাপড়ের দোকানে গেল। এই দেখ, কীসব কিনে দিয়েছে হরিবোলার জন্যে।'

এতক্ষণে ধানু মোড়লের চোখ পড়ে প্যাকেটটাতে। তাচ্ছিল্য করে তাকিয়ে বলে, 'কী আছে বলো দিকিনি?'

'একটা পেন্টুল, একটা জামা। বললে, পায়ের মাপ জানা থাকলে জুতোও কিনে দিতাম। একবার সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও বললে। বলে আবার কী মনে হল বললে, 'থাক। নিজেই যাব একদিন।' মলিন্দ জামা আর হাফপেন্টুল মোড়লকে দেখিয়ে আবার ভাঁজ করে প্যাকেটস্থ করে। চাপা হেসে বলে, 'ঠিকানা নির্ঘাৎ বাগানপাড়ার গলি—সে ঠিকানা দেবে কোন মুখে? তাই আসবে বলল।'...

যাবার সময় হঠাৎ ফিরে এসে একটা ছোট্ট ঠোঙাও দিয়ে যায় মলিন্দ। ভুলে গিয়েছিল, রাঙাদাসী তার ছেলের জন্য লজেন্সও কিনে দিয়েছে। নগ্ন চৌকিতে সেগুলো পড়ে থাকে কতক্ষণ। ছুঁতে ইচ্ছে করছিল না ধানু মোড়লের। মোড়ল-গিন্নি জানতে পারলেও সমস্যা। তার বড্ড ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক।

কিন্তু না জানিয়েও থাকা যায় না। দড়ি পাকানো শেষ করে আস্তেসুস্তে উঠে দাঁড়ায় ধানু মোড়ল। কাঁচাপাকা চুল আর গোঁফে হাত বোলায়। তারপর প্যাকেট দুটো বাঁহাতে তুলে চালের বাতায় গুঁজে রাখে।

নদীতে স্নান করে এসে খেতে বসার সময় মোড়ল ফিক করে হাসে। 'একটা খবর শুনলে গো? আঙাদাসী মেদিগঞ্জতে আছে। যা বলেছিলে তুমি, তাই। বেউশ্যেতে নাম নিকিয়ে বসে আছে। মলিন্দ বলে গেল।'

নাক বাঁকা করে মোড়লগিন্নি বলে, 'মরুক বারোভাতারি। খাবার সুময়ে উ কী কথা?'

'নাঃ—বলছি কী, হরিবুলার জন্যেতে জামাপেন্টুল আর লেবেনচুষ পাঠিয়ে দিয়েছে মলিন্দর হাতে।'

মোড়লগিন্নির চোখ বড় হয়ে যায়। বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, 'সত্যি নাকিন?'

'সত্যি বৈকি। বাইরেকার ছাঁচবাতায় গুঁজে থুয়েছি। দ্যাখো গে—পেত্যয় না গেলে।'

মোড়লগিন্নি থম থম করে উঠে যায়। মোড়ল কতক্ষণ তার ফেরার অপেক্ষা করে! ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে সন্দিগ্ধভাবে দ্রুত আহার শেষ করে নেয়। তারপর যখন উঠোনের কোনায় লেবুগাছটার কাছে ঘটি থেকে জল ঢেলে আঁচাচ্ছে, তখন মোড়লগিন্নি তেমনি থম থম করে ফিরে আসে। মুখখানা জ্বলছে দাউ দাউ করে। নাসারন্ধ্র স্ফীত।

মোড়ল একটু হেসে বলে, 'দেখলে?'

প্রৌঢ়া জবাব দিল না। টিউকলে গিয়ে রগড়ে হাত ধুতে থাকল।...

দিনকতক পরে সন্ধ্যাবেলায় দ্বারকা নদীর ওপার থেকে গরু চরিয়ে বাগাল হরিবোলা ফিরে এসেছে। চেরা গলায় বাইরে যথারীতি 'গিন্নিমা, আলো' বলে চিক্কুরও ছেড়েছে। গিন্নিমা লণ্ঠন দেখিয়েছে এবং সে গরুবাছুর গোয়ালে বেঁধে ফেলেছে। তারপর অন্ধকারে ডোবার জলে হাতমুখপা ধোয়াপাখলা করে সর্ষের তেলটুকুনও চেয়ে নিয়েছে। গায়ে-গতরে মেখে উঠনের কোনায় বসে তেমনি চিক্কুর ছেড়েছে, 'গিন্নিমা! ভাত দ্যাও।'

উঁচু দাওয়ায় লণ্ঠন জ্বলছে। নিচের উঠোনে সেই আলোর হলদে চকরাবকরা ছটা খানিকটা। একটু তফাতে বাড়ির কুকুরটার বিরাট ছায়া পাঁচিলের গায়ে, লেজটা নড়ছে, মুখটা হাঁ। হঠাৎ একমুঠো গিলেই হরিবোলা আরেক চিক্কুর ছাড়ে, 'গিন্নিমা, গিন্নিমা! আমার জামাপেন্টুল? আমার লেমুনচুষ!'

মোড়লগিন্নি গুম হয়ে বলে, 'খাবি তো খা দিকিনি বাপু! পরে উসব কথা।'

হরিবোলা হুদমুসলো, সে তো মিথ্যে নয়। দিনমান জানোয়ারের সঙ্গে বনেপ্রান্তরে বাস, বাগগাল। বাগালের গাঁ। একটু পিছিয়ে গিয়ে চ্যাঁচায়, 'আগে দ্যাও, তমে খাব।'

মোড়লগিন্নি ফুঁসে ওঠে। 'শুনছ, শুনছ তুমার বাগালের কথা? কেমুন বুলি ফুটেছে শুনছ?'

দাওয়ায় মোড়া থেকে ধানু মোড়ল খুক খুক করে হাসে। 'অ হরিবুলা? কে তুকে বল্লে জামাপেণ্টুলের কথা?'

হরিবোলার দাঁত চকচক করে। মাস্টেরের ভাই মলিন্দবাবু বুললে, তুর মা তুকে জামাপেণ্টুল দিয়েছে। লেমুনচুস দিয়েছে!' সুর ধরে আওড়ে সে এঁটো হাতটাও ওপরে তুলে নাচতে থাকে।

মোড়লগিন্নি বেগতিক দেখে চাপা গলায় বলে, 'উ জিনিস ছুঁতে নাই, হরিবুলা। বয়েস হলে বুইতিস, ক্যানে ছুঁতে নাই। ভাতগুলান খা দিকিন দয়া করে। মুড়ল তুকে নতুন জামাপেণ্টুল কিনে দিবে।'

মোড়ল ঘোষণা করে, 'দুবো। কটা দিন অপিক্ষা কর! ক'বস্তা চাল বেচতে যাব আড়তে। তুকে লিয়ে যাব। এখুন যা কচ্ছিস, তাই কর।'

ক্যালাগোবিন্দা বাগাল অমনি শান্ত হয়ে বলে, 'লিয়ে যাবা তো মুরোল?'

'হুঁ, হুঁ, লিয়ে যাব। তুর মা-জননীকেও দেখে আসবি।'

ঝোঁকের বশে ধানু মোড়ল একথাও বলে ফেলে এবং তারপর ভাবে, বলেই যখন ফেলেছে, মুখের কথা বৈ নয়। কোথায় রাঙাদাসী থাকে, সঠিক জানা নেই—মলিন্দেরও। তবে জানা থাকলেও সাধুগিরি করে মায়ে-ছেলেতে মিলিয়ে দিলে উল্টে হয়তো নিজেরই বিপদ বাধবে। পেটভাতায় এমন খাঁটি বাগাল পাওয়া সহজ নয়। বছর সন মাইনেকড়ি

আছে, তার ওপর বাবা-মাকে ধান ধার দাও, এটা দাও, ওটা দাও—সম্বচ্ছর ঝামেলা। হরিবোলার সে ঝামেলা নেই।

রাতে বিছানায় শুয়ে মোড়ল বউকে চুপিচুপি বলে, 'জিনিসগুলান আস্তাকুড়ে না পুঁতলেও পারতে। মেয়েটা বেউশ্যে হয়েছে, জিনিসগুলান তো হয়নি।'

মোড়লগিন্নি গর্জন করে বলে, 'থামো তুমি! বুইতে পাল্লে না ক্যানে দিয়েছে, এত যে মুড়লি মেরে বেড়াও গাঁয়ে!'

মোড়ল কেঁচো হয়ে বলে, 'ক্যানে দিয়েছে বলো দিকিনি?'

'নোভ দেখাতে। ক্রিমে ক্রিমে নোভ বাড়বে জামাপেণ্টুল পরে। তখন আর তুমার বাগালী করবে ভেবেছ নাকিন? টাউনবাগে দৌড়ুবে না?'

মাথা নেড়ে মোড়ল বলে, 'ঠিক, ঠিক।'

'মাগী টোপ ফেলেছিল।' শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে মোড়লগিন্নি পাশ ফিরে বলে, 'তমে সত্যি যদি ই বাগে আসে, উয়ার চুল কেটে ন্যাড়া করে ফেরত পাঠাব। নখাই, যদু, মকুন্দ—সবাইকে বলে রেখেছি। ই মাটিতে পা দিয়ে একবার দেখুক না কলঙ্কিনী!'

বিবেচক মোড়ল আস্তে বলে, 'আহা, ছেলেটা তো উয়ার। চাইলে আইনত ধম্মত...'

মোড়লগিন্নি বাঘিনীর গর্জনে বলে, 'তুমি থামো! ভালমানুষী কত্তে হয়, বারোয়ারিতলায় যাও।'

'আহা, হরিবুলা যদি যেতে চায়?'

'যাচে না।' হঠাৎ শান্ত অথবা নিস্তেজ হয়ে যায় প্রৌঢ়া মেয়েটি। 'লদির উধারে হরিবুলার মন বসে যেয়েছে। তুমি দেখো, উ কক্ষনো যাবে না।'...

যাবে না, কারণ দ্বারকা নদী পার হলেই সে এক অন্য হরিবোলাটি। দিনমান তার চোখে ছবির মতো আঁকা হয় কাশকুশের ধূসর ব্যাপকতা, দাগড়া দাগড়া হলুদ সর্ষে ফুলের ছোপ কাছে এবং দূরে, শালিক পাখির ডিম হয়ে থাকা চিত্রিত নীলাভ আকাশ, আর ওই একলা ওড়া হট্টিটি পাখিটার টি টি টি ডাক। বিলের জলে আকাশ থেকে বাঁকা এক রেখা ঝপাং করে পড়তেই একঝাঁক জলহাঁস ফুটে ওঠে। কখনও বন্দুকের শব্দে বিশাল নৈঃশব্দ খান খান হয়ে যায়, এবং বাতাসে কিছুক্ষণ বারুদের কটু গন্ধ। তারপর আবার সব শান্ত, চুপচাপ। আবার ঘাসফড়িংয়ের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে বাগালছেলের চেরা গলায় চিৎকার, 'বীণামাসি গো! নে-দে-ছে-এ-এ!' মোড়লের গরু নাদলে বীণামাসি ছাড়া আর কাউকে দেবে না হরিবোলা। পা দিয়ে গোবরটা থুপথুপ করে গুছিয়ে রাখবে। মাঠকুড়োনি মেয়েটার আসতে দেরি হলেও ওটা আর কেউ ছোঁবে না। অলিখিত আইন এই মাঠের পৃথিবীতে।

এর মধ্যে দিনটা কেটে যায় হরিবোলার। তার ইচ্ছে করে একটা দলের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু মোড়লের কড়া নিষেধ। পাঁচজন বাগাল দল বাঁধলেই খেলতে মন দেবে। তখন গরু গিয়ে কার ফসল খাচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি থাকে না। তাই হরিবোলা একলা হয়ে ঘোরে। বাঁওড়ের ধারে গিয়ে যোগীবরের কাছে নানারকম গপ্প শোনে। গরুগুলো আপন খেয়ালে চরে বেড়ায়। ক্রমশ গোচর মাটির সীমানা কমে যাচ্ছে। আবাদ বাড়ছে। বুড়ো যোগীবর বহুদূর দৃষ্টি চালিয়ে বলে ওঠে, 'সব আবাদ হয়ে যাবে, বুইলি হরিবুলা। বাঁধ হবে-হবে

শুনছি। হলে পরে উই উলেকাশের বোন, উই বিল, ই বাঁওড়—সবখানে লাঙল পড়বে। ত্যাখন হরিবুলা, ত্যাখন গরু চরাবি কতি রে, অ্যাঁ?'

খুব হাসে যোগীবর। হরিবোলা বলে, 'যাঃ!'

'যাঃ লয়। দেখবি কী হয়।'

হরিবোলা ওসব ভাবে না। কিন্তু বিলের জলে লাঙল পড়ার কথা শুনে সে ভারি অবাক হয়। বলে, 'যুগীকাকা, ওগো যুগীকাকা! বিলের জলে লাঙল পড়বে কেমুন করে? বলদ ডুবে মরবে না?' তার টানাটানা চোখ বিলের দিকে প্রসারিত হয়।

'ওরে বাছা, ত্যাখন কি জল থাকবে? বাঁধ পড়লে বছরে বছরে শুকিয়ে যাবে।'

হরিবোলা অত ভাবতে পারে না। সে যখন হবে, তখন হবে। 'অ যুগীকাকা, হেজলতলার পেত্নীটার কথা বুলো না। আর দেখা হয়নি তুমার সঙ্গে?'

যোগীবর হাসে। মাথা নেড়ে বলে, 'হয়েছিল বৈকি! তবে উহ দ্যাখ বাপ, তুর ধলি গরুটা বুঝি মুখ দিলে গমের চারায়।'

হরিবোলা নড়ি তুলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দৌড়তে থাকে। মেহদু কসাইয়ের নাম করে শাসায়। বলে, 'মেহদুকে দুবো—হ্যাঁ!'

গরুগুলোকে সে ভালবাসে। খুঁটিয়ে তাদের শরীর দেখে। ঘা থাকলে দুব্বো ঘাস মচলে ঘসে দেয়—যোগীবরের পরামর্শে। গোঁদল পোকা ছাড়িয়ে দেয় পেট থেকে। কমবয়সী বাছুর গরুটাকে সে কোলে নিয়েই পার করে নালা খানাখন্দ। তখনও তার কাঁধে শালিকছানা। চুলে ট্যাঁসকোনা পাখির পর গোঁজা। কোথাও এই পর পেলে সঙ্গে সঙ্গে সে কুড়িয়ে নেয়। মোড়লের খড়কাটার কুঠুরির নিচু চালে অনেক পর গোঁজা আছে।

এই জীবন হল বাগালের। তারও আছে অনেক রীতিনীতি, অনেক প্রথা, ইতিহাস। হরিবোলা তার অন্তর্গত। তার কপালে আঁকা আছে রাখালফোঁটা। নড়ির ডগায় ঘষে ঘা করে সেই ঘা শুকোলে ওই গোল ফোঁটা কালো হয়ে ফুটে থাকে দুই ভুরুর মধ্যিখানে। এই ফোঁটা দিয়ে দ্বারকার ওপারে রাখালের একদিন অভিষেক হয়। হরিবোলারও হয়েছে। রাখালী ছেড়ে কোথাও যাবে না। গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলেই সে নদীপারের এই ব্যাপকতায় উড়ে বেড়ায় পাখপাখালির মতো। এখানে অবাধ স্বাধীনতা তাকে চিতাবাঘের বাচ্চা করে ফেলে। তার চলার ভঙ্গী যায় বদলে। চাহনিতে ফুটে ওঠে বন্য প্রাণীর চাঞ্চল্য। সে গলা ছেড়ে গান গায়, 'দড়া লধির/যৈবন পড়্যে আছে হে...' যদিও তার যৌবন এখনও বহুদূরে। সেই যৌবন এলে কি ঘটবে, তাও সে ভাবে না। ফাঁড়িঘাসের বনে, হিজল-জারুল-ভাঁড়ুলে গাছের জঙ্গলে, কিংবা বাঁওড়ের ধারে সবুজ ঘাসে ঢাকা মাটিতে হাঁটতে হাঁটতে তার মনেও হয় না যে একদিন এই বাগালীজীবনের পর তাকে মুনিশ হয়ে ক্ষেতে নামতে হবে এবং তার এই সিধে মেরদণ্ড বেঁকে যাবে ফসলের শীষের দিকে। যে মাটিকে সে পা দিয়ে ছুঁয়েছে, সেই মাটি হাত দিয়ে তাকে ছুঁতে হবে—একথাও বোঝে না সে।

এখন হরিবোলা সে-হরিবোলাটি নয়। তার আদুড় শরীরে এখন ঘাসের গন্ধ, বিলের জলের গন্ধ। খড়কাটা ঘরে কুঁকড়ে শুয়ে নিজের বুকের ওইসব প্রাকৃতিক গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে সে ঘুমিয়ে পড়ে। তার অবচেতনায় সারা রাত দ্বারকা নদীর ওপারের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি বুড়ো যোগীবরের মতো পাহারা দেয়।...

চৈত্রে ধানু মোড়লের মেয়ে-জামাই এসেছে। জামাই খুব সিগারেট খায়। সকালে হরিবোলাকে ডেকে বলে, 'অ্যাই ছোঁড়া, এক প্যাকেট সিগারেট এনে দে তো! শোন, এই প্যাকেটটা নিয়ে যা। বলবি এই সিগারেট দাও।'

হরিবোলা টাকা নিয়ে দৌড়ুতে থাকে। লরেন্দ মাস্টেরের ভাই মলিন্দ সম্প্রতি মনোহারি দোকান দিয়েছে গ্রামে। সিগারেট সেই বেচে। হরিবোলাকে দেখে বলে 'দাঁড়া হরিবুলা, কথা আছে।'

হরিবোলা বলে, 'টক করে সেকরেট দ্যাও বাবু, গোচ্চরাতে যাব।'

মলিন্দ হাসে। 'দাঁড়া না বাঞ্চোত! কথা আছে।' সে হরিবোলার হাত থেকে টাকা নেয়। কিন্তু সিগারেট দেয় না। গলা চেপে বলে 'সেই যে তোর মা জামা পেণ্টুল দিয়েছিল, পরিসনি?'

হরিবোলা মাথা নাড়ে। নির্বিকার মুখে বলে, 'মুরোলগিন্নি দেয়নি। লেমুনচুষও দেয়নি।'

'হুঁ। যাবি তোর মাকে দেখতে?'

হরিবোলা নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে।

মলিন্দ চাপা ধমক দেয়, চোখে হাসি। 'বল না, যাবি নাকি মাকে দেখতে? তোর মায়ের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। আমাকে বলে তোকে নিয়ে যেতে। যাবি?'

হরিবোলা আস্তে বলে, 'মুরোল বকবে।'

'ধুর ব্যাটা! লুকিয়ে যাবি।'

হরিবোলা একটু হাসে এবার। 'গরুগুলান কে চরাবে?'

'আর কোনো বাগালকে গছিয়ে দিবি। তারটা একদিন চরিয়ে শোধ করবি।'

এমন প্রথা অবশ্য আছে। তবু হরিবোলা ভাবে। শেষে হাত বাড়িয়ে বলে, 'জামাইদাদার সেকরেট দ্যাও।'

'তাহলে যাবি না? অ্যাই ছোঁড়া, মাকে দুঃখু দিবি? তুই তো বড্ড নেমকহারাম।'

হরিবোলা মুখ নামিয়ে পায়ের বুড়ো-আঙুলে মাটিতে আঁচড় কাটে।

মলিন্দ ফিসফিস করে বলে, 'তোর মা খুব কান্নাকাটি করছিল। গাঁয়ে আসতে সাহস পায় না মোড়লগিন্নির ভয়ে। তাছাড়া...ওসব তুই ছেলেমানুষ, বুঝবি না। মোটকথা, তোর মায়ের আসা কঠিন। তুই আমার সঙ্গে যাবি, চলে আসবি দেখা করে। কেমন?'

হরিবোলা অবশেষে আস্তে মাথাটা দোলায়। তারপর গলার ভেতর বলে, 'কবে যাবা তুমি?'

'কাল মাল আনতে যাব। খুব সকাল-সকাল যাব। নদীর ব্রিজে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। তুই চলে আসবি।...'

এদিন হরিবোলার কেমন ভাবুক চেহারা। গরু নিয়ে গেল কেমন তুম্বো মুখে। মোড়লগিন্নির থাপ্পড় খেয়েও সে মুখ খোলে নি। কিন্তু নদীর ওপারে গিয়ে তার মনটা ভাল হয়ে গেল। যোগীবরের কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল না। নিরিবিলি ঘুরে বেড়ালো গরুর পালটা নিয়ে। মায়ের কথা ভেবে খুব খুশি হচ্ছিল হরিবোলা। মায়ের কথা বেশি করে মনে পড়ছিল। মায়ের সেই গানখানাও গেয়ে ফেলল সে 'বঁধূ লাও বা না লাও/মুখ দেখে নাও/বাসি কাচের আয়না...'

তারপর গেল দুধসরের ধারে। বাগালদের জোট সেখানে ভাঁড়ুলে গাছে ঝাল-ঝুল্লা খেলছে। নালার জলে চিহ্নিত শেকড় থেকে ভিজে চালের ন্যাকড়াটা তুলল সে। তারপর দলটার দিকে তাকাল।

পাতকুড়োকে খুঁজছিল সে। পাতকুড়োর সঙ্গেই তার যত বন্ধুতা। ছেলেটা খুব লক্ষ্মী। চোখে চোখে পড়তেই হরিবোলার চালের লোভে দৌড়ে এল খেলা ছেড়ে। দলপতি তাকে শাসাচ্ছিল, 'শালোকে পাল থেকে বেংড়ে দুবো!' কিন্তু গ্রাহ্য করল না সে।

পাতকুড়ো হাসিমুখে বলল, 'ইদিক বাগে দেখেই বুঝেছি, হরিবুলার চাল ভিজুনো ছিল ন্যালায়। ইঃ, জানলে পরে খেয়ে শ্যাষ করে দিতাম।'

হরিবোলা মিঠে গলায় বলল, দিতিস তো দিতিস! এই লে!'

দুজনে কুড়মুড় করে চাল খায় নাটাকাঁটার ঝোপের আড়ালে। তারপর কথাটা তোলে হরিবোলা। যাবে আর বেলাবেলি ফিরে আসবে। মায়ের কাছে বাসমোটরের ভাড়া চেয়ে নেবে। সাঁকোর কাছে নেমে সোজা এখানে চলে আসবে। গরুগুলো বুঝে নিয়ে বেলা যদি থাকে, চরাবে—নৈলে ডাকিয়ে নিয়ে ফিরে যাবে।

পাতকুড়ো রাজি। গেরস্থর চোখের আড়ালে বাগালে-বাগালে এমন বোঝাপড়া চিরকালের।...

পরদিন সকালে তর সইছিল না হরিবোলার। বাড়িতে জামাই বলে ধানু মোড়ল আজ আর নদী পর্যন্ত আসেনি। নদীর ওপারে পাতকুড়োকে পালটা বুঝিয়ে দিয়ে হরিবোলা দৌড়ুতে থাকে নদীর ধারে-ধারে।

ব্রিজের মাথায় মলিন্দ সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তার বড় গরজ। রাঙাদাসী এখন মেদিগঞ্জের বাগানপাড়ার গলিতে মধুবালা হয়েছে। মলিন্দ তার প্রেম পেয়েছে। যখন রাঙাদাসী গ্রামে ছিল, তখনও মলিন্দ ঘুরঘুর করত বটে, পাত্তা পায়নি। তাছাড়া মেয়েটার মতিগতিও অন্যরকম ছিল।

শুধু অবাক লাগে মলিন্দের, প্রস হয়েও ছেলের জন্য টান থাকে সে কল্পনাও করেনি। বাগানপাড়া গলিতে ঢোকার অভ্যাস তার অনেকদিনের। সেখানে গউরের বউকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। কিন্তু মোড়লকে তো এসব কথা বলা যায় না।

টাউনবাজারে এই প্রথম আসা হরিবোলার। সে একেবারে জড়োসড়ো এতটুকুনটি। মলিন্দ সাইকেল থেকে নেমে তার কাঁধ ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায়। অনবরত বোঝায়, যেন গ্রামের কাকপক্ষীটিও টের না পায়। বারবার বলে, 'কাউকে বলবিনে তো হরিবোলা? বললে তোকে কেটে ফেলব কিন্তু।'

বন্যপ্রাণীর চাউনিতে হরিবোলা রঙবেরঙের ঘরবাড়ি আর মানুষজন দেখে। ভেবে কূল পায় না এখানে তার মা থাকে!

কতদূর হেঁটে একটা আড়তে সাইকেল জিম্মা দিয়ে মলিন্দ বলে, 'আয় হরিবোলা!'

এ-গলি ও-গলি আরও কতদূর গিয়ে একটু দাঁড়ায় সে। আবার বলে, 'আয়!'

গলির দুধারে খোপবন্দী ঘর। টালি বা খাপরুলের ছাউনি। দরজায় বসে ও দাঁড়িয়ে আছে নানাবয়সী মেয়েরা। হরিবোলা পিটির পিটির তাকিয়ে হাঁটে। একটা ঘরের দরজায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছিল এক মেয়ে, পরনে লালরঙের শাড়ি। মলিন্দ আস্তে 'মধুবালা' বলে ডাকতেই সে ঘোরে।

সেই কয়রা বেড়ালচোখ। সেই রাঙা ছিপছিপে গড়ন। তবু হরিবোলা চিনতে পারে না। মলিন্দ বলে, 'কী রে ছোঁড়া? মাকে চিনতে পারছিস না! এজন্যেই মোড়ল বলে ক্যালাগোবিন্দা।'

রাঙাদাসী খপ করে হরিবোলাকে ধরে একটানে ঘরে ঢুকিয়ে ভেতর থেকে বলে 'মলিন্দবাবু, তুমি এখন এস।'

মলিন্দ অবাক। খ্যা খ্যা করে হাসে। 'বাঃ! তোমার বেশ বিবেচনা মাইরি!'

'না, না। তুমি এখন এস তো। জ্বালিও না।'

'হরিবোলাকে মোড়লের কাছে পৌঁছে দিতে হবে না?'

'না। আমি বাসে তুলে দেব। তুমি যাও।'

'ঠিক আছে।'...মলিন্দ বেজার হয়ে পা বাড়ায়। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে রাঙাদাসী। মনে মনে মলিন্দ অশ্লীল গাল দিতে দিতে কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়। উদাস চাউনিতে তাকে দেখতে থাকা একটি মেয়েকে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে 'রেট'? মেয়েটি দুহাতের দশটা আঙুল দেখায়।

'গরজ!' বলে মলিন্দ তার ঘরেই ঢুকে পড়ে।....

দরজা বন্ধ করে পেছনের একটা ছোট্ট জানালা খুলে দিয়েছে রাঙাদাসী। জানালার ওধারে খালে শুওর চরছে। ওপারে ঝোপঝাড়, তারপর একটা পুরনো বিশাল বাড়ি। ঘরের ভেতরটা ক্রমশ স্পষ্ট হলে হরিবোলা দেখে, তার মা তাকে জড়িয়ে মাথায় গাল রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মায়ের শরীর থেকে বা শাড়ি থেকে মিষ্টি গন্ধ মউমউ করছে। গন্ধটা তার চেনা লাগে। কিন্তু সে নির্বিকার মুখে ঘরের ভেতরটা দেখতে থাকে।

তক্তাপোসের ওপর পুরু বিছানা। এমন বিছানায় কখনও সে বসেনি। দেয়ালে অনেক ছবি ঝুলছে। মাকালীর ছবিটা সে চিনতে পারে। মোড়লের ঘরে এই ছবি আছে। মেঝের ওধারে একটা কেরোসিনকুকার। এনামেলের হাঁড়িকুড়ি। একটা সাদা চওড়া থালা। কেটলি। অনায়াসে ইটের ওপর বসানো সেই চেনা স্যুটকেস—তার ওপরে একটা বড় কালরঙের থলের মতো—হয়তো বাক্স। তাতে কী আছে, দেখতে ইচ্ছে করে হরিবোলার।

দড়ির আলনায় শাড়ি সায়া ব্লাউস এইসব ঝুলছে। তারপর কোণার দিকে দুটো ইট এবং নর্দমার ঘুলঘুলিতে চোখ পড়ে হরিবোলার। ঘরের ভেতর পেচ্ছাপ করে বুঝি? তার মা এমন 'খ্যাদোড়' তো ছিল না।

'হরিবুলা!'

ধরা গলার ডাক শুনে হরিবোলা এবার মুখ তোলে।

'কী খেয়েছ সকালে?'

'মুড়ি, গুড়। আর.....' একটু ভেবে হরিবোলা বলে, 'মরোলের জামাই বতিচুরের নাড়ু এনেছিল। তাই আধখানা দিয়েছিল।'

'ভাত খাওনি?'

'হুঁউ পান্তা খেয়ে গোচ্চরাতে গেলাম। তাপরে...'

গালে গাল ঘষে রাঙাদাসী বলে, 'আমাকে তুর ঘেন্না করছে, বাছ?'

‘উঁ?’ হরিবোলা বোঝে না।

শ্বাস টেনে এবং ছেড়ে রাঙাদাসী বলে, ‘চাট্টি ভাত খা। মাছ আন্না করেছি। আজই তুকে আনবে, জানি না তো!’

রাঙাদাসী মেঝেয় একটুকরো আসন পেতে ছেলেকে ভাত বেড়ে দেয়। হরিবোলা প্রথমে একটু অনিচ্ছা করে, পরে খুশি হয়ে খায়। রাঙাদাসী তাকে খাওয়ায়। মুখে ভাত গুঁজে দেয়। জামাপ্যাণ্টের কথা জিজ্ঞেস করে। হরিবোলা মোড়লের দোষ ঢাকতে মিথ্যে করে বলে, ‘দিয়েছিল।’

‘ই ছিঁড়া পেণ্টুল, খালি গা করে এলি যে?’

হরিবোলা দুধের দাঁতে হাসে। ‘মাঠ থেকে এলাম বুলছি না?’

‘খেয়ে নে। তাপরে লতুন জামাপ্যাণ্টজুতো কিনে দুবো।’

সেইসময় দরজায় খটখট শব্দ আর ডাক, ‘মধু! অ মধুবালা! অসময়ে আবার কোন নরকখেকোকে ঢোকালি লা? বিদেয় করে বেরো! বড়মানুষ এনেছি।’

রাঙাদাসী গর্জন করে বলে, ‘যাও তো মাসি। হবে না এখন!’

‘আচ্ছা লা, আচ্ছা! দেখব, গুমোর কদ্দিন থাকে।’

হরিবোলা জিগ্যেস করে, ‘কে ঝগড়া করছিল মা?’

‘ওই এক মাগী।’ বলে সে ছেলের মুখে গেলাস ধরে। হরিবোলা ঢকঢক করে জল খায়, কিন্তু গেলাসের দুপাশ দিয়ে দুটো বন্যচোখে মায়ের মুখখানা দেখতে থাকে। রাঙাদাসীর বুকটা ধক ধক করে ওঠে চাউনি দেখে।

তারপর রাঙাদাসী ছেলের চুল আঁচড়ে দেয়। ভিজে তোয়ালেতে মুখ মুছিয়ে দেয়। আঙুলের ডগায় করে স্নো তুলে ঘষতে গেলে হরিবোলা মুখ সরায়। কিছুতেই মাখতে চায় না।

ঘরে তালা এঁটে ছেলেকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে বলে, যখন মন খারাপ করবে, তক্ষুণি চলে আসবি। যেমন আছ মুরোলবাড়ি, তেমুনি থাকো এখন। ভগবান যদি মুখ তুলে তাকায়, মা-বাছা মিলে টাউনে দোকান দুবো।’

এইসব কথা অনর্গল। হরিবোলা কিছু বোঝে না। টাউন বাজারের ভিড়ে হারিয়ে যাবার ভয়ে মাকে আঁকড়ে ধরে হাঁটে।...

বাঁওড়ের কাছে খানিকটা উঁচু টুঙ্গির ওপর যুগীবরের কুঁড়েঘর। খড়-বাঁশের একটা ঝুপড়ি, সামনে খানিকটা মাটি ঝকমক করছে। হিজলগাছের ডালে ঝুলছে দড়ির সিকে, তার মধ্যে দুটো হাঁড়িকুড়িতে তার খাদ্যদ্রব্য। গুঁড়িতে ঝুলছে তার হুঁকো। এই তাঁর সংসার। বহুবছর আগে সে গ্রাম থেকে এখানে এসে নিরিবিলিতে এই সংসার গড়েছে। এক টুকরো খেত ছড়িয়ে আছে সামনে। এই তার সম্পত্তি। সারাবছর সে বিবিধ ফসল ফলায়। তাকে বেচতে যেতে হয় না, নিকিরিরা এখান থেকেই কিনে নিয়ে যায়। গ্রামে সে কখনও-সখনও যায়, সেও নুনতেল কিনতে। হাটবারে একখানি কাপুড় কিনতে। সেও এক হুদমুসলো,—গোঁয়ার মানুষ। কোমরে কোনরকমে গামছা জড়ানো। শীতকালে বড়জোর গেঞ্জির ওপর তুলোর কম্বল। মাথায় পুরনো কাপড়ের টুকরো দিয়ে পাগুড়ির মতো একটা কিছু বানিয়ে নেয়। যখন তার ক্ষেতের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সে এক দাম্ভিক

সম্রাট। বাগালরা তাকে খুব ভয় পায়। শুধু হরিবোলাকে সে পাত্তা দেয়, পছন্দ করে এবং হরিবোলা কাছে এলেই তার মুখ খুলে যায়। হাঁটুদুমড়ে গমের চারার ভেতর বসে আগাছা ওপড়াতে-ওপড়াতে সে মুখ তুলে বহুদূরে তাকিয়ে অন্বেষণ করে তাকে।

এদিন ছেলেটাকে দেখতে না পেয়ে ভাবছিল জ্বরজ্বারি হয়েছে বুঝি। কিন্তু পড়ন্তবেলায় যখন সে হুঁকো হাতে পা ছড়িয়ে বসে সুখটান দেবার উপক্রম করছে, তখন তার গায়ে এক দীর্ঘছায়া। মুখ ঘুরিয়ে দেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। চোখে রোদের ছটাও বটে। চিনতে পারে না।

হরিবোলার গায়ে রাঙা জামা, আনকোরা হাফপেণ্টুল, পায়ে সত্যিকার স্যাণ্ডেল। ফিক করে হেসে বলে, 'যুগীকাকা, ইগুলান মা কিনে দিয়েছে। মেদিগঞ্জতে যেয়েছিলাম, বুইলা না যুগীকাকা?' সে দৌড়ে এসে হাঁটু দুমড়ে সামনে বসে পড়ে। কলকল করে বৃত্তান্ত বলতে থাকে।

যোগীবর খালি 'হুঁ' দিয়ে যায়। তারপর হরিবোলা তার হাতে একটা লেমুনচুষ গুঁজে দিলে সে মুঠোয় ধরে রাখে জিনিসটা। একটু পরে বলে, 'তুর মা মেদিগঞ্জতে থাকে?'

হরিবোলা খিটখিট করে হাসে। 'তমে তুমি এতক্ষুণ শুনলা কী?' বলে সে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখার পর জামা খুলে ফেলে। স্যাণ্ডেলদুটো খোলে। পেণ্টুলটা খুলতে যায় কুঁড়ের পেছনে। ফিরে আসে আগেকার বাগাল হয়ে। পরনে, ধানু মোড়লের ছেঁড়া পেণ্টুলখানা মাত্র। চাপা গলায় বলে, 'ইগুলান নুকিয়ে থোব তুমার কাছে। মুরোল জানলে মারবে, বুইলা না?'

যোগীবর মাথা নেড়ে বলে, 'বুইলাম।'

হরিবোলা জামা-পেন্টুল-স্যান্ডেল গুটিয়ে যোগীবরের হাতে গুঁজে দেয়। তারপর চিতেবাঘের বাচ্চার মতো দৌড়ুতে থাকে। তার চেরা গলার গান ভেসে আসে কুয়াশামাখানো নরম রোদের ভেতর থেকে, 'বঁধু লাও বা না লাও/মুখ দেখে যাও/বাসি কাচের আয়না...'

যোগীবর সাধুর মতো উদাসীন হেসে হরিবোলার জামা-পেণ্টুল-জুতো দেখতে থাকে। একবার শোঁকেও। নতুন কাপড়ের গন্ধটা বেশ। টাউনবাজারের কথা মনে পড়ে যায়। কতকাল সে টাউনবাজারে যায়নি। শিগগির একদিন যাবে।

দুধসরের নালার কাছে পাতকুড়ো মুখ চূণ করে দাঁড়িয়ে ছিল। হরিবোলা কাছে গেলেও সে কথা বলে না। গরুবাছুরের পাল তখন সবে ঘরমুখো হচ্ছিল। বাগালরা হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিল নালার এধারে। বাগালদের দলপতি এসে হরিবোলাকে দেখেই নিষ্ঠুর হেসে ঘোষণা করে, 'হরিবুলা, আজ তুর মরণ মুরোলের হাতে। তুর পাল ডাকিয়ে খোঁয়াড়ে লিয়ে যেয়েছে দ্যাখ গা যা! গম খেয়ে বিনেশ করেছে, যা তা কথা?'

হরিবোলা চেঁচিয়ে ওঠে, 'শালা পাতকুড়ো!' তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাতকুড়োর ওপর। দুজনে পড়ে যায় ব্যানার ঝোপে। জড়াজড়ি খামচা-খামচি চলতে থাকে! দলপতির বয়স বেশি। গায়ে জোর বেশি। সে দুজনকেই চাঁটি মেরে ছাড়িয়ে দেয়। দাঁত বের করে বলে, 'মা-সোয়াগির ব্যাটা হয়েছে! যাও, এখন মাকে বুলে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে লিয়ে এস।'

পাতকুড়ো কী বলতে যাচ্ছিল, দলপতির থাপ্পড় দেখে থেমে যায়। হরিবোলা কী বলবে ভেবে পায় না। সে শুধু চোখ কচলায়। বাগালদলের চোখে-চোখে ইশারা আর বাঁকা হাসি দেখে সে শুধু আঁচ করতে পারে, যেন ইচ্ছে করেই তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

পাতাকুড়োকে তার গরুগুলো চরাতে দেওয়া হয়নি হয়তো। তাই তারা গমক্ষেতে ঢুকেছিল।

যোগীবর হুঁকো টানা শেষ করে কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়িয়েছে, হরিবোলা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। যোগীবর বলে, 'কী রে বাছা? গেলি তো হাসতে হাসতে উঁ?'

তারপর সব শুনে সে অভ্যাসমতো বহুদূরে দৃষ্টিপাত করে। গরুর পাল নিয়ে বাগালেরা ফিরে চলেছে। সূর্য লাল চাকা হয়ে ডুবছে দোমোহানীর দিকে। দূরের ডহরে ধুলো, কাশবনের মাথায় কুয়াশা, বিল থেকে মেছুনীরা উঠে আসছে কাঁধে বিশাল প্রজাপতির ডানার মতো জাল নিয়ে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক—প্রতিদিন দিনশেষের একই ছবি। যোগীবর আস্তে বলে, 'মুরোলকে যেয়ে বুলগা বাছা, কী আর করবি?'

হরিবোলা ভাঙা গলায় বলে, 'মুরোল মারবে।'

যোগীবর ঘড় ঘড় করে কেসে এবং হেসে বলে, 'তাইলে মায়ের কাছে চলে যা বরঞ্চ।'

'মা বুলেছে মুরোলের কাছে থাকতে।' হরিবোলা আবার ফুঁপিয়ে ওঠে। 'মা বুলেছে, য্যাখন খবর দুবো, ত্যাখন আসবি—লৈলে আসবি না।'

'তুর মা বুলেছে?'

'হুঁ। বুলেছে য্যখন-ত্যাখন কক্ষুণো আসবি না।'

যোগীবর বুঝতে পারে না। রাগ করে বলে, 'তাইলে যা ইচ্ছে কর গা বাছা! দেখি, বাওড়ে জালখানা পেতে আসি—রেতে যদি দুটো মাছ-টাছ পড়ে।' সে হিজলডালে টাঙানে খোপ-জালখানা পেড়ে নিয়ে থপথপ করে চলে যায়। আর পিছু ফেরে না।

হরিবোলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে চোখ কচলায়।...

ধানুমোড়লের খবর পেতে দেরি হয়নি, দোমোহানীর লোকেরা তার পাল ডাকিয়ে খোঁয়াড়ে নিয়ে গেছে। ছাড়াতে পনের-ষোল টাকার ধাক্কা। এদিকে বাড়িতে জামাই, সেও মোড়লের মেয়েকে টাকার জন্য লেলিয়ে দিয়েছে। ধানু মোড়ল যত, তত তার গিন্নিও টাকা-অন্ত প্রাণ। ধানু মোড়লের মাথার ভেতর আগুন জ্বলে গেছে। গিন্নির তো গলা শুকিয়ে গেছে গাল দিতে দিতে। ঘরে জামাই, তাকে কী? দোমোহানীর খোঁয়াড় থেকে গরুগুলো ছাড়িয়ে আনতে মাঝরাত হয়ে গেল।

মোড়ল গোয়ালে গরু বেঁধে এসে টিউকলে হাত পা ধুতে ধুতে চোখের কোণা দিয়ে কী একটা দেখতে পায় পেয়ারাগাছের লাগোয়া। ভিজে হাতে লণ্ঠন তুলে দেখার চেষ্টা করে বলে, 'উটা কী?'

মোড়লগিন্নি বলে, 'বেউশ্যের পুত থাউক বাঁধা।'

পেয়ারাগাছের সঙ্গে গরুবাঁধা দড়িতে ক্ষুদে বাগালটা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছে দেখে মোড়লও গলার ভেতর বলে, 'খানকির পুত থাউক বাঁধা।'

কিন্তু রাত আরও গভীর হলে সেই মোড়ল বিবিধ বিবেচনার পর লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে উঠোনে নামে। একটু বুক কাঁপে। মরে-টরে যায়নি তো? কাছে এসে দেখে বাগালের কঠিন প্রাণ—মাঠেঘাটে জলজঙ্গলে রোদ-বৃষ্টি-শীতের ধারাবাহিক প্রহারে কালক্রমে শামুকের খোলের চেয়ে দড়।

তার লিকলিকে বাহু খামচে ধরে মোড়লমশাই তাকে খড়কাটার কুঠুরিতে ঠেলে দেয় এবং নিজের বিছানায় শুয়ে ফিরে যায়। ওপরে খড়, নীচে খড়, মধ্যিখানে কুঁকড়ে পড়ে থাকে হরিবোলা। আজ রাতে তার অবচেতনায় সেই বিশাল তৃণভূমি রাঙাদাসী হয়ে ফিসফিস করে কথা বলে। তার চিমসে ফাটা ঠোঁটদুটো কেঁপে ওঠে। ঘুমের ঘোরে সে মায়ের দেওয়া লেমুনচুষ চুষতে থাকে। তার দুই ভুরুর মধ্যিখানে আঁকা রাখালফোঁটাটি এখন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। সে এখন প্রকৃতই রাঙাদাসীর ছেলে হয়ে ঘুমোয়।...

আমি ও বিপাশা

মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম কতক্ষণ। খুব চেনা লাগছিল, অথচ সাহস করে জিগ্যেস করতে পারিনি। তবে অবাক হবার কারণ, নির্জন নদীর ধারে সভ্যতা খুব কদাচিৎ দেখা যায়—যদিও খানিকদূরে একটা হাইওয়ে, বিশাল ব্রিজ আর উঁচু উঁচু বিদ্যুতবাহী ফ্রেম রয়েছে।

শরতে এই নদী এখন বেগবতী। কাশ ফুল ফোটা দুই পাড়ও ভারি চঞ্চল। বাঁধের জামগাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে মেয়েটির মুখোমুখি হতেই চিনলুম।—বিয়াস নাকি? কখন এলে?

সে প্রথমটা একটু হকচকিয়ে পড়েছিল। পরমুহূর্তে চিনতে পেরে হেসে উঠল।—পারুদা! আমরা কাল এসেছি। তোমার শাটলেজও এসেছেন। দেখা হয়নি?

—না তো? কেমন আছ সব? বাবা-মা ভাল আছেন? সামাজিক প্রাণীর পক্ষে এসব বলার রীতি আছে বলেই অনর্গল কিছুক্ষণ বলে গেলুম!

সে ভুরু নাচিয়ে বলল—কিন্তু বিয়াস নামটা এখনও আপনার মনে আছে দেখছি।

—আছে। কত কী মনে আছে।

—যেমন?

—শুনবে? বলে গলার স্বর একটু চাপা করলুম। এক খরার দুপুরে ওই জামবনে তোমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলুম। তারপর কী ভীষণ কাণ্ড হল। তুমি মাছের মতো ছটফট করছিলে। অথচ সে যেন সুখ তোমার।

তার মুখ রাঙা হয়ে গেল শুনতে শুনতে। মুখ ঘুরিয়ে শুধু বলল—যাঃ!

—লজ্জা পাবার কী আছে? সে বিয়াস তো আর তুমি এখন নও। রীতিমতো বিপাশা চৌধুরী!

বিপাশা হঠাৎ যেন সামলে নিল। তার সভ্যতাময় সপ্রতিভ চেহারায় হাসতে হাসতে বলল—আর দাদাও এখন শতদ্রু চাউড্রি হয়ে গেছেন জানেন তো?

—বল কী!

হবে না আবার? ওড়িশার একটা প্রজেক্টের বড়কর্তা হয়েছেন।

—জানতুম শতদ্রু উন্নতি করবে।

একটা মেটুলি ঝোপের পাতা ছিঁড়ে বিপাশা বলল—উন্নতি না হাতি! তোমার মনে নেই পারুদা, দাদা বলতেন—এয়ারফোর্সের পাইলট হবো? আকাশে আকাশে ঘুরব। আর নিচে নামবই না। মাটির ওপর গুলিগোলা বোমা ছুঁড়ে পৃথিবীর বারোটা বাজাব।

—হ্যাঁ, শতদ্রুদা তাই বলত বটে। তখন যেন তোমার বাবার সঙ্গে তোমার জ্যাঠার একটা মামলা চলছিল।

বিপাশা শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—হঠাৎ এখানে কোত্থেকে হাজির হলেন? জানেন—আপনাদের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছিলুম এসেই। শুনলাম...

—শুনলে পারু মানুষ খুন করে ফেরারী হয়েছে?

বিপাশা চমকে উঠল। —যাঃ তা কেন বলবে? বলল—নেই। ব্যস।

—বলল নেই—আর হঠাৎ এই সকালে আমাকে নদীর ধারে দেখতে পেলে। এতে তোমার কিছু অবাক লাগছে না?

বিপাশা সরল মুখে বলল—না তো!

—আমার চেহারায় কিছু টের পাচ্ছ না?

সে আমাকে কয়েক মুহূর্তে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল—নাঃ!

—আমার ময়লা শার্ট, ভিজে ধুতি, খালি পা, লাল রুক্ষ চোখ দেখেও কিছু আঁচ করতে পারছ না?

বিপাশা এবার সন্দিগ্ধ স্বরে বলল—কিছু বুঝতে পারছি না পারুদা।

—বিপাশা, তুমি কি গ্রাম থেকে হেঁটে এতটা পথ এসেছ?

—না গাড়িতে। ওই যে ব্রিজে আমার গাড়ি।

—তুমি নিজে ড্রাইভ করো?

—উঁহু।

—বিপাশা, তোমার পরণের ওটাকে কী বলে যেন। বেলবটস?

বিপাশা একটু অপ্রতিভ হল। —হঠাৎ আমার পোশাক নিয়ে পড়লেন কেন? নিজের কথা বলুন।

—বিপাশা, তুমি সভ্যতার অন্তর্গত!

—ইস! আপনি যেন নন!

—আচ্ছা বিপাশা, তবু কেন তোমার এখানে আসতে ইচ্ছে করল? এখানে তো শুধু কাশফুল, নদীর ঘোলা জল, পাঁক, জঙ্গল, পোকামাকড়। ...বিপাশা! সরে দাঁড়াও। ঝোপে একটা লাউডগা সাপ!

বিপাশা চমকে সরে এল। —কই? কোথায়?

ওকে দেখিয়ে দিলুম। তারপর বললুম—ভীষণ বন্যা হল তো! সব পোকামাকড় এসে বাঁধের ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এখনও ফিরে যায়নি যে যার এলাকায়। এমন কি শামুকগুলো এখানেই ডিম পেড়েছিল। আর...

—আপনি ওভাবে কথা বলবেন না পারুদা! কেমন ভয় করে।

—তবু তুমি এখানে এসেছ!

—বা রে! ছেলেবেলার চেনা সব জায়গা। মনে পড়ছিল, তাই এলুম। ...ও কী! ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

—চুপ। লুকোচ্ছি। ব্রিজে পুলিশ যাচ্ছে।

বিপাশা ব্রিজটা দেখে নিয়ে বলল—ওরা সাইকেলে কোথাও যাচ্ছে। কিন্তু ওদের দেখে লুকোচ্ছেন কেন?

—বললুম না, ফেরারী আসামী, মানুষ খুন করেছি।

—তুমি...আপনি কি নকশাল, পারুদা?

—উঁহু। আমি কোন দলের মানুষ নই। পৃথিবীকে বদলানো দুঃসাধ্য।

সকৌতুকে বিপাশা বলল—ভাল। কাকে খুন করেছেন?

—শোননি? গ্রামে কেউ বলেনি?

—নাঃ। কেউ বলেনি। খুন-টুন করলে নিশ্চয় বলত।

—বিপাশা!

—উঁ?

—তুমি চলে যাও এখান থেকে। তোমাকে দেখে আমার ভীষণ লোভ হচ্ছে।

বিপাশা প্রায় হইচই করে বলল—এই! আপনি এখনও বড্ড অসভ্যতা করতে পারেন, সত্যি। যা ছিলেন, তাই একেবারে। যাঃ!

—বিপাশা, তুমি এত সুন্দর হয়ে উঠেছ!

—মেরে ফেলব পারুদা! একেবারে খুন করে ফেলব কিন্তু। বাজে কথা বলবেন না।

এগিয়ে গিয়ে ওর একটা হাত ধরলুম।—বিপাশা, চলো না ঐ জাম বনটায় গিয়ে কথা বলি। এখানে দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। চলো না!

বিপাশা অনিচ্ছাসত্বেও পা বাড়াল। যেতে যেতে ব্রিজে নিজের গাড়ীটা একবার দেখে নিল। টের পাচ্ছিলুম যে ও খুব সতর্কভাবে হাঁটছে। ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্বে চঞ্চল হয়েছে। তবু আমাকে এড়াতে পারছে না। কারণ, আমি ওর ছেলেবেলার এক ভয়ঙ্কর দিন। অন্তত বিগত সময়ের তের বছর বয়সের মেয়ের জীবনের একটি অমোঘ সত্য। আর ও যা অনুভূতিপ্রবণ মেয়ে! নিজের রক্তকে যে একবার বুঝেছে, তার মুক্তি নেই।

বাঁধটা নদীর পাশাপাশি ঘুরে জামবনে ঢুকেছে। এই জঙ্গলটা সিকি মাইল একটানা চলেছে। এক সময় দুপাশে বিশাল খড়ের জঙ্গল ছিল। এখন আবাদ হয়েছে। সবুজ ধানের মাঠ। অবশ্য সদ্য বন্যার গাঢ় ঘোলাটে জল নেমে গিয়ে সবুজ রঙটা হলদে দেখাচ্ছে। ভাগ্যিস শিগগির বন্যার জল নেমে গেল। তাই মাঠটার বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কয়েকটি দিনের রোদেই ধান গাছগুলো আবার সামলে নিয়ে মাথা তুলেছে। কোথাও কোথাও একটুকরো পোড়ো জমির ওপর বাবলাবন। সেখানে দূরে, গয়লারা একদঙ্গল গরু মোষ নিয়ে গেছে। বাবলাফল পেড়ে খাওয়াচ্ছে প্রাণীগুলোকে। কোথাও কোন ধানের ক্ষেতে একটা চাষী হাঁটু দুমড়ে আগাছা ওপড়াচ্ছে। দূরে গাছপালার পায়ে ধোঁওয়াটে ভাব—কুয়াশার! শিশির শুকিয়ে যাবার পর ঘাসফড়িং লালপোকা নীলপোকারা দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে। মাকড়সার জালগুলো এখন শুকনো। কোথাও সাপ দেখতে পেয়ে শালিক আর ফিঙ্গে পাখির ঝাঁক তুমুল চেঁচামেচি করছে। জামবনে ঢোকার পর ঘন ছায়া এসে আমাদের ঢাকল এবং আমরা দাঁড়িয়ে গেলুম।

বিপাশা সব দেখতে দেখতে বলল—এখানে কোথাও একটা বটগাছ ছিল যেন?

—সেটা কবে উপড়ে গিয়েছিল। তোমার জ্যাঠামশাই তার কাঠ বেচে অনেক টাকা পেয়েছিলেন! অবশ্য তোমার বাবার হিস্যেও ছিল।

বিপাশা হাসল।—দায় পড়েছে বাবার! সম্পত্তির লোভ থাকলে গ্রাম ছেড়ে যেতেনই না।

—তা ঠিক। তবে তুমি তখন ছোট ছিলে, জানো না। তোমার জ্যাঠার অত্যাচারেই চলে যান কলকাতা। তোমার মামাই প্ররোচিত করেন, জানতুম। মামা বেঁচে আছেন তো?

—ভীষণ বেঁচে আছেন। এখন তো পাড়ার কাউন্সিলার। রাজনীতির পাণ্ডা। নিউজ পেপারে ওঁর অনেক কীর্তির কথা পেতে পারেন—এখনও।

—খবরের কাগজ কতদিন পড়া হয় না। বনে জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি।

—যাঃ! ফের বাজে কথা।

—সত্যি বিপাশা, আমি খুনী আসামী।

—মেরে ফেলব পারুদা। আপনি করবে মানুষ খুন? ইস! ...আচ্ছা পারুদা ফ্লাডের জল এই উঁচু জায়গাটা নিশ্চয় ডোবাতে পারে না?

—না। কেন?

জানেন? আমার হঠাৎ হঠাৎ ভারি ইচ্ছে করত—নদীর ধারে একটা বাংলো মতো বাড়ি থাকলে কী ভালো লাগত! অবশ্যি, ঘাটশীলা আর নেতারহাটে বাবা দুটো কটেজ কিনেছেন।

আমরা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকি। পাহাড়, পাহাড়, আর পাহাড়! অপূর্ব লাগে! তুমি গেছ কখনও নেতারহাট?

—না।

—এই! আবার তুমি এমন করে তাকাচ্ছ, পারুদা!

—আমাকে 'তুমি' বলছ, বিপাশা! সেই ছেলেবেলার মতো!

সে জিভ কাটল। —সরি! স্লিপ অফ টাং!

—তোমার অবচেতনা থেকে তের বছরের বিপাশা উঠে আসতে চেয়েছে। তুমি তাকে বাধা দিও না।

—কই দিচ্ছি?...বিপাশা সোৎসাহে বলে উঠল।—তাই তো এবার পুজোয় বাবার পিছনে লেগে লেগে গাঁয়ে নিয়ে এলুম। জানো, সারারাত ঘুমোইনি। শুধু ভেবেছি, কখন সকাল হবে—কখন নদীর ধারে যাবো!

—আশ্চর্য! তোমাকে সভ্যতা এতটুকু বদলাতে পারে নি!

—না, তা বললে ভুল হবে। পেরেছে বইকি। প্রায় সবটাই পেরেছে। এ একটা জাস্ট কৌতূহল বলতে পারেন। প্রিমিটিভ ব্যাপারগুলোর প্রতি কৌতূহল। সভ্যতা মাঝে মাঝে পিছু ফিরে তাকায়।

ওকে খুব সিরিয়াস মনে হল। বললুম—হুঁ। বলে যাও।

—কৌতূহল কী? শুধু স্মৃতির টানে একবার হাত বুলিয়ে দেখতে আসা —কতটা কী বদলেছে। তার মানে—কতটা এগোতে পেরেছি এবং ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

—কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, বিপাশা?

—কে জানে। কিছু বুঝতে পারছি না।

—বিপাশা, তোমাকে আমি ওই গাছটার তলায় এক খরার দুপুরে....

এবার যেন লজ্জায় রাঙা হল না। তবু বাধা দিল।—আমি ভাবিই নি যে আপনি ট্রেচারি করবেন। তা না হলে কি একলা আসতুম? ইস! কি ভয় না পেয়েছিলুম!

—আর কিছু যন্ত্রণাও।

সে মুখ ঘুরিয়ে বলল—হ্যাঁ। প্রথম কুমারীত্বের স্খলন। খুব কেঁদেছিলুম।

—আনলাকি তেরো! নাকি লাকি থারটিন!

—আপনি কী সাংঘাতিক ছেলে না ছিলেন! ভাগ্যিস, পালিয়ে গিয়েছিলুম।

—আবার আপনি বলছ?

—এ্যাঁ? সরি।.....জানেন—সরি, জানো পারুদা, যার হাতে কুমারীত্ব যায়—তামে মেয়েরা সারাজীবন মনে রাখে? না—সে ভাবে নয়, ইন দা সেন্স, যন্ত্রণায়—কতকটা গোপন পাপ কিংবা অসুখের ক্ষতচিহ্ন যেমন।

—তোমার সাথে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য!

—কী বললেন, কী বললেন?

—তোমার সাথে পাপ করেছি, সেই তো আমার পুণ্য!

—বাঃ! কার লাইনটা?

—নাম বললে তুমি চিনবে কি? তুমি তো হ্যারাল্ড রবিন্স পড়ো।

—মোটেও না। আমি বাংলা বই পড়ি। পারুদা, তুমি কবিতা লেখনা আর?

—না।.... বিপাশা, আমার ভীষণ লোভ জাগছে।

অন্যমনস্ক ভাবে সে বলল—কিসের?

—তোমাকে এখানে আবার একলা পেয়ে—সাতবছর পরে।

সে হঠাৎ জ্বলে উঠল। মুখ ঘুরিয়ে তীব্র দৃষ্টে তাকাল। বলল—তোমার লজ্জা করবে না? এখন তো তুমি বয়স্ক মানুষ! আমিও। সেন্স এবং রেশপনশিবিলিটি দুজনেরই প্রচণ্ড থাকা উচিত।

—তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই। আর দায়িত্বজ্ঞান! আমি নির্বিকার—প্রকৃতির মধ্যে আছি, তাই।

মুখ ঘুরিয়ে নিল সে অন্যদিকে। তার নাসারন্ধ্র কাঁপছিল। ঠোঁটও। দীর্ঘ তিন মিনিট সে চুপ করে থাকল। আমিও, চুপচাপ তাকে লক্ষ্য করলুম—। তারপর বললুম—শুনেছি, মেয়েরা যাকে ভালোবাসে না, তাদের শরীর দিতে পারে না। ভাবে, শরীরই তাদের সব। পুরুষেরা তা কোনদিন ভাবে নি। আজও ভাবে না। অবশ্য মেয়েদের সন্তান ধারণ করতে হয়—সেটাই যা রিস্ক। প্রকৃতির রক্ষাকবচ। তবে আজকাল—প্রকৃতির নিয়মকে ফাঁকি দিতে মানুষ পারে। সভ্যতা মানেই তো তাই।

—তুমি আমার সব সুখ নষ্ট করে দিলে, পারুদা।

—কাঁদছ কেন? এতে কান্নার কি আছে?

—কেন? সেক্স ছাড়া কি আর কিছু পেলে না এখানে?

—তুমি কান্না থামাও, বিপাশা! আমার অসহ্য লাগছে!

—তুমি আজও তেমনি জানোয়ার! ব্রুট! কাওয়ার্ড! যাও, আমি তোমার কাছে থাকব না।

সে পা বাড়াল। আমি তার সামনে দাঁড়ালুম।—যেও না বিপাশা।

—গায়ের জোরে আজ আমাকে পাবে না! সরে দাঁড়াও।

—না।

—আমি চেঁচাব। লোক ডাকব।

—তোমার মুখ চেপে ধরব।

—তুমি এত অভদ্র আর নীচ হয়ে গেছ? ছিঃ!

—বিপাশা! আমি নিজেকে থামাতে পারছি না। কারণ, তুমি আমার ছিলে একদিন—আজ আবার আমার হাতেই এসেছ।

—না, না। আপনি সরুন।

ওর দু কাঁধে হাত রাখলুম। ছাড়বার চেষ্টা করল। পারল না। দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—এখনও বলছি, ছেড়ে দিন। বাঁদরামি করবেন না।

তারপর আচমকা আমার গালে চড় মারল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল প্রকৃতিতে একটা তুমুল হইচই পড়ে গেলে। লক্ষ লক্ষ পাখি, প্রজাপতি, ঘাসফড়িং, লাল-পোকা চঞ্চল হল। নীচে নদীর পাড় ভাঙল প্রচণ্ড শব্দে। একটা হাওয়া এসে পড়ল শনশন করে। দূরে মোষের ডাক শুনতে পেলাম—আঁ-ক, আঁক? আমার আদিম অবচেতন শ্রুতির তারে আরও হাজার হাজার শব্দপুঞ্জ প্রতিধ্বনিত হল। সারা শরীরে চোখ ফুটল। আমার দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু টের পেতে পেতে বিপাশা অব্যক্ত বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল। তারও ঠোঁট কাঁপতে থাকল। আমাকে সে দেখেছিল : একটা ঘনডালপালাওলা হিজল গাছ; পাতায় পাতায় পাখির গু পোকামাকড় আর জড়িয়ে থাকা সবুজ সাপ, খসখসে ধূসর গুঁড়ি—পলির হলুদ দাগে বিকীর্ণ—শিসের মতো চিরোল ফুলে প্রজাপতি উড়ছিল। এই গাছ বছরের পর বছর কোন গূঢ় প্রতীক্ষায় বেঁচে থেকেছে। মাটির তলায় শেকড়বাকড় শেকলের মতো তাকে বেঁধে ফেলেছে—তবু, হায়, বন্য আদিম বৃক্ষ, একটা কিছু ঘটবে বলে দাঁড়িয়ে আছে এবং দাঁড়িয়েই আছে :...

পরস্পর তাকিয়ে ছিলুম কতক্ষণ। তারপর বিপাশা নড়ে উঠল। কোত্থেকে একটা রুমাল বের করে চোখ মুছে বলল—দাদা আসছেন।

ঘুরে দেখলুম, গ্রামের বাঘা জোতদার সাবির আলির সঙ্গে বাঁধের পথে শতদ্রু আসছে। সাবির শতদ্রুর আগে আগে কথা বলতে বলতে আসছে। ওর হাতে একটা বন্দুক। শয়তানটা এই সময়ে মনিবের ছেলেকে শিকারে নিয়ে আসছে। কী করব, ভেবে পেলুম না।

শতদ্রুদাকে আমি শাটলেজদা বলতুম। বয়সে আমার চেয়ে অন্তত আট বছরের বড়। খুব ইচ্ছে করছিল তুমুল চেঁচিয়ে বলি—শাটলেজদা। আমি এখানে আছি। কিন্তু সঙ্গে ওই আপদ।

বিপাশা হাসতে হাসতে বলল—ওকী? লুকোচ্ছ যে আবার?

আশ্চর্য। কত সহজে ও হাসতে পারল। আমি ঠোঁটে আঙুল রেখে বললুম —চুপ। বলোনা যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

একটু তফাতে ঘন ঝোপের আড়ালে গিয়ে দেখতে থাকলুম, কত সহজে মেয়েরা পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। বিপাশা কোত্থেকে একটা ভিউফাউণ্ডার বের করল। চোখে রেখে ওপারের দূর মাঠে কী দেখতে থাকল। তারপর কথা বলতে বলতে এসে পড়ল লোক দুটি। শতদ্রুদা কী মারাত্মক ভোল ফিরিয়েছে। চেনাই যায় না। চুলে পাক ধরেছে দেখে অবাক হলুম। চমৎকার পোশাক পরেছে। স্বাস্থ্যে সভ্যতার রঙ জ্বলজ্বল করছে। শয়তান জোতদারটাও প্যাণ্ট বুশশার্ট পরেছে। মোটর সাইকেলেই এসেছে নিশ্চয়।

—হুঁ। গাড়ি দেখেই বুঝেছি, দিদি এখানে আছেন।...সাবির বলল।

শতদ্রু বলল—শিকারে যাবি তো চলে আয় বিয়াস!

বিয়াস! আমার দেওয়া নামটা এখনও ওরা চালু রেখেছে। গায়ে কাঁটা দিল।

সাবির বলল—এমন করে একাদোকা আসবেন না দিদি। জায়গাটা ভাল নয়।

বিপাশা কোন জবাব দিল না।

শতদ্রু বলল—সব জঙ্গল খতম দেখছি। ওই জমিগুলো কাদের সাবিরদা?

—আপনারা থাকলে আপনাদেরই হত। এখন আপনার জ্যাঠার—স্বনামে বেনামে। আমারও খানিকটা আছে। তবে ফসল ফলানোর রিস্ক আছে। বাঁধ ভাঙলেই তো গেল। দিদি, আসুন। হরিয়াল মারব দেখবেন।

বিপাশা বলল—না।

শতদ্রু বলল—তাহলে চলে যা। গাড়ি চুরি হয়ে যাবে।

বিপাশা দাঁড়িয়েই থাকল। কথা বলতে বলতে ওরা দুজনে চলে গেল। গাছপালার আড়ালে ওরা অদৃশ্য হলে বেরিয়ে এলুম। —এখনও দাঁড়িয়ে আছ, কেন বিপাশা?

—তোমার লাস্ট সিন যে বাকি।

—হুঁ। কিন্তু আমি মেক আপ মুছে ফেলেছি। পোশাক ফেলে দিয়েছি।

—তুমি কি কোনদিনই স্বাভাবিক হবে না পারুদা?

—আমি ভীষণ স্বাভাবিক। বরং তুমিই অস্বাভাবিক। আমাকে চড় মেরেছ।

—এস, গালে হাত বুলিয়ে দিই।

—থাক, তুমি চলে যাও বিপাশা।

—তুমি কোথায় যাবে?

—অজ্ঞাতবাসে। পরিচয়হীন দুর্গমতায়।

—আবার হেঁয়ালি করছ?

ঠিক এসময় আমাদের পিছনে শুকনো পাতার খসখস শব্দ হল। কার পায়ের চাপে একটা কাঠি ভাঙল। ঘুরে দেখি, একটা কাঠকুড়োনি মেয়ে। সে হাঁ করে তাকিয়ে

বিপাশাকে দেখছিল।

বিপাশাও তাকে দেখছিল। মেয়েটি কাছে এসে বলে উঠল—বাবুদিদি, ইখেনে কী করছেন গো?

—দাঁড়িয়ে আছি।

—কার সঙ্গে কথা বলছিলেন যেন?

—এই যে এঁর সঙ্গে। কেন?

—কার সঙ্গে?

—এই তো। পারুদার সঙ্গে

—পারু... মেয়েটির চোখ বড় হয়ে উঠল। পারুবাবু! ও বাবুদিদি, কী বলছেন গো? পারুবাবু যে এই হিজলগাছে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল! শোনেন নি?

আমি হাসবার চেষ্টা করলুম। পারলুম না। দেখলুম, বিপাশার ঠোঁট কাঁপছে আবার। হিজলগাছটার দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক। তার পা দুটো কাঁপছে, তাও দেখলুম। পার্থিব জড়তার বিপুল চাপে ওর চেতনার কালো স্নিগ্ধ নদী আঁটো হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ গো। বিশ্বেস না হয়, জিগ্যেস করবেন। গত বছর এমনি মাসে বাড়ীতে ঝগড়া আর খুনোখুনি করে এসে আত্মহত্যে করেছিল। খুব দেমাকি লোক ছিল যে। বউয়ের সঙ্গে বনত না। দিনরাত অনাছিষ্টি কাণ্ড চলত। শেষ অবধি মনের দুঃখে বউকে খুন করে নিজের প্রাণটা নিলে।...ওকী বাবুদিদি, আপনার কি হল?

হো হো করে হেসে ফেললুম। কিন্তু আশ্চর্য, আমার হাসি আর মানুষের ভাষা পেল না। সে হাসি বাতাস হল। গাছপালা দুলে উঠল। কিছু হলুদ পাতা ঝর ঝর করে খসে পড়ল। নদীতে আবার পাড় ধসল। লক্ষ লক্ষ পোকামাকড় চঞ্চল হল।

আর বিপাশা টলতে টলতে গাছটা আঁকড়ে ধরল। বিড়বিড় করে বলল—আমি জানতুম! আমি জানতুম! তবু ভুল হয়।

—বাবুদিদি, আপনাকে ধরব?

—না। তুমি যাও।

—আপনি শিগগির বাড়ী যান গো!

—যাচ্ছি। তুমি যাও, চলে যাও তো এখান থেকে!

মেয়েটি তবু দাঁড়িয়ে রইল। আর বিপাশা হু হু করে নির্লজ্জের মতো কাঁদতে থাকল। তার কুমারীত্বের স্খলন ঘটেছিল এই বনে। আর সেই ঘটনার নায়কটিকে তার মনে জীবিত রেখেছিল। খুনী যেমন খুনের জায়গায় অনিবার্য অবচেতন টানে ফিরে আসে, আসতেই হয়—তেমনি ও এসেছে—আমিও যেমন এসেছিলুম। কিন্তু, এতক্ষণ পরে ওই কাঠকুড়োনি জংলী মেয়েটা আমাকে আবার মৃতদের চিরকালের অতীতে ঠেলে দিল।

বিপাশার অশ্রু আমি নিলুম সারা গায়ে। আমার ডালপালা আর শিসের মতো ফুল সুখে দুলতে লাগল। আমার শ্বাসপ্রশ্বাসে বিপাশার চুল উড়তে থাকল।

শূন্যের খেলা

প্লেন এরোড্রামের মাটি ছোঁওয়ামাত্র আমাকে ভুলে গিয়েছিল নন্দিনী মিত্তির। হুড়মুড় করে বেরিয়ে প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে নিজের লোকজনের ভিড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রথমে বিস্ময়, পরে চাপা ক্ষোভে গরগর করতে করতে দেখছিলাম রঙীন প্রজাপতির মত ওদের গাড়িটা বাঁক ঘুরে গাছপালার আড়ালে মিলিয়ে গেল।

ক্লান্ত হতাশ, আর ক্ষুব্ধ আমি—একবার ভাবলাম, ত্বরিতে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিই—পরে ঠিক করলাম, হাঁটতে-হাঁটতে যাওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে এখন মঙ্গল হবে। নন্দিনী যে এমনি করে হঠাৎ কেটে পড়বে, ভাবতেও পারিনি। তার এ অভদ্রতার কোন তুলনা হয় না। অন্তত একবার মামুলী ভদ্রতার খাতিরে ‘তাহলে চলি’ও বলতে পারত! বলল না তো!

যত রাগ গিয়ে পড়ল বৌদির ওপর। আসবার দিন সক্কালে জানিয়েছিল, গৌহাটি থেকে প্লেনে যাবার পথে এক আশ্চর্য সঙ্গিনী জুটিয়ে দিচ্ছে—আমার হয়ত ভালোই লাগবে তাতে। নন্দিনী মিত্রের মত ছটফট মেয়ের ক্ষেত্রে এই এসকর্ট দরকার হতে পারে। মুখ টিপে হেসেছিল বৌদি। সেই প্রথাসিদ্ধ হাসি—যার সরল অর্থ : সাবধান, এগারো হাজার ভোল্ট! সেই হাসির জবাবে বলেছিলাম, প্লেনে সে-সুযোগ কম। নেহাৎ চোখে-চোখে বড়জোর দু-চারটে ঝিলিক! ওতে আমার মত ক্রনিক ব্যাচেলারের চামড়া বেঁধে না। একেবারে শক-প্রুফ হয়ে গেছি এখন।

শুনে বৌদি বলেছিল, রোসো। এক্ষুনি এসে পড়ছে। দেখলেই ভিরমি খাবে।

ভিরমি অবশ্য খাইনি। মনে মনে ভয় পেয়েছিলাম একটুখানি। ঘোড়ার লেজের মত চুলের ছাঁদ আর বিশেষ করে হাতাকাটা লাল ব্লাউস দেখলে আমার অবস্থা হয় দেবর্ষি নারদের মত—হাতে ভরা তেলের পাত্র আর মুখে ঈশ্বরের নাম। দুদিক সামলাতে বড় বিব্রত হওয়া। তার ওপর ওই পক্ষীকণ্ঠশোভন অনর্গল কণ্ঠ-কাকলী। বাড়ি থেকে গাড়ি করে এরোড্রোমে আসবার পথটুকুতেই কয়েকশো কথা কয়ে দিচ্ছিল নন্দিনী। সেসব কথায় শুধু ভূগোলের বৃত্তান্ত। পাহাড়, নদী বন জঙ্গল, তারপর প্রত্নতত্ব, পরিশেষে জলবায়ু-আবহাওয়ার খবর। আমি কী জানি, তার চেয়ে সে কী জানে, তাই নিয়েই আধঘণ্টা পথ কেটে গেল। মুখ খুলবার বিশেষ সুযোগই পেলাম না। তবে মনকে বলেছিলাম, ধৈর্য ধরো—পৃথিবীতে কতকিছু অসম্ভব সম্ভব হয়ে যাচ্ছে, তো এই সামান্য একটুখানি মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার!

প্লেন ছাড়তে কিছু দেরী ছিল। এয়ার-অফিসের কান্টিনে দুজনে দুটো কোকোকোলা নিয়েছিলাম। দোমড়ানো নলটা সোজা করতে গিয়ে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠেছিল নন্দিনী। বলেছিলাম, হাসলেন যে?

জবাবে ফের এক দমক হাসির আবর্ত। আমার মন থেকে আবর্জনা যতটা বাইরে গেল, বাইরের খড়কুটো এসে জমল তারও বেশি। দমে গিয়ে আর মুখ খুলিনি। আমার চেহারা বা পোশাক-আশাকে কি কিছু হাস্যকর ব্যাপার চোখে পড়েছে ওর। প্লেনে ওঠা অব্দি মনটা কুটকুট করছিল। তারপর প্লেন মাটিছাড়া হতেই গা শিরশির করে ওঠা, বেশ কিছুটা ঝাঁকুনি, কিছু দোলা—এসবের ফলে তখনকার মত নন্দিনীর দিকে কিছুক্ষণ আর

মনোযোগ ছিল না। চূড়ান্ত উচ্চতায় প্লেন স্থির হয়ে চলতে থাকলে আড়চোখে দেখলাম, সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

এতে ধরে নিয়েছিলাম, তাহলে নন্দিনীর মন ছুঁতে পেরেছি সম্ভবত। এরপর সব যা-যা হওয়া উচিত, তাই নিয়ে মনে মনে ঘটনা সাজিয়ে ফেলছিলাম। দমদম পৌঁছনোর পর উভয়ের ডায়ালগ হওয়া উচিত নিম্নরূপ :

নন্দিনী। কী চমৎকার না লাগছিল! অনেকদিন মনে থাকবে।

আমি। আমারও।

নন্দিনী। কই আপনার ঠিকানাটা দিন তো!

আমি। বারে! আপনারটা?

ন। সে হচ্ছে। আপনারটা আগে চাই। এই নিন কলম।

আ। উঁহু। আগে আপনারটা দিন।

ন। উ: কী সাংঘাতিক মানুষ রে বাবা! নিন, লিখুন। কিসে লিখছেন? আমার কিন্তু অটোগ্রাফ বই।

আ। ইস, কত সব প্রখ্যাত লোকের সই নিয়েছেন।

না। (কেড়ে নিয়ে) উঁহু... দেখতে মানা।

এরপর হঠাৎ নন্দিনীর মৃদু টান। ...ওকি, ট্যাকসি করুন। পায়ে হেঁটে যাবো নাকি? অত সোজা নয় মশাই, আগে আমায় পৌঁছে দিয়ে তারপর আপনার ছুটি।

আ। চিরকালের ছুটি নয়তো?

ন। (ভ্রূভঙ্গী করে মুখ ফিরিয়ে) জানি নে যান!

নাঃ এসব কিছুই ঘটল না। আমার দিকে আর চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত। নিজেদের গাড়ি চেপে উধাও হয়ে গেল সে। কী নেমকহারাম মেয়ে!

দোটানায় দুলতে দুলতে হাঁটছিলাম একা। নিজের অসম্ভব নির্বুদ্ধিতার প্রতি ধিক্কার দিচ্ছিলাম। কে একটা নন্দিনী মিত্তির—বৌদির মাসতুতো বোনের বন্ধু—তার এসকর্টের কোন দরকারই ছিল না। একা প্লেনপথে অন্ধও বাড়ি ফিরতে পারে। শুধু বৌদি ওই 'জুটিয়ে দেওয়া' ব্যাপারটা এনে আমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তার প্রথাসিদ্ধ হাসিটুকু এমন সর্বনাশ করে বসবে কে জানত!

অনেক ছোটখাটো ব্যাপারে অনেক সময় মানুষের রাগ হয়। কিন্তু মন তো বহতা নদী —একসময় সবই ভেসে হারিয়ে যায় বিস্মৃতির সাগরে। আশ্চর্যের কথা, নন্দিনীর সেই চলে যাওয়ার ঘটনাটা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। সারা মন দিনের পর দিন বিস্বাদে ভরে উঠতে লাগল। দেখা পেলেই তার সেই অভদ্রতার উল্লেখ করে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে না দিলে এ জ্বালার শেষ হবে না।

কিন্তু ঠিকানা তো জানিনে! বৌদি হয়ত জানে। ঠিকানা চেয়ে পাঠালে সে আবার কত কী সব ভেবে বসবে হয়ত। তাই সে পথে গেলাম না।

কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে নন্দিনীকে আমি খুঁজছিলাম সবখানে। যদি হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যায়। হয়ে যেতেও তো পারে। এ শহর এক আজব শহর। কত অ-ধরাকে ধরিয়ে দেয়, আবার কত ধরার জিনিস অ-ধরা করে তোলে। ছেলেবেলার এক প্রিয় বন্ধু

সনাতনকে চৌরঙ্গীর মোড়ে দূর থেকে দেখে যেতে-যেতে সে ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল। আবার সবচেয়ে শত্রুকে যতই এড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করেছি, সবিস্ময়ে দেখেছি—একই বাসের একই হাতলে ধরে গায়ে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি তার।

একদিন রাসবিহারী এভেন্যুর কাছে পিছনফেরা একটি মেয়েকে দেখে তার সঙ্গে ঘুরপথে কালীঘাট অব্দি হেঁটে গিয়ে পরে আবিষ্কার করলাম, সে নন্দিনী নয়। এরকম ভুল প্রায়ই হচ্ছিল। বিশেষ করে ঘোড়ার লেজওয়ালা মাথা আর হাত-কাটা লাল ব্লাউস দেখলে মাথায় জেদ চেপে যাচ্ছিল। এমনি করে কতদিন নন্দিনী মিত্রকে খুঁজে ব্যর্থ হলাম! তাকে না-বলা কটু কথাগুলো কেবল আমাকেই বিস্বাদে ঝাঁঝে বিষিয়ে তুলতে লাগল। তবু যখনই ফাঁক পাই, তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল একরকম।

অবশেষে এক সন্ধ্যায় এতদিন পরে নন্দিনী মিত্রকে আবিষ্কার করলাম। গড়ের মাঠের একপ্রান্তে ঝোপের আড়ালে খুব ঘনিষ্ঠভাবে একটি যুবকের সঙ্গে বসে ছিল সে। একা থাকলে কী হত বলতে পারব না—সঙ্গে ওই নর্দমা-প্যান্ট থাকায় রাগে শরীর জ্বলে উঠল আমার। নির্জন ঝোপঝাড়ে সন্ধেবেলা বেশ চলেছে তাহলে!

কিন্তু, নন্দিনীকে আর যাই ভাবি এত সাধারণ মেয়ে বলে আদৌ ভাবতে পারিনি কোনদিন! ওই বাজে মস্তানপ্রকৃতির ছেলেটির সঙ্গে এইভাবে সে প্রেম করবে, কল্পনাও করিনি। যাই করুক সে—তার স্থান কিন্তু উঁচুতেই দিয়েছিলাম। ও ছিল আসলে আমার এক অ-ধরা। ওকে ধরবার খেলায় মনও কি চুপিচুপি জীবনের ভিন্ন এক স্বাদ টের পাচ্ছিল না? যখনই ওকে ভেবেছি—দেখেছি, চিরকালের সেই প্রেমিকাদের একজন। অজস্র ভালোবাসার আলো মিলে গড়েছে এক জ্যোতির্বলয়। ওকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। তার ছটায়ও আকাশের পরীদের মত সুন্দর আর পবিত্র! হয়ত কড়া কথা শোনাতে গিয়ে বলে বসতাম, দুষ্টু মেয়ে, সেদিন অমন করে পালিয়ে গেলে কেন বলতো? আমায় কষ্ট দিয়ে কী সুখ পেয়েছ তুমি! নয়ত শুধু মুখ টিপে হেসে বলতাম, মিস মিত্র, মনে পড়ে না?...যদি জবাব পেতাম : বলুন তো কী, বলতাম—কেন, সেই কয়েকটি ঘণ্টার আকাশযাত্রা, যখন ইচ্ছে করছিল যদি উধাও হয়ে যাই অনন্ত শূন্যের মাঝে কোন নীল কবোস্ব নক্ষত্রের দিকে, আর (প্লেনের পাইলট বাদে) আর সব যাত্রী হঠাৎ কর্পূরের মত উবে গেছে আমার ভালবাসার যাদুমন্ত্রের বিপুল চাপে, মাত্র আমরা দুজন যাত্রী!...মিস মিত্র কি ভয় পেয়েছিলেন? পাননি। আস্বস্ত হলাম তাহলে। দেখুন, ব্যাপারটা সামান্য, হয়ত তুচ্ছ—তবু ওই ইচ্ছেটা যেহেতু আকাশের ওপর জেগে উঠেছিল, ওর মহত্ব আপনি অস্বীকার করতে পারেন না! মাটিতে পা দিলে অবশ্য সবই উদ্ভট বা বাজে লাগে। কারণ, মাটি খুব নোংরা জিনিস দিয়ে তৈরী।

নন্দিনী ছিল আমার কাছে ভালবাসার এক বিশুদ্ধ প্রতীক। আর সে এখন এক মস্তানের নর্দমাপ্যান্টে শরীর এলিয়ে তার কুৎসিত মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাতা-ডালপালার ফাঁক দিয়ে যে আলোর কুচি ওর মুখে পড়েছে, তাতেই চিনতে পারলাম। সেই মুখ, সেই সরু নাক, চাপা চোখের টানা ভুরু, সুন্দর চিবুক। পাকা শশার মত মুক্ত বাহু পাপ-পুণ্যের মাঝামাঝি লোভনীয় সাঁকোর মত আলো-অন্ধকারে দুলছে। দেখতে দেখতে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। ঘৃণায় ক্ষোভে রাগে অস্থির হয়ে দ্রুত কাছে গেলাম। প্রথমেই ছেলেটিকেই বলে বসলাম, কী দাদা, খুব যে...

ছেলেটি লাফ দিয়ে উঠল। পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতের মুঠো পাকিয়ে। চোয়ালে প্রচণ্ড ঘা খেয়ে ছিটকে পড়লাম। মেয়েটি চিৎকার করছিল, পুলিশ, পুলিশ! তারপর আর

উঠে দাঁড়ানোর ফুরসুৎ পাওয়া গেল না। কোত্থেকে কারা সব দুদ্দাড় দৌড়ে আসছিল। এসেই ভীষণভাবে মারতে থাকল আমাকে। একসময় আর কিছু টেরই পেলাম না।

হাসপাতাল থেকে মেজদা ছাড়িয়ে এনেছিলেন। তাঁর তদ্বিরে আর পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি। বেশ কিছুদিন বাড়ি বসে থেকে শরীরটা সারিয়ে নিচ্ছিলাম। পৃথিবীকে বিস্বাদে ভরিয়ে দিল নন্দিনী এমনি করে। কেবল মানুষের নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। প্রতিটি মানুষকে খুন করতে ইচ্ছে করছিল। পেন্সিল-কাটা ছুরিটা দিয়ে জানালার চৌকাঠ পেঁচিয়ে কেটে মানুষের গলাকাটার শোধ তুলি। শূন্যে ঘুরিয়ে তাক করে ছুঁড়ে মারি নন্দিনী মিত্রের দিকে—ছুঁড়েই চমকে উঠে দৌড়ে যাই। কুড়িয়ে নিয়ে মনে মনে বলি, কিছু মনে করো না। এ আমার শূন্যের খেলা।

পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো! এবং এই ভয়ে অবশেষে বাড়ি থেকে বেরোতেই হল। গড়িয়াহাটের মোড়ে হঠাৎ ফের দেখা পেয়ে গেলাম নন্দিনীর। আমি কাছে যাবার আগেই দোতলা বাসে চেপে বসল। দৌড়ে চলন্ত বাসটার দিকে এগিয়ে হাতল খুঁজতে গিয়ে পড়ে গেলাম নীচে। জোর বাঁচা বলতে হয়। কিন্তু উঠে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বাঁ পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। কারা ধরাধরি করে নিয়ে গেল পাশের ডিসপেন্সারিতে। টিপে দেখে ডাক্তার বললেন, কমপাউন্ড ফ্র্যাকচার!

ব্যাস! ফের হাসপাতাল। ফের আরও কয়েকটা মাস। বেরিয়ে দেখি, আগের মত আর স্বাভাবিকভাবে হাঁটা যাবে না। একটু খোঁড়াতেই হবে।

নন্দিনী আমার সর্বনাশ করে গেছে টের পেতে এতদিন লেগে গেল। ক্রমশ সে আমাকে আরো জঘন্যভাবে নীচে নামিয়ে দিচ্ছে আর নিজে বেশ দূরে বোতাম টিপে চলছে। সার্কাসের খেলোয়াড় হতে চেয়েছিল যে, সে হয়ে গেল নিতান্ত লোক-হাসানে ভাঁড় মাত্র। নন্দিনীর শূন্যের খেলাটাই জমেছে—আমি হেরেছি। ক্রমশ সে আমাকে পাতালের দিকে নিয়ে চলেছে—যেখানেই সম্ভবত নরকের স্থান। আমাকে দিয়ে আরও কত জঘন্য কাজ সে করাবে হয়ত।

এর মধ্যে একদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সুব্রতর সঙ্গে। সুব্রত আমার বাল্যবন্ধু। থাকে নৈহাটিতে। একথা-ওকথার পর সে জানাল, সম্প্রতি বিয়ে করেছে। আমার ঠিকানা জানা না থাকায় জানাতে পারেনি।

সুব্রত বলল, সামনের রোববার আয় আমার ওখানে। বৌ দেখে আসবি।

শুধু বললাম, দেখি।

সুব্রত চমকে উঠে বলল, আরে, আরে। তুই খোঁড়াচ্ছিস যে! কী ব্যাপার?

বাস থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।

গ্রহের ফের। কোন ভালো জ্যোতিষীর কাছে যা। তোর চেহারাটাও খুব খারাপ দেখাচ্ছে।...হ্যাঁ রে, প্রেমে-ট্রেমে পড়িসনি তো?

সুব্রত হেসে উঠল। কিন্তু এবার আমার চমকানোর পালা। আমার চেহারায় কি প্রেমে পড়ার কোন চিহ্ন ফুটে উঠেছে চর্ম রোগের মত। দাড়ি অবশ্য একদিন অন্তর কাটি। আজ ছিল কাটবার দিন। বেশ পরিচ্ছন্ন কাপড়চোপড় গায়ে চড়িয়েছি। তবু ও কী দেখল আমার মধ্যে। সুব্রতকে বরাবর বুদ্ধিমান আর হিসেবী বলে জানি। আমি বললাম, কী বলিস! এ-ভূতের মত কুচ্ছিত চেহারা নিয়ে প্রেম করার আশা কোথায়?

সুব্রত ধমকাল। ...থাম, থাম। ওটা ব্যজস্তুতি। ওরকম কন্দর্পকান্তি থাকলে আমি... যাকগে। তাহলে সামনের রোববার যাচ্ছিস। কেমন? কখন যাবি? সকালে, না বিকেলে?

বিকেলেই যাবো!

মনের মেজাজ বোঝা কঠিন। রোববারের বিকেলে নৈহাটির মত জায়গায় গিয়ে সুব্রতর মত গেরস্থ সাধারণ চরিত্রের ছেলের বৌ দেখবার তাগিদ আদৌ ছিল না। কিন্তু কিসে কী হয়ে যায়। সুব্রত আমার চেহারার প্রশংসা করেছিল—কথাটা অনেকদিন ভোলা গেল না। আমি জানি, আমি কন্দর্পকান্তি নই; তবু এই মানসিক অবস্থায় সুব্রতর ওই ছোট্ট কথাটুকু সুড়সুড়ি দিচ্ছিল সম্ভবত। কথামত ওর ওখানে গেলাম রোববার বিকেলে।

গঙ্গার ধারে বেশ চমৎকার জায়গায় বাড়ি করেছে সুব্রত। বরাবর ওকে অধ্যবসায়ী ছেলে বলে জানতাম। পৈতৃক ছোট্ট একটা ব্যবসা ছিল। সেটাকে কামধেনুতে রূপান্তরিত করেছে প্রচুর সাধনায়। ওর উদ্যমের প্রতি ঈর্ষাবোধ হচ্ছিল। দিন-রাত্তির এত সব স্থূল কাজকর্মের বোঝা যাকে বইতে হয়, তার অবশ্য আমার মত উটকো মনোবেদনার ব্যাধি না থাকাই সম্ভব। নিষ্কর্মাদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা এক ঝক্কিকার।

ওর বাইরের ঘরে যখন অপেক্ষা করছি, তখন পর্দার ওদিকে একটা চাপা কলগুঞ্জন, তারপর মৃদু ধ্বস্তাধ্বস্তি, শেষে ধমকের ফিসফিস শোনা গেল। কাকে যেন টানাটানি করছে সুব্রত, সে ভারী অবাধ্য। ব্যাপার কী?

একটু পরেই সুব্রত এল পর্দা তুলে। ওর মুখটা কেমন থমথমে আর লাল—অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল, বোস, বোস। তোর খারাপ লাগছে না তো?

বললাম, না, না। খারাপ লাগবে কেন?

সুব্রত মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসল। তারপর তার ঘরবাড়ি ব্যবসা-পত্তরের কথা বলতে লাগল। ইতিহাস বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে সে আড়চোখে একবার করে অন্তরমহলের পর্দাঢাকা দরজার দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকাচ্ছিল।

দুম করে বলে ফেললাম, তোর বৌ কোথায়? আলাপ করিয়ে দিলিনে যে!

সুব্রত নীরস মুখে বলল, আসছে এক্ষুনি। মেয়েদের তো জানিস, অতিথি এলে যা সব করেটরে।...

আমি উঠে দাঁড়ালাম।...চল, ভিতরে গিয়েই আলাপ করে আসি। আপত্তি নেই তো?

সুব্রত হঠাৎ উৎসাহী হয়ে উঠল।... সেই ভালো। যা মুখচোরা মেয়ে, লজ্জায় একাকার। মাইরি, এসব ব্যাপারে ও একটু...যাকে বলে, ভীষণ ইয়ে...

আরও কী বলছিল সুব্রত। ওদিকে ভিতরে ঢুকেই আমি কাঠ। নন্দিনী, হ্যাঁ নন্দিনীই তো, পলকে লাল বেনারসীর ঘোমটা ছ' ইঞ্চি ঝুলিয়ে পাশ ফিরে দাঁড়িয়েছে! একটু নীচু টেবিলে চায়ের কাপ খাবারের প্লেট রয়েছে। সম্ভবত কাপে চা ঢালছিল—একটা কাপের পুরোটা ভরতিও হয়নি—আমাকে দেখামাত্র চমকে উঠে হাত তুলে নিয়েছে। পিছন ফিরেছে।

সুব্রতর মত সাধারণ গেরস্থ ছেলের সঙ্গে নন্দিনীর বিয়ে হয়েছে! আপাতদৃষ্টে এটা যত বিষম দৃশ্যই বোধ হোক, এর কারণ আমি অনেকখানিই জানি। চরিত্রভ্রষ্টা মেয়েকে বাধ্য হয়ে এমনি সাদাসিধে জায়গায় গছাতে হয়েছে—নৈলে হালে পানি পেত না ওর বাবা। তাছাড়া আর কোন অর্থ হয় না এ বিয়ের।

সুব্রত ততক্ষণে ওকে টানাটানি করে আমার সামনে দাঁড় করানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। মুখটা একটুখানি দেখলাম ফের। নন্দিনীই তো! তবু নামটা যতক্ষণ না জানছি, আশ্বস্ত হওয়া কঠিন। এক ফাঁকে বললাম, দেখুন, ওসব লজ্জাটজ্জা করার কোন মানে হয় না—আমাকে তো ভালই চেনেন...

সুব্রত বলল, বলিস কী রে! তুই ওকে চিনিস!

বললাম, চিনি মানে—একদিন পথে আসতে-আসতে আলাপ।

তাই বল। সুব্রত ফ্যাঁচ করে হাসল।...তাহলে তো নন্দা, তুমি খুব অপমান করছ ওকে।

আমি বললাম, ওকে অবিশ্যি নন্দিনী বলেই জানতাম।

সুব্রত অবাক হয়ে বৌর উদ্দেশ্যে বলল, হ্যাঁ গো, তোমার আবার নন্দিনী নাম ছিল নাকি? বেশ মজার ব্যাপার তো!

নন্দিনীর মৃদু আওয়াজ শুনলাম। সেটা হ্যাঁ বা না, কিংবা অন্য কিছু, তা বোঝা গেল না। মনে হল, বেচারা ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। কাঁপছে হয়ত। খুব প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে ভেবে আমার যা আনন্দ হচ্ছিল বলার নয়। এবার যথেষ্ট হয়েছে। ওকে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দেওয়া ভালো। আমরা বেরিয়ে বসবার ঘরে এলাম। নন্দিনীর ঘোমটা পূর্ববৎ রয়েছে—কোনরকমে এ ঘরে ভরা ট্রেটা পৌঁছে দিয়েই কেটে পড়ল। গড়ের মাঠের সেই সাংঘাতিক কাণ্ড নিয়ে ওকে ব্ল্যাকমেল করব ভেবে হয়ত খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে কিন্তু হঠাৎ আমার মনটা বিস্বাদে ভরে উঠল। নন্দিনী তাহলে ফাঁকি দিয়ে হাতের নাগালের বাইরে চলে গেল! আর কিছু বলা যাবে না— শোনানো যাবে না কোন বড় কথা। সেজন্যেও হয়ত নয়—আমি টের পাচ্ছিলাম, এতদিন পরে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে আমি নন্দিনীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম এটাই আসল কথা।

নিজের প্রতি রাগে ক্ষোভে অস্থির হয়ে একটা অছিলা দেখিয়ে কেটে পড়লাম তক্ষুনি। সুব্রত নিরাশ হয়ে বলল, খুব জরুরী কাজ যখন বলছিস, তখন আর আটকাবো না। ফের একদিন আয়। আসবি তো?

আমি বললাম, আসবো।

ফেরার পর যতবার মনে পড়ছিল যে নন্দিনী আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে চিরকালের মত—তত আমি উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম! এবং সেইসব জাতীয় উদ্ভট আচরণের মূলে ছিল নন্দিনীর প্রতি আমার অন্ধ প্রেম—এই সত্যটুকু বিষের মত পুরনো ক্ষতে সংক্রামিত হয়ে আমার জ্বালা বাড়িয়ে দিচ্ছিল। না, নন্দিনীকে আমি জীবনে সুখী হতে দেব না!

ঝোঁকের বশে সুব্রতকে একটা চিঠি লিখে বসলাম। চিঠিতে নন্দিনীর গড়ের মাঠের সেই গোপন প্রেমচর্চার কাহিনীটুকু সবিস্তারে জানিয়ে দিলাম। সুব্রত এতে ক্ষেপে যাবে নিশ্চয়। কী ভাবে নেবে—সেটা অবশ্য অনুমান করা কঠিন আপাতত। কিন্তু নন্দিনীকে বলবে এবং নন্দিনী মনে মনে শিউরে উঠবে। আমাকে মনে পড়বে। গৌহাটী থেকে প্লেনে আসবার কথা—তারপর হঠাৎ কোন কথা না বলে চলে যাওয়ার ঘটনা—সবই ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করবে।

চিঠি পেয়েই সুব্রত হাঁফাতে হাঁফাতে হাজির।...আরে, তুই কীসব মাথামুণ্ডু লিখেছিস!

দৃশ্যটা উপভোগ করছিলাম। কোন জবাব দিলাম না।

সুব্রত বলল, গড়ের মাঠে ওর বেড়ানোর চান্স কিছুতেই থাকতে পারে না। ও তো গ্রামের মেয়ে।

চমকে উঠে বললাম, গ্রামের মেয়ে মানে?

সুব্রত বলল, হ্যাঁ। কুতুবপুরের মেয়ে। তিনকুলে কেউ নেই। মামার বাড়ি মানুষ হয়েছে। তোকে বলতে লজ্জা নেই—সামান্য লেখাপড়া জানে মাত্র। তবে বুঝতেই তো পারছিস, ওর স্বাস্থ্য-টাস্থ্য বা চেহারা বেশ ইয়ে—তাই পছন্দ হয়ে গেল।

রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম।...ব্লাফ দিস নে সুব্রত। ওর মুখের প্রত্যেকটি রেখা আমার চেনা। কোনমতে ভুল হতে পারে না। গৌহাটি থেকে প্লেনে ওকে সঙ্গে করে দমদম আসছিলাম—তারপর...

সুব্রত হাসতে হাসতে ফেটে পড়ল।...মাথায় জল ঢাল খানিক। প্লেনে আসছিল নন্দা—হি...হিহিহি...তারপর হাসি থামিয়ে বলল, তোর চোখের ভুল। আসলে সেই মেয়েটিকেই তোর একটুও মনে নেই।

মনে নেই? আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেল। নিঃসাড় হয়ে কিছুক্ষণ ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। সুব্রত একটা গোপন চাবি—যা এযাবৎকাল আমার হাত এড়িয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ টিপে দিয়েছে! আরে তাই তো! তাই তো! কয়েক ঘণ্টার দেখা মুখ—আমার কি সত্যি সত্যি মনে থাকা সম্ভব? নন্দিনীর মুখ বলে যে সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানি আমি এতদিন যত্ন করে ধরে রেখেছি, তা আমারই বানানো নয়ত? দাদার বিয়ে হয়েছে আজ চার বছরেরও বেশি, থাকে গৌহাটিতে—সেই বৌদির মুখও তো স্পষ্ট মনে পড়ে না! মাঝে মাঝে মনে করতে চেষ্টা করি—মনে পড়ে আবার পড়েও না! মাঝে মাঝে যাদের সঙ্গে দেখা হয়—তাদের মুখও স্পষ্ট মনে থাকে না অনেক সময়। শুধু দেখা হলেই যা চেনা যায় এইমাত্র। নন্দিনীকে আমি কতক্ষণই বা দেখেছি!

আর ভুল মুখের বা ভুল চেহারার পিছনে ধাওয়া করা হাস্যকর। কিন্তু পুরনো ব্যথাটা থেকেই গেল। একবার মাত্র দেখা হলেই যেন সব নিরাময় হয়ে যাবে।

এর কিছুদিন পরে দাদাবৌদি এসে গেল। নির্জন বাড়ি আনন্দে ভরে উঠল! একথা ওকথার পর এক ফাঁকে বৌদিকে বলে বসলাম, আচ্ছা বৌদি, সেই মেয়েটির খবর কী?

বৌদি বলল, কোন মেয়েটি? তুমি এখনও মেয়েদের খবর রাখতে ভোলনি দেখছি। ভেবেছিলাম, ক্রনিক ব্যাচেলারদের নারীপুরুষ ভেদজ্ঞান থাকে না। তোমার আবার কী হল?

বললাম, ঠাট্টা নয়। তোমার সেই অদ্ভুত মেয়েটির খবর জানতে চাচ্ছি। বেশ ভালো সঙ্গিনী জুটিয়ে দিয়েছিলে! বাপস!

বৌদি হাসল।...নন্দিনীর কথা বলছ? কেন, কী করেছিল ও?

কিছু না। যা বকবক করছিল সারা পথ!

ও একটু খামখেয়ালী মেয়ে। বৌদি চোখ টিপে ফের বলল—তারপর বুঝি আর পাত্তা দেয়নি?

বাজে বকো না।

বুঝেছি। ওর কাছে পাত্তা পাওয়া কঠিন। চেষ্টা করেছিলে নাকি?

দায় পড়েছে! এবার আমি ফেটে পড়লাম।...ওরকম অভদ্র মেয়ে আমি কোথাও দেখিনি কিন্তু। দমদমে নেমেই কোন কথা না বলে নিজেদের গাড়িতে কেটে পড়ল! মামুলী ভদ্রতারও বালাই নেই।...

সব শুনে বৌদি একটু চুপ করে থেকে বলল, তাই নাকি! এতসব কাণ্ড হয়ে গেছে! কিচ্ছু জানাওনি তো! আমরা শুনেছিলাম, বাস থেকে পড়ে এ্যাকসিডেন্ট করেছ। কী আপদ!

বৌদি কেমন দমে গিয়েছিল যেন। বললাম, ওর ঠিকানাটা আমার ভারী দরকার।

ঠিকানাও দেয়নি বুঝি?

না।

ঠিকানা আমার কাছে আছে। কিন্তু যে এমন অভদ্র, তার ঠিকানা নিয়ে কী করবে? গাল দিয়ে আসবে নাকি?

ঠিক তাই।

বৌদি হাসতে হাসতে বাকসো খুঁজে একটা গানের খাতা আনল। তার কোন কোনায় একটা ঠিকানা লেখা রয়েছে। টুকে নিলাম তক্ষুনি। বৌদি বলল, সেই ভালো। ঝগড়া করে এসো। কিন্তু দেখো, ফের মাথা খারাপ না হয়ে যায়! একখানা পা গেছে, ফের আর একখানা না খুইয়ে বসো আবার।

মার্চের সুন্দর সকালে হাল্কা মনে, এতদিন পরে, সত্যিকার নন্দিনীর কাছে পৌঁছতে যাচ্ছিলাম। কিছুদূর এসে হঠাৎ মনে হল, কে যেন পিছন থেকে পা দুটোকে টেনে ধরছে ক্রমশ। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে আর পা তুলতে পারলাম না সামনের দিকে। কী দরকার! কেন ক্ষোভ, কেন কটুকথা বলার এত সাধ! ক্ষণিকের এক সঙ্গিনী মেয়ে—আমাকে কী ভেবেছিলে, সম্মান না অপমান করেছিল, তা নিয়ে মাথাব্যথার কোন অর্থ হয় না। তার ওই অভদ্রতাটুকুর মূল্যে এদিকে আমি এতগুলো দিন কত কীসব বিচিত্র জিনিস কিনে বসে আছি—সে তো কম নয়!

শুধু একটা তীব্র কৌতূহল শেষঅব্দি থেকে যায়। সত্যিকার নন্দিনীর চেহারাটা কেমন ছিল? পা তোলার চেষ্টা করলাম। নাঃ, থাক। যা স্বপ্নে আছে, মায়ায় আছে, তা স্বপ্নে বা মায়ায় থাক—বাস্তবের রক্ত-মাংসে তা মিলিয়ে নিতে গিয়ে আবার কী ক্ষতি করে বসব কি না কে জানে। ক্ষণিকের দেখা একখানি মুখ অজস্র মুখের পিছনে আমাকে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে, অস্থির করেছে,—তা খুঁজে পাওয়া গেলেই তো সব খেলার শেষ। অ-ধরাকে ধরতে পারলেই যা ছিল, সব হারিয়ে কাঙাল হওয়া। নন্দিনীর ঠিকানাটা ছিঁড়ে ফেললাম। ফিরে এলাম আস্তে আস্তে। সারাজীবন ধরে ভিড়ের মাঝে কোন মেয়ের মুখ দেখে নন্দিনী বলে চমকে ওঠার স্বাদ আমি বারবার পেতে চাই।...

সাপ বিষয়ে একটি উপাখ্যান

সাপটিকে আমি প্রথম দেখি লালীর জন্মদিনে। রঙচঙে চিত্রিত এক সুন্দর বিভীষিকা, কারণ সাপটি ছিল নিস্পন্দ, কয়েক মিনিটের জন্য যেন লালী আর আমার মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল হয়ে উঠেছিল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। জিব ব্লটিং পেপারের মত লালীর জন্য ক্ষরিত সমস্ত গ্রন্থিরস শুষে নিয়েছিল। লালীর জন্মদিনে একগোছা রজনীগন্ধাই শ্রেষ্ঠ উপহার ভেবে সেই শরৎকালের ভোরবেলায় যখন আমি বাগানের দিকে হেঁটে যাই, এখনও মনে আছে, সারারাতের শিশিরের মত আমিও প্রচুর সিক্ত ও কোমল ছিলাম। অথচ রজনীগন্ধার ঝাড়ের ভেতর সাপটিকে দেখামাত্র টের পেলাম কোথাও একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। তাই আমি নিমেষে শুকনো বিবর্ণ টেরাকোটার মত সময়ের দেয়ালে সেঁটে গিয়েছিলাম।

একটু পরে লালীর বাবা দয়াময় দোতলার ছাদ থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আমি এভাবে দাঁড়িয়ে কী করছি। দয়াময় ছিলেন বড় কুটিলমনা আর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মানুষ। তাঁর প্রশ্নের জবাবে আমি ভাঙা গলায় বলি, সাপ। তখন দয়াময় ছাদ থেকে অদৃশ্য হন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের বাগানে এসে ঢোকেন। তাঁর হাতে বন্দুক ছিল। কিন্তু তাঁকে একটুও উত্তেজিত দেখাচ্ছিল না। খুব শান্ত গলায় তিনি সাপটিকে দেখিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যেটুকু সময় লেগেছিল, সাপটির লুকিয়ে পড়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট এবং আর তন্নতন্ন খুঁজে তাকে আমরা দেখতে পাইনি। তখন দয়াময় বাগানের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলেন, বাগানটা একেবারে জঙ্গল করে ফেলেছ তোমরা।

আসলে গ্রামের প্রান্তে পুরনো একটা নালার ধারে এই বাগানটা করেন আমার ঠাকুর্দা। কিছু ফলের গাছের সঙ্গে ফুলের গাছও পুঁতেছিলেন তিনি। আমার বাবা ছিলেন ন্যালাভোলা মানুষ। প্রকৃতি সম্পর্কে উদাসীন এক শহুরে কেরানি। ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর মা কোনও কারণে প্রকৃতির দিকে মুখ ফেরান। তাঁকে যখন-তখন এই বাগানের ভেতর দেখতে পেতাম। শীতের সময় নিজের হাতে ঝাঁটা ধরে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন ধরাতেন। আগাছা ওপড়াতেন। টিনের ঝাঁঝিতে প্রতি বিকেলে জল ঝরাতেন ফুলফলের গাছপালার মূলে এবং গাছটি তাঁর তুলনায় নিচু হলে তার সর্বাঙ্গ ধুইয়ে দিতেন। তাঁর চোখে বাৎসল্যের উজ্জ্বলতা ঝলমল করতে দেখেছি।

আর দয়াময়কে দেখতাম দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে বাগান-পরিচারিকা আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে। স্কুল থেকে ফিরে প্রতি বিকেলেই জানতাম মাকে কোথায় দেখতে পাব। বাবা সাইকেলে চেপে শহরের আপিসে যেতেন। তাঁর ফিরে আসতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত। কোনও কোনও মধ্যরাতে পাশের ঘর থেকে মায়ের চেঁচামেচি শুনতে পেতাম। তারপর আমার ন্যালাভোলা, শান্ত ও মৃদুভাষী বাবাকে এক বসন্তকালের ভোরবেলায় এই বাগানের ঈশানকোণের আমগাছের উঁচু ডাল থেকে ঝুলতে দেখা যায়। সেই প্রথম বাবাকে আমি উলঙ্গ দেখি। আমার বয়স তখন সাত বছর।...

দয়াময়ের মেয়ে লালী ছিল আমার সহপাঠিনী। লালী চুপি চুপি আমাকে বলেছিল, জানিস বীরু, কেন পানুকাকা গলায় দড়ি দিয়েছেন? আমার বাবার সঙ্গে তোর মায়ের ভাব ছিল।

ওই বয়সে 'ভাব' ব্যাপারটা আমার বোধগম্য ছিল না। অথচ পরে বুঝেছিলাম মেয়েরা কত আগে জীবনের অনেক গূঢ় জিনিস টের পেয়ে যায়। আর লালীই একদিন মুক্তকেশীর ভাঙ্গা মন্দিরতলায় কল্কেফুলের জঙ্গলে কল্কে ফুল তুলে কীভাবে মধু চোষা যায় শেখানোর সময় হঠাৎ মুখ টিপে হেসে বলেছিল, বীরু, আমিও তোর সঙ্গে ভাব করব, রাজি?

কিছু না বুঝেও বলেছিলাম, রাজি।

তারপর কত দিনভর রাতভর ভেবেছি, ভাব কী জিনিস জেনে নিতে হবে লালীর কাছে। অথচ বাবার ন্যালাভোলা ধাতটি আমার মধ্যে এমনই প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, জিগ্যেস করতে সাহস পেতাম না। লালী ছিল তেজী ছটফটে মেয়ে। ছেলেদের সঙ্গে স্কুলের ময়দানে খেলাধুলো করত। ছেলেদের মধ্যে মাতব্বরি করত। সংস্কৃত পণ্ডিত মশাইয়ের ঘুমন্ত হাঁ-করা মুখে সে একটুকরো চক ফেলে দেওয়ায় ক্লাসসুদ্ধ বেতের ঘা খাওয়া সত্ত্বেও কেউ তার নাম করে দেয়নি। তার বাবা দয়াময় স্কুলের সেক্রেটারি, সেজন্যও নয়। আসলে লালীকেই যেন সবাই ভয় পেত।

তো এই লালীর জন্মদিনে ফুল উপহার দেওয়ার কথা কেন আমার মাথায় এসেছিল, জানি না। আমি তখন রীতিমত যুবক। মেয়েদের জন্য কামনাবাসনা অথবা ভালবাসার বোধে জ্বরো-জ্বরো। যে আবেগে পাখিরা বাসাগড়ার জন্য খড়কুটো কুড়িয়ে বেড়ায়, সেইরকম জীব-জাগতিক আবেগ আমাকে সবসময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। পাড়াগাঁয়ে প্রচলিত 'ভাব' শব্দটি কী, ততদিনে আমার ওতপ্রোত জানা হয়ে গেছে। অথচ তখনও সাহস পাই না যে লালীকে স্মরণ করিয়ে দিই মুক্তকেশীর মন্দিরতলার সেই বিস্ময়কর মুহূর্তটিকে।

লালীর চেহারায় রুক্ষতাময় লাবণ্য ছিল। যত বয়স বাড়ছিল, তত তার লাবণ্যকে ক্ষইয়ে দিচ্ছিল সেই উগ্র রুক্ষতা। তাই কি তার বিয়ে হচ্ছিল না? বুঝি না। পাড়াগাঁয়ে জন্মদিন পালনের ব্যাপারটা মোটেও ছিল না। আসলে আমাদের গ্রামের একটি প্রান্ত ঘেঁষে হাইওয়ে এবং বিদ্যুৎ আসার পর এই ব্যাপারটা শহর থেকে আরও সব আধুনিক পণ্যের সঙ্গে চলে আসে। শুনেছিলাম লালীর জন্মদিনে অনেক সরকারি কর্তাব্যক্তি সস্ত্রীক আসবেন। আসবে লালীর কলেজের মেয়ে ও পুরুষ বন্ধুরা। আর তার আগের দিন সন্ধ্যায় লালী এসে আমাকে নেমন্তন্ন করে যায়। বাড়িতে আমি একা ছিলাম। মা গিয়েছিলেন তাঁর অসুস্থ দাদাকে দেখতে। সেই সন্ধ্যায় লালীকে জনহীন বাড়িতে একা পেয়ে আমি কি কিছু করতে পারতাম! অসম্ভব। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, লালীর রুক্ষ চেহারায় ঠিকরে পড়ছিল কী এক দুর্দান্ত চঞ্চলতা, যার সামনে হয়ত পৃথিবীর সেরা সাহসী যুবকেরাও নেতিয়ে যেত ভিজে বেড়ালের মত।

সারারাত, আমি ঘুমোতে পারিনি লালীর জন্মদিনে কী উপহার দেব ভেবে। ভোরের দিকে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে যেই মনে পড়েছিল আজ লালীর জন্মদিন, অমনি মনে হয়েছিল, আরে তাই তো! ফুলের চেয়ে সুন্দর উপহার আর কী থাকতে পারে তার জন্য, যে আমার সঙ্গে প্রথম কৈশোরে 'ভাব' করতে চেয়েছিল?

কিন্তু রজনীগন্ধার ঝাড়ের ভেতর ওই চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকা আমাকে ও লালীকে নিমেষে দু'দিকে বিশাল দূরত্বে সরিয়ে দেয়। আমি লালীর জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে যাইনি। লালীও কৈফিয়ত চাইতে আসেনি। আর বাবার আত্মহত্যার পর মা কে জানে কেন প্রকৃতির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত উল্টোদিকে সরে এসেছিলেন। বাগানটি সত্যিই জঙ্গল হয়ে উঠেছিল। মা ফিরে এলে তাঁকে সাপের কথা বলায় গম্ভীর মুখে এবং আস্তে বলেন, এ বাড়িতে একটা বাস্তুসাপ আছে।...

সাপটিকে দ্বিতীয়বার দেখি, নালার ধারে জরাজীর্ণ পাঁচিলের কাছে। আর একটু হলেই তার ওপর পা ফেলতাম। পা ফেলতে গিয়ে কেন জানি না কোথায় পা ফেলছি দেখতে গিয়েই তাকে আবিষ্কার করি। পাঁচিল থেকে ভেঙে পড়া ছোট্ট ইটের স্তূপে কিছু বুনো কচুর ঝোপ গজিয়েছিল। সাপটি তার ওপর খুব আস্তে ওঠার চেষ্টা করছিল। সেবারও আমি নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে পড়ি এবং সাপটিকে ইটের স্তূপের ভেতরে ঢুকে যেতে দেখি। মা মৃত্যুর আগে বহুবার বলে গিয়েছিলেন, বাস্তুসাপ মারতে নেই। বাস্তুসাপ কখনও বাড়ির লোককে দংশায় না।

তারপর কোনও কোনও রাতে সাপটিকে আমি স্বপ্নে দেখতে পেতাম। তার চিত্রবিচিত্র শরীর, জ্বলজ্বল নীল দুটি চোখ, চেরা লকলকে জিভ অবিকল দেখতে পেতাম। আমি তাকে পার হবার জন্য পাখির মত উড়ে যেতাম। একরাতে দেখলাম, তাকে পেরিয়ে উড়ে যেতে যেতে যেখানেই নামবার চেষ্টা করি, সেখানেই মাটির ওপর তাকে দেখতে পাই। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠি। ঘুম ভেঙে যায়। গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ এবং আলো জ্বেলে কুঁজোর দিকে পা বাড়াতে সাহস পাই না। তন্নতন্ন খুঁজি, সাপটা কোথাও আছে কি না। কোনও কোনও রাতে হঠাৎ মনে হয়, সাপটা আমার পাশে এসে শুয়েছে। কোনও রাতে সবে তন্দ্রার ঘোর এসেছে, মনে হয় সাপটি আমার বুকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ফণা তুলে উজ্জ্বল নীল চোখে আমাকে দেখছে।

সাপটির কথা লালীকে বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু বলতে পারিনি তার বিদ্র+পের ভয়ে। লালী ছিল বড্ড ঠোঁটকাটা মেয়ে। এমনিতে সে সবাইকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলত। তার বাঁকা হাসিটি ছিল ব্লেডের চেয়ে ধারাল। প্রতিবেশীরা বলত, অমন পুরুষালি ঢঙ আর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা—কে বিয়ে করবে অমন মেয়েকে? দয়াসিঙ্গি সোনা দিয়ে মুড়েও গছাতে পারবে না কাউকে।

একদিন সকালে হাসিমুখে দয়াময় এলেন আমার কাছে।... বীরু, কী করছ-টরছ বল শুনি?

তাঁকে খাতির দেখিয়ে বসিয়ে বললাম, কিছু না জ্যাঠামশাই।

কিচ্ছু না? অবাক হবার ভঙ্গি করলেন দয়াময়। তাহলে চলছে কী করে তোমার?

কয়েকটা টিউশনি করছি। ওতেই চলে যাচ্ছে।

শুনে একটু গুম হয়ে থাকার পর দয়াময় বললেন, তুমি আমাদের স্কুলে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পার। একজন সায়েন্স টিচার দরকার।

কিন্তু আমি তো আর্টস গ্র্যাজুয়েট।

তাতে কী? দয়াময় একটু হাসলেন। সে আমি দেখব'খন। তুমি আজই অ্যাপ্লিকেশন লিখে হেডমাস্টারমশাইকে দিয়ে এস।...

দয়াময়ের কথামত দরখাস্ত দিয়ে এলাম। হেডমাস্টারমশাই কেমন মুখ করে দরখাস্তটা হাতে নিয়ে শুধু বললেন, ঠিক আছে।

দিনকতক পরে দুপুরবেলায় হন্তদন্ত হয়ে লালী এল। তার চেহারায় খুনির আদল। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সে বলল, বীরু, তোকে একটা কথা বলতে এলাম।

হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কী রে?

লালী [illegible] বলল, তোর বড্ড বাড় হয়েছে। তোকে আমি ভাল ছেলে বলে জানতাম। তোর পেটে-পেটে এত—

হঠাৎ সে থেমে রাক্ষসীর মত কটমটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ভয়-পাওয়া গলায় বললাম, কী ব্যাপার খুলে বল না লালী। আমি তো কিছু জানি না।

জানো না! নেকু! লালী ভেংচি কাটল। তোর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

লালী, কী হয়েছে?

লালী হিসহিস করে বলল, এ লালী তোর জন্য জন্মায়নি জেনে রাখিস। ইস! আমি যেন গাছের ফলটি—হাত বাড়িয়ে টুপ করে পেড়ে নিবি।

বলেই সে তেমনি জোরে বেরিয়ে গেল। আমি ভ্যাবলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। পরে মনে হল, ব্যাপারটা যেন আঁচ করতে পারছি। দয়াময় কি তাহলে লালীর সঙ্গে আমার—

বাস্তুসাপটাকে আমি তৃতীয়বার দেখি বন্যার বছর এবং সেবারই সাপটির সঙ্গে আমার একটি নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সেবারকার মত ভয়ঙ্কর বন্যা কখনও আমরা দেখিনি। তিনদিন তিনরাত একটানা বৃষ্টিতে আমাদের বাগানের পেছনের খালটি এমনিতেই কানায়-কানায় উপচে পড়ছিল। চতুর্থ রাতে ডুমডুম ঢোলের বাজনায় আর কোলাহলে আমার ঘুম ভেঙে যায়। সুইচ টিপে দেখি আলো জ্বলল না। বাইরে এ রাতে ঝোড়ো হাওয়ার শনশন শব্দের সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ মিশে একটি প্রাকৃতিক অস্থিরতার শব্দচিত্র আঁকা হচ্ছিল। আর তার সঙ্গে অন্ধকারের রঙ, বজ্রবিদ্যুতের রঙ, মানুষের আর্তি, ঢোলের ঘোষণার সঙ্গে পঞ্চায়েতি খবর জড়িয়ে-মড়িয়ে শব্দ-বর্ণময় দুর্বোধ্য একটি চিত্রকলা—যা মানুষ ও প্রকৃতি যথেচ্ছভাবে এঁকে যাচ্ছিল, যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

কিছু পরে বিদ্যুতের আলোয় কয়েকটি পলকের জন্য উঠোনের জল দেখতে পাই। তখনই আমার টর্চের কথা মনে পড়ে। ঘরে ঢুকে বালিশের পাশ থেকে টর্চটি তুলে নিই। বারান্দায় বেরিয়ে টর্চটি জ্বালি এবং আমার পা থেকে কয়েক হাত দূরে সেই চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকাকে আবিষ্কার করি।

আলোর মধ্যে ধরা পড়ে সাপটির আঁকাবাঁকা ছন্দময় গতি রুদ্ধ হয়। দ্রুত সে মাথা তোলে। তার ফণা দুলতে থাকে। চেরা লকলকে জিভ আর দুটি নীল উজ্জ্বল চোখ দিয়ে আলোর আড়ালে সম্ভবত আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করছিল।

এবার তার সঙ্গে আমার এক বিপজ্জনক লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। টর্চ নিভিয়ে ফেলি। আবার জ্বালি। মধ্যেকার কয়েকটি সেকেণ্ড সে ফণা গুটিয়ে আবার এঁকেবেঁকে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু যেই টর্চ জ্বালি, সে হিসহিস শব্দ করে ফণা তোলে ও থমকে যায়।

কতক্ষণ এই খেলা চলছিল বলা কঠিন, শেষবার টর্চের ক্ষয়াটে আলোয় তাকে বারান্দায় কোণায় জমিয়ে রাখা আসবাবপুঞ্জের ভেতর ঢুকে যেতে দেখেছিলাম। যে ঘরটাতে আমি শুই, তার দরজা থেকে দূরত্বটা ছিল হাত দশেকের মত। কাজেই ঘরে গিয়ে দরজা এঁটে এবং সাপটার এঘরে ঢোকার মত ফাঁক বা ফাটল আছে কিনা সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা

করে যখন আমি শুয়ে পড়লাম, তখন আমার শরীর পাথরের চেয়ে ভারি আর নির্জীব। আমার স্নায়ুকোষগুলি নিষ্ক্রিয়। নেপথ্যের প্রাকৃতিক ও মানবিক যাবতীয় শব্দচিত্র নিতান্তই প্রতিভাসিক হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারছিলাম না আমি কোথায় আছি, কিংবা জীবিত না মৃত, নাকি এতদিনকার দেখা ঘুমের অন্তর্বর্তী সমস্ত স্বপ্ন একত্রিত হয়ে আমাকে অবচেতনায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিভাসময় প্রায় জড় আমার অস্তিত্বের ভেতর সারাক্ষণ ফণা তুলে হিসহিস করছিল ওই সুন্দর বিভীষিকা—তার কুণ্ডলী-পাকানো শরীর আমার বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হিম করে দিচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, প্রকৃতির গভীর এক সন্ধিস্থলে, যেখানে জড় ও প্রাণের সীমান্তরেখা, সেই জীবন্মৃত্যুময় রেখাটির ওপর আমি শুয়ে আছি।

শেষরাতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে কেউ ডাকছিল। তিনি দয়াময়। দরজা খুলতেই একরাশ জল ঢুকে পড়ল ঘরে। পায়ে সাড়া ছিল না বলেই দরজার নিচের সূক্ষ্ম ফাটল দিয়ে চুইয়ে পড়া জলে ঘরের মেঝের সিক্ততা টের পাইনি, অথবা স্বপ্নাচ্ছন্নতাই এর কারণ। দয়াময়ের হাতে টর্চ ছিল। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কী বীরু? পৃথিবী ভেসে গেলেও চিরদিন তোমার হাঁটু জল।

দয়াময় আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। আমি তাঁকে সাপের কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু উনি কান করলেন না। আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামালেন। উঠোনের জল দু'জনেরই কোমর পর্যন্ত জড়িয়ে ধরল। নীলধূসর আলোয় একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু নিষ্প্রভ দেখতে পেলাম। বাতাস বন্ধ। চারদিকে শুধু জলের শব্দ। মাঝেমাঝে মানুষজনের চিৎকার। দয়াময় যখন আমাকে তাঁর দোতলায় পৌঁছে দিলেন, তখন প্রথমেই আমি লালীকে খুঁজলাম। কিন্তু তাকে দেখতে পেলাম না। দয়াময় আমাকে একটা লুঙ্গি পরতে দিলেন। আমার আমি সাপের কথাটা বলতে গেলাম। অমনি দয়াময় চাপা স্বরে রুষ্টভাবে বললেন, সাপ তোমার মাথার ভেতর।

আলো আরও স্পষ্ট হলে দয়াময়ের গেটের কাছে রিলিফের নৌকা এল। দয়াময় তখন রিলিফের কাজে বেরিয়ে গেলেন।...

সাপটির সঙ্গে আমার চতুর্থবার দেখা হয় বন্যার জল গ্রাম থেকে নেমে যাওয়ার ক'দিন পরে। বারান্দার কোণায় রাখা আসবাবপত্র ফেলে দেবার জন্য যে লোকটিকে ডেকে এনেছিলাম, তার নাম ছিল শুকুর। সে ছিল নিতান্তই এক খেতমজুর। কিন্তু সাপ মারতে তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। গ্রামের বহু সাপ সে মেরেছিল। আমাদের এলাকায় দু'চারজন ওঝা ছিল বটে, কিন্তু সাপধরা বেদে ছিল না। তাই কোথাও বিষাক্ত সাপ দেখতে পেলে শুকুরকে ডাকা হত। শুকুর বারান্দার কোণা থেকে সব বাতিল জিনিস সরিয়ে ফেলে রায় দিয়েছিল, সাপটা চলে গেছে। আর ঠিক সেদিনই বাগানে আগাছার ঝোপের ভেতর হঠাৎ সাপটিকে আমি দেখতে পাই।

বাগানের ঘাসেভরা মাটিটা তখনও ভেজা ছিল। আকাশে ছিল গনগনে সূর্য। ঝলমল করছিল গাছপালা। আসলে আমি সাপটিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আগাছার তলায় স্যাঁতসেঁতে নগ্ন মাটিতে তার চিত্রিত সুন্দর শরীর একেবারে নিস্পন্দ। তার গলার নিচেটা স্ফীত দেখে বুঝলাম সে কিছু গিলেছে, তাই এমন চুপচাপ আর ক্লান্ত।

খুব দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। সাপটিকে মেরে ফেলা এখন হয়ত খুবই সহজ। ছায়ার ভেতর ভিজে মাটিতে ছত্রাক আর খড়কুটোর পাশে সামান্য বাঁকাচোরা তার শরীর

প্রাকৃতিক লাবণ্যে ও কোমলতায় বড় উজ্জ্বল। তাকে আদর করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু ওর ওই সৌন্দর্যের মধ্যে মৃত্যুর বিভীষিকাও ওতপ্রোত। প্রতি সেকেণ্ডে বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছে স্ফীত হতে হতে আমাকে স্বয়ং জীবন এসে ভূতের মত পেয়ে বসল। আমি জীবনচেতনায় অস্থির হয়ে একটা লাঠি আনতে গেলাম।

আর সেই সময় ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে লালীকে আসতে দেখলাম। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। লালী সোজা বারান্দায় উঠল এবং আমার ঘরে ঢুকে গেল।

ঘরে গিয়ে দেখি, সে আমার বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছে। খাটের একটা বাজু আঁকড়ে ধরে সে মুখ নামিয়ে আছে। খোঁপা ভেঙে তার চুল উপচে পড়ছে একদিকে। তার পিঠটা কাঁপছে। আমি আস্তে বললাম, কী হয়েছে রে?

লালীকে সেই প্রথম আমি কাঁদতে এবং ভেঙে পড়তে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে সে সোজা হয়ে বসল। চুলগুলো খোঁপা করে বেঁধে নিল। ভিজে চোখ মুছে ফেলল। তখন আবার জিগ্যেস করলাম, লালী, কী হয়েছে?

লালী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আমার একটা কথা রাখবি বীরু?

কী কথা রে?

লালী আমার চোখে চোখ রেখে বলল, আগে আমার গা ছুঁয়ে বল, রাখবি।

কিন্তু কথাটা কী, আগে বলবি তো?

লালীর ভিজে চোখ জ্বলে উঠল। বীরু, তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি!

খুব হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, তুই মরবি কেন?

লালী শক্ত মুখে বলল, মরব। আর মরার আগে লিখে রেখে যাব আমার মরার জন্য তুই দায়ী।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, কেউ বিশ্বাস করবে না।

লালী উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, এবার যদি আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করি?

এবং এ কথা বলেই সে ঝটপট শাড়ি খোলার ভঙ্গি করল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম সে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। ঝটপট বলে ফেললাম, ঠিক আছে। কথা রাখব। বল কী কথা?

লালী নিষ্ঠুর নিঃশব্দ হেসে বলল, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। তারপর সে কয়েক পা এগিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল, আমার গা ছুঁয়ে বল।

ওর কাঁধ ছুঁয়ে বললাম, ঠিক আছে। বল।

লালী ষড়যন্ত্রসঙ্কুল কণ্ঠস্বরে বলল, তুই এখনই বাবাকে গিয়ে বল—স্ট্রেটকাট বল গিয়ে, আমাকে বিয়ে করবি।

ভীষণ অবাক হয়ে বললাম, লালী! সেবার তুই নিজে এসে—

আমার কথা কেড়ে লালী বলল, তুই একটা ইডিয়েট বীরু! সত্যি সত্যি তো তুই বিয়ে করছিস না। শুধু—মুখে গিয়ে কথাটা বল।

কিন্তু ব্যাপারটা খুলে বলবি তো?

লালী শান্তভাবে আবার বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর পা দোলাতে দোলাতে বলল, বাবা একটা লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিচ্ছে। সে কে জানিস? স্কুলে যে নতুন একজন টিচার জুটিয়েছে—ভূতের মত দেখতে। আচ্ছা, তুই বল তো বীরু, আমি কি দেখতে খারাপ?

কক্ষনো না। সায় দিয়ে বললাম। তুই সত্যি সুন্দর। তোর কেন যে বিয়ে হচ্ছে না!

লালী একটু হাসল। হচ্ছে না নয়। আমি নিজেই বাগড়া দিই জানিস?

বলিস কী!

হুঁ। দেখেশুনে পছন্দ করে যায়। তারপর আমি বেনামে চিঠি লিখে জানিয়ে দিই, মেয়ের চরিত্র খারাপ। কতজনের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করে নষ্ট হয়েছে। একটা চিঠিতে তোর নামও করেছিলাম।

লালী চাপা হাসিতে অস্থির হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অসম্বৃত শাড়ির আড়ালে ওর মেয়েশরীরের কথা ভেবে আমরা শরীরে যৌবনের দুর্দান্ত লোভ গরগর করে উঠল। আর দরজাবন্ধ ঘর। জানালার একটা পাশ খোলা। আবছা আলো এবং নির্জনতা। হঠাৎ আমি দুঃসাহসে বলে উঠলাম, তোর কথা আমি রাখছি। কিন্তু—

লালী ভুরু কুঁচকে তাকাল, বলল, কিন্তু কী রে?

লালী! ছোটবেলায় মুক্তকেশীর মন্দিরতলায় তুই বলেছিলি আমার সঙ্গে ভাব করবি।

হুঁ, বলেছিলাম।

লালীর কণ্ঠস্বরে নির্লিপ্ততা ছিল। আমার শরীর কাঁপছিল। উরু ভারি হয়ে উঠেছিল। নিজের ঘামের বিকট গন্ধ টের পাচ্ছিলাম। তারপরই হঠকারিতায় ওকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম।

লালী আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একই কণ্ঠস্বরে বলল, পাবি। আগে কথাটা বলে আয় বাবাকে। আমি এখানেই থাকছি। বাবা বাড়িতে আছে। গিয়ে স্ট্রেটকাট বলবি।

আমি বেরিয়ে গেলাম। ভারি শরীর টানতে টানতে দয়াময়ের দোতলা বাড়ির গেটে পৌঁছলাম। আর তখনই মনে পড়ল সাপটার কথা। বিস্ময়কর ও ভিন্ন এক হঠকারিতা লালীর শরীরের চেয়ে সাপটির শরীরকে আমার চোখের পর্দায় সেঁটে দিল। দয়াময় সামনের দিকে দোতলার ব্যালকনিতে বসে বন্দুকের নল সাফ করছিলেন। বন্দুক দেখামাত্র জোরে চেঁচিয়ে ডাকলাম ওঁকে, জ্যাঠামশাই! সেই সাপটা বেরিয়েছে।

দয়াময় উঠে দাঁড়ালেন। ব্যস্তভাবে বললেন, চল! যাচ্ছি।...

সাপটি সেদিনও অদৃশ্য হয়ে যায়। হাট করে খোলা আমার ঘরের দরজায় উঁকি মেরে লালীকেও অদৃশ্য দেখতে পাই। আর ঠিক যে ভঙ্গিতে দয়াময় সাপটির গতিরেখা তন্নতন্ন খুঁজছিলেন, আমিও একই ভঙ্গিতে আমার বিছানায় এবং মেঝেতে লালীর গতিরেখা অন্বেষণ করেছিলাম। শুধু এটুকুই তফাৎ যে, দয়াময় সাপটির গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করেননি কিংবা করলেও পেতেন কি না সন্দেহ—আমি ঘরভরা লালীর গন্ধে কিছুক্ষণ আবিষ্ট ছিলাম। আর লালীর শরীরের গন্ধের সঙ্গে আমার শরীরের গন্ধও মিশে ছিল। ক্রমশ সেই মিশ্রিত গন্ধ উবে গেলে প্রচণ্ড উত্তেজনার পর ঠাণ্ডা, হিম এক অবসাদ এসে আমাকে ছুঁল। আমি ভিজে পুতুলের মত নেতিয়ে গেলাম।

সারাদুপুর বিছানায় শুয়ে সেদিন যতবার লালীর কথা ভাবতে যাই, ঝলমলে রোদে চেকনাই সবুজ আগাছার ঝাড়ের তলায় রহস্যময় ছায়ার পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকাটি অবচেতনা থেকে হিসহিস শব্দে সাড়া দেয়। তার চেরা জিভ, নীল দুটি চোখ আমার চোখে প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃতির নিজের হাতে আঁকা আলপনা দিয়ে সাজানো তার ফণাটি দুলতে থাকে। তাকে বলতে ইচ্ছে করে, তুমি এত সুন্দর! অথচ আমার মুখে কথা সরে না। আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় তার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি তো জানি, তার সঙ্গে আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমি তাকে মনে মনে আশ্বাস দিই, আর কোনওদিন দয়াময় বা শুকুর শেখকে ডাকব না। তুমি বেঁচে থাক। আমিও বেঁচে থাকি।

পঞ্চম ও শেষবার সাপটির সঙ্গে আমার দেখা হল এক বিকেলবেলায়। সেদিন আকাশ ছিল নির্মেঘ। ফিকে লাল-হলুদ আলোয় নিসর্গকে দেখাচ্ছিল কনে-বউয়ের মত সলজ্জ আর কোমল। বাগানের কোণায় কেয়াঝাড়ের গোড়ার খাঁজের ভেতর থেকে সে সবে মাটিতে নেমে আসছিল, সহজাত প্রবৃত্তিবশে আমি এক পা পিছিয়ে আসতেই সে ফণা তুলল। মাটিতে আমার পায়ের শব্দের স্পন্দন সে টের পেয়েছিল। কিন্তু আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেলে সে ফণা গুটিয়ে নিল। তারপর চলতে শুরু করল। ঘন ঘাসের ভেতর সে গা ঢাকা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে দয়াময়ের ডাক শুনতে পেলাম। দেখলাম উনি বাড়ির ভাঙা গেটের নিচে বাঁশের আগড় ঠেলে ভেতরে ঢুকছেন। বললেন, ওখানে কী করছ?

কিছু না। এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

দয়াময় একটু হাসলেন। সাপ দেখছ নাকি? তোমার মাথায় আসলে—তো শোনো। সামনে রোববার লালীর বিয়ে। এই নাও—

দয়াময় আমার হাতে একটা সুন্দর খাম এগিয়ে দিলেন। তাতে প্রজাপতির ছবি আঁকা। কোণায় একটু হলুদ ছোপ। বললেন, আসবে যেন। না—না, নেমন্তন্ন খেতে নয়, সব দেখাশুনো করবে-টরবে। বলতে গেলে তুমি একরকম বাড়িরই ছেলে।

আমি চুপ করে থাকলাম। দয়াময় কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন। তাঁর ভুরু কুঞ্চিত। দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে একটু কাসলেন। তারপর ধরা গলায় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, ভবিতব্যের ওপর মানুষের হাত নেই। তোমার মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল—আমারও। তো তুমি বেঁকে বসলে। আমি তো তোমাকে বাধ্য করতে পারি না—

বলেই মুখ তুললেন। চোখে চোখ পড়ামাত্র আমি আস্তে বললাম, জ্যাঠামশাই! আমি জানি লালীর এ বিয়েতে মত নেই।

দয়াময়ের মুখটা তখনই বদলে গেল। যেন আমার কথা বোঝেননি এমন ভঙ্গিতে বললেন, কোন বিয়েতে?

এই বিয়েতে।

দয়াময় নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বরে বললেন, দয়াসিঙ্গি যার জন্ম দিয়েছে, তার মতামত নিয়ে মাথা ঘামায় না।

একটা আবেগ—হয়ত প্রতিবাদেরই আবেগ, কিংবা হয়ত লালীকে বাঁচানোর জন্য একটা জোরালো তাগিদ আমাকে সাহসী করে দিল। বললাম, লালী শিক্ষিতা মেয়ে। তার মতামতের একটা মূল্য দেওয়া উচিত নয় কি জ্যাঠামশাই? যাকে সে পছন্দ করে না, তার সঙ্গে সে কীভাবে ঘর করবে, ভেবে দেখা উচিত নয় কি?

দয়াময় চাপা গর্জন করে বললেন, হুম! তুমি যে এত লম্বা-চওড়া কথাবার্তা আওড়াচ্ছ, তার বেসিস কী? লালী তোমাকে বলেছে বুঝি?

মুখ নামিয়ে বললাম, হুঁ।

দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর দয়াময় বললেন, আমি যেমন জানতাম, তোমার মাও তেমনি জানতেন, লীলার সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক ছিল। ঠিক এজন্যই আমি কথাটা তুলেছিলাম। কিন্তু তুমি—ইউ কাওয়ার্ড! আমার মেয়ের সর্বনাশ করে ছাড়লে! তারপর তুমি—

প্রায় আর্তনাদ করে বললাম জ্যাঠামশাই! বিশ্বাস করুন, আমি লালীর কোনও সর্বনাশ করিনি!

দয়াময় দ্রুত ঘুরে গেটের দিকে পা বাড়ালেন। কয়েক পা এগিয়ে পিছু ফিরলেন এবং আমার কাছে ফিরে এলেন। ভাঙা গলায় বললেন, তোমার একটা চাকরিবাকরি না জোটা পর্যন্ত কথাটা বলব না ভেবেছিলাম। তা ছাড়া আমার ইচ্ছে ছিল, লালীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে কথাটা বলার দরকারও হবে না। কিন্তু এখন মনে হল, বলার সময় হয়ে গেছে।

একটু অবাক হয়ে বললাম, কী কথা জ্যাঠামশাই?

দয়াময় নির্দয়মুখে বললেন, তোমার পড়াশুনো আর সংসার খরচের জন্য তোমার মা এই বাস্তুজমি পুরোটাই আমার কাছে একরারনামা ডিড করে দিয়ে গেছেন। পাঁচবছরে সুদ সমেত টাকা ফেরত না দিলে এর মালিকানা আমার ওপর বর্তাবে। ডিডের মেয়াদ দু'বছর আগে শেষ হয়েছে।

আমি মনে মনে সাপটিকে ডাকছিলাম। এখন দয়াময়ের হাতে বন্দুক নেই।

দয়াময় কেশে গলা ঝেড়ে বললেন, যাই হোক—আমি অত খারাপ লোক নই। আশা করব তুমি লালীর বিয়ের দিনে সক্কাল-সক্কাল যাবে। কাজকর্ম দেখাশুনো করবে। খুব দুঃখের সঙ্গে অপ্রিয় ব্যাপারটা তোমাকে বলতে হল—তুমিই বলিয়ে ছাড়লে। তুমি নিশ্চিন্তে থাক, অন্তত তোমার মায়ের মুখ চেয়ে তোমাকে আমি বাড়ি থেকে উৎখাত করব না—অন্তত যতদিন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারছ।

শেষ কথা বলে দয়াময় শান্তভাবে চলে গেলেন। গেটের বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি আগড়টাও ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন।...

বছরতিনেক পরে একদিন সদর শহরের রাস্তায় মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় লালীর সঙ্গে। আমিই তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। আসলে আমি আকাশ-বাতাস আর সারা শহরটাকে প্রতিধ্বনিত করার মত প্রচণ্ড জোরালো একটি চিৎকার তুলতে চেয়েছিলাম, লালী, তুমি মরনি? লালী, তুমি বলেছিলে 'মরামুখ দেখবে'!

লালীর কোলে একটা বাচ্চা ছিল। তার পাশে পাশে হেঁটে আসছিলেন রোগাটে গড়নের শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক, পরনে ধুতি ও মটকার পাঞ্জাবি এবং তাঁর ঠোঁট খুবই পুরু এবং তাঁর সামনের দাঁতের পাটি ঠেলে বেরুনো। অথচ ওই মুখে গাঢ় অমায়িক ও আলাপী ভাব ছিল।

লালীর আমাকে চিনতে সেকেণ্ড দু'তিন দেরি হয়েছিল। চেনামাত্র সে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, বীরুদা, তুমি! দাড়ি রেখেছ কেন? সে খুব ব্যস্তভাবে তার সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। ...সেই বীরুদা গো—যার কথা তোমাকে প্রায়ই বলি!

আমরা দুটি ভদ্রলোক নমস্কার বিনিময় করি। বাচ্চাটির গাল টিপে আমি আদর করতে গেলে লালী তাকে আমার কোলে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করে। ...তোমার মামা! বীরু মামা! কিন্তু বাচ্চাটি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর লালী খিলখিল করে হাসে। ...বড্ড লাজুক—একেবারে বাবার স্বভাবটি পেয়েছে।

তারপর লালী অনর্গল কথা বলে। গ্রামের খবরাখবর দিতে থাকে। শেষে বলে, একদিনের জন্যও তো যেতে পার বীরুদা। আর শোন, তোমাদের বাড়িটা এখন পুরোটাই ফুলের বাগান! ও নিজের হাতে সব করেছে-টরেছে। দেখলে ভাববে কোথায় এলাম—চোখ জ্বলে যাবে তোমার—সত্যি।

ভাবলাম, ওকে সাপটার কথা বলি। আমার জানার ইচ্ছে হচ্ছিল, সাপটাকে ওরা দেখতে পায় কি না। কিন্তু সেই সময় লালীর স্বামী ভদ্রলোক, সেই স্কুলশিক্ষক চলমান একটা সাইকেল রিকশকে 'রোখো', 'রোখো' বলে দাঁড় করান এবং লালী-সহ ওতে উঠে বসেন। আমি দাঁড়িয়ে থাকি। রিকশটা গড়িয়ে চলার সময় লালী হাসিমুখে ঘুরে বলে যায়, একদিন যাবে যেন বীরুদা!

আর সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পাই, লালীর মুখের সেই পুরুষালি রুক্ষতা তো দেখলাম না! আমি দেখলাম সুন্দরী নারীর প্রসাধিত লাবণ্য আর কোমলতা। চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকা—যাকে অন্তত বার পাঁচেক আমি নিসর্গের গাঢ় ছায়ায় আবিষ্কার করেছিলাম, এতদিনে কি তার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল? জানি না। আমি সত্যিই জানি না।...

স্বামী ও প্রেমিক

রাতভর মাথা খারাপ করে দেওয়া বৃষ্টির পর সকালে রাস্তায় এককোমর জল। আর তার মধ্যে একটা লোক এসে সুকোমলের ফ্ল্যাটের দরজায় ঘণ্টা বাজাল। সুকোমল দরজা খুলে বলল, কাকে চাই?

লোকটা বলল, আপনিই কি সুকোমল বসুরায়?

লোকটার চেহারায় রুক্ষতা। রোগা ঢ্যাঙা গড়ন। লম্বা নাক। পাতলা ঠোঁট। বড় বড় কানে লোম আছে। খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি। পরনে যেমন-তেমন প্যান্ট-শার্ট। চওড়া কপালের ওপর অগোছাল চুল সরিয়ে সে সুকোমলকে কুতকুতে চোখ দিয়ে দেখছিল। সুকোমল বলল, হ্যাঁ। আমিই সুকোমল বসুরায়। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

তাহলে আপনিই সুকোমল বসুরায়। লোকটা যেন নিজেকে শোনাতেই কথাটা আস্তে উচ্চারণ করল। তারপর সেইরকম কুতকুতে চাউনিতে তাকিয়ে ছোট্ট একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, আপনার সঙ্গে গোটাকতক জরুরী কথা আছে।

সুকোমল বলল, বেশ তো। কিন্তু আপনি কোত্থেকে আসছেন—আপনার নামটা?

আমি জ্ঞানেশ মিত্র।

আচ্ছা! বলুন জ্ঞানেশবাবু। সুকোমল একটু হাসল। লোকটার মধ্যে কী একটা অস্বাভাবিকতা আছে, ঠিক ধরতে পারছিল না সে। অথচ ঝটপট কোন আগন্তুকের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার মতো অভদ্র মানুষও সে নয়।

লোকটার ঠোঁটের কোণায় সূক্ষ্ম হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেছে। সে আবার ছোট্ট একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, যাক। চিনেছেন তাহলে। চলুন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক।

সে সুকোমলকে একরকম ঠেলেই ঘরে ঢুকে পড়ল। সুকোমল বিরক্ত। কিন্তু সে একটা কোম্পানির গণসংযোগ অফিসার। সে জানে, কিছু লোকের স্বভাব দেখছি। হুঁ, সেটাই আপনার সুবিধা।

সুকোমল তার স্বভাবসুলভ এবং অভ্যস্ত ধৈর্যের সীমানা থেকে হাসবার চেষ্টা করে বলল, কিন্তু আপনাকে আমি চিনি না জ্ঞানেশবাবু। এই প্রথম আপনার নাম শুনলাম। যাই হোক, আপনি বসুন। বলুন কী আপনার জরুরী কথা।

লোকটি রুক্ষস্বরে বলল, চেনেন না?

না। সুকোমল হাসিমুখে মাথাটা একটু দোলাল।

লোকটা সোফার একপাশে বসে পড়ল এবং হেলান দিয়ে চোখ বুজে আস্তে বলল, আমি মহুয়ার স্বামী।

মহুয়া?

বলুন, তাকেও চিনি না।

সুকোমল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিল। জ্ঞানেশ মিত্র নামে লোকটা চোখ বুজে অদ্ভুত ভঙ্গিতে কপালে একটা হাত ঘষছে। সুকোমল নিজেকে সংযত রেখে বলল, আমি ঠিক

বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চাইছেন।

মহুয়া গতরাত্রে আত্মহত্যা করেছে।

ও।

জ্ঞানেশ মিত্র চোখ খুলল।.....শুধু ও? ভেবেছিলাম আপনি—

সুকোমল শক্তমুখে বলল, আপনি কী আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছেন?

করার মতো যথেষ্ট ডকুমেন্ট আমার হাতে আছে। জ্ঞানেশ মিত্র নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল। ......যাই হোক, আপনার বয়স কত সুকোমলবাবু?

কেন?

আমি বেয়াল্লিশ। মহুয়া আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিল। আমার ধারণা আপনি পঁয়ত্রিশ-টয়ত্রিশ। জ্ঞানেশ মিত্র একটা পা লম্বা করে প্যান্টের পকেট থেকে তোবড়ানো সিগারেট প্যাকেট বের করল। সিগারেট জ্বেলে সে হাত বাড়িয়ে অ্যাশট্রেটা নিল। সোফায় নিজের পাশে রেখে বলল, মেয়েরা যদি কাউকে ভালবেসে ফেলে, শিগগির বয়স ডিঙিয়ে তার কাছে পৌঁছে যেতে পারে। পাঁচ বছর আগে মফস্বলের একটা স্কুলে মাস্টারি করতে গিয়ে মহুয়ার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। বিয়েটা তার ঠিক মাসখানেকের মধ্যেই। আসলে মহুয়ার ওই একটা স্বভাব ছিল—হঠকারিতার। ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ—যে কাজই হোক, করে বসত। একটুও ভাবনা-চিন্তা করত না। আমার খালি ভয় হত, ওর স্বভাবটাই ওর সর্বনাশ করবে। করেছিল। করলও।

সুকোমল টের পাচ্ছিল, তার শরীরের ওজন বেড়ে গেছে। বারবার তার মাথার ভেতর একটা ঠাণ্ডা হিম ঢিল গড়িয়ে পড়ছিল। সে একটু নড়ে উঠল এবার।.....কিন্তু আপনি এসব কথা আমাকে শোনাতে এসেছেন কেন?

আপনার জানা দরকার বলে।

আমি তো মনে করি না।

আমি মনে করি।

কী আশ্চর্য! আপনি কী গায়ের জোরে আমাকে শোনাতে চান? আপনি আসুন জ্ঞানেশবাবু! আমার হাতে অনেক কাজ। আপনার লাইফহিস্ট্রি শোনার সময় আমার নেই।

সুকোমল উঠে দাঁড়াল। কিন্তু জ্ঞানেশ মিত্র নির্বিকার মুখে বসে রইল। সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে তার কুতকুতে চোখ দুটো জুলজুল করছে। অথচ তাকে দেখাচ্ছে মৃত মানুষের মতো—শুঁটকো, টানটান আর রুক্ষ।

সুকোমল কঠোর স্বরে বলল, আপনি কী চান আমি পুলিশ ডাকি?

জ্ঞানেশ মিত্র খ্যাঁক করে হাসল।....বেশ তো! ডাকুন না। হেস্তনেস্তটা আরও ভাল করে হবে।

তার মানে আপনি সত্যি সত্যি ব্ল্যাকমেল করতেই এসেছেন। সুকোমল শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে বলল, বলুন, কত দিতে হবে?

জ্ঞানেশ মিত্র হিস হিস করে বলল, লজ্জা করে না সুকোমলবাবু!

আপনারই লজ্জা করা উচিত, স্ত্রীর কেলেঙ্কারি নিজের মুখে গাইতে এসেছেন।

আস্তে সুকোমলবাবু! আপনার ফ্ল্যাটে কেউ নেই, কিন্তু দেয়ালের কান আছে।

সুকোমল মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করে আবার বসল। ভারী গলায় বলল, আপনি কী চান জ্ঞানেশবাবু?

একটা আলোচনা।

কিসের আলোচনা?

মহুয়া সম্পর্কে।

কী লাভ তাতে?

মহুয়া হঠাৎ কেন আত্মহত্যা করল, আমাদের দু'জনেরই সেটা জানার দরকার।

আপনার দরকার থাকতে পারে, আমার নেই।

আছে। কারণ মহুয়ার মরার পেছনে আপনারও হাত থাকতে পারে।

মহুয়ার সঙ্গে আমার গত এক সপ্তাহ দেখা হয়নি। সুকোমল বিব্রতভাবে বলল। তাকে আমি এমন কিছু বলিনি বা তার সঙ্গে এমন কোন ব্যবহার করিনি যে সেজন্য ও মনে আঘাত পেয়ে স্যুইসাইড করতে যাবে।

আমিও তো ঠিক একই কথা বলব, সুকোমলবাবু।

কিন্তু সে আপনার স্ত্রী ছিল!

আপনার প্রেমিকা ছিল, অথবা আপনি তার প্রেমিক ছিলেন। একই কথা।

সুকোমল জোর দিয়ে বলল, মোটেও একই কথা নয়।

জ্ঞানেশ মিত্র পুড়ে যাওয়া সিগারেটের আগুনে আবার সিগারেট ধরাচ্ছিল। হাত তুলে বলল, ওয়েট, ওয়েট। আপনি সমাজ আইন এসবের কথা তুলবেন তো? ওগুলো নিছক বানানো ব্যাপার সুকোমলবাবু। ওগুলো সবই বাইরের। আপনি ভেতরের দিক থেকে দেখুন কী ঘটেছে। মহুয়া নামে একটি মেয়ে আর দুজন পুরুষ। জ্ঞানেশ মিত্র আর সুকোমল বসুরায়। দু'জনের সঙ্গেই অত্যন্ত প্রাইভেট সম্পর্ক ছিল—যা আর কারুর সঙ্গে ছিল না। বলতে দ্বিধা দেখি না যে সেই সম্পর্কটা ছিল দৈহিকও।

সুকোমল বিরক্তমুখে বলল, ধুর মশাই! সে তো একটা বেশ্যার সঙ্গেও......

শাট আপ। মহুয়া বেশ্যা ছিল না।

দেখুন, আমাকে ধমকাবেন না। আমি যথেষ্ট সহ্য করেছি। আর নয়। আপনি উঠবেন কি না বলুন?

উঁহু।

উঠবেন না?

না।

সুকোমল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। এই লোকটাকে সে হয়তো গায়ের জোরে বের করে দিতে পারবে। কিন্তু এ যদি চ্যাঁচামেচি করে, সব ফ্ল্যাট থেকে লোকেরা জুটে যাওয়ার ভয় আছে। ওর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সে উদ্বিগ্ন হচ্ছিল। নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক সন্দেহ নেই। গোঁয়ার ও জেদি, তা বোঝাই গেছে। তাছাড়া ওর চেহারায় মরিয়াভাব

খুব সুস্পষ্ট। যারা একটা চরম বোঝাপড়া করতে চায়, তারাই এভাবে আসে। সুকোমল এবার ভয় পেয়ে গেল।

জ্ঞানেশ মিত্র ঠোঁটের কোণায় বাঁকা হেসে বলল, ভাবতে অবাক লাগছে সুকোমলবাবু। মহুয়া একসময় আমাকে বলেছিল, 'যদি আমার কোন প্রেমিক থাকে, জানবে সে দায়িত্ববান প্রেমিক। ঠিক তোমারই মতো।' আমি ওকে বলতে পারতাম, 'প্রেমিক তো আছেই। তাকে আমি চিনিও।' কিন্তু বলতে পারিনি। কোনদিন প্রচণ্ড রাগের মুখেও ওই কথাটা বলতে পারিনি ওকে। আসলে ওকে দেখে আমার মায়া হত। ওকে আঘাত দিতে পারতাম না। কারণ ওর জীবনটা ছিল ট্র্যাজিক। আশা করি, আপনি সেসব কথা জানেন। আমারই মতো প্রাণপণ লড়াই করে ও সদ্য মাথা তুলতে পেরেছিল। বাবা-মা আত্মীয়স্বজনহীন একটা একলা মেয়ে। যাই হোক, আপনি মোটেও দায়িত্ববান প্রেমিক নন দেখতে পাচ্ছি। মহুয়া আপনাকে চিনতে পারেনি।

সুকোমল মুখ নামিয়ে বলল, আপনি তো দায়িত্ববান স্বামী! তবু মহুয়া কেন....

এক মিনিট! মহুয়া সেকথা স্বীকার করত, জানেন কী?

জানি। সুকোমল গলার ভেতর বলল।

বলেছিল আপনাকে?

হুঁ।

জোরে শ্বাস ছেড়ে জানেশ মিত্র হেঁট হয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজে বলল, কী বলছিলেন, এবার বলুন।

তাহলে মহুয়া স্যুইসাইড করল কেন?

ঠিক একটাই আমার জানার ইচ্ছে, সুকোমলবাবু।

আমি কিছু জানি না।

জ্ঞানেশ মিত্র আবার সোফায় পিঠ চেপে মুখ উঁচু করে চোখ বুজল। .... ও মাসে আপনারা গোপালপুর-অন-সি গিয়েছিলেন। ছিলেন স্টিফেন্স লজে। সায়েবের বাতিক, ব্যাচেলার অ্যালাউ করে না। স্যুটের ভেতর বাইবেল রাখে এক কপি করে। ড্রিংক করাও বারণ। তবে বাড়িটা অপূর্ব। সামনে সমুদ্র, বাঁদিকে ব্যাকওয়াটার। অসম্ভব নির্জন সি বিচ। জলের ভেতর বড় বড় কালো পাথর। মহুয়া জেদ করছিল পাথরে গিয়ে বসবে। আপনি তাকে টানাটানি করছিলেন। নির্জন বিচে সিনেমার দৃশ্য!

সুকোমল তাকাল। তাহলে আপনি সত্যই গিয়েছিলেন ফলো করে?

আমি দায়িত্ববান স্বামী। আমার স্ত্রী কোথায় কী বিপদে পড়ছে কি না লক্ষ্য রাখা আমার কর্তব্য।

মহুয়া তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছিল!

করেছিল বুঝি?

লাইট হাউসের ওদিকে বালিয়াড়িতে তাহলে ঠিকই আপনাকে দেখেছিল!

জ্ঞানেশ মিত্র কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট বাইনোকুলার বের করল। ....দায়িত্ববোধের খাতিরেই জিনিসটা আমাকে ফুটপাত থেকে দুশো টাকায় কিনতে

হয়েছিল। আপনি অর্ধেক দামে রাখতে পারেন। চিরদিন তো আর ব্যাচেলার থাকবেন না। থাকছেনও না। কবে যেন আপনার বিয়ে......?

আপনি বড্ড বেশি অপমান করছেন আমাকে। সবাই আপনার মতো বউকে ফলো করে বেড়ায় না।

কারণ সবাই দায়িত্ববান স্বামী নয়।

মহুয়া বলত আপনি নাকি ভীষণ উদার। তাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেন। মহুয়া আপনাকে চিনতে পারেনি!

মহুয়া বলত এসব কথা?

সুকোমল চুপ করে থাকল। তার নার্ভে চাপ পড়ছিল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। তার দিকে একটু তাকিয়ে থাকার পর জ্ঞানেশ মিত্র সেটা লক্ষ্য করল। সে মুখ তুলে দেখল ফ্যানটা ঘুরছে না। রাতভর বৃষ্টির পর আবহাওয়া মোটামুটি স্নিগ্ধ। এখনও মেঘ সরে যায়নি। নিচের রাস্তায় জল ভেঙে চলাচলের শব্দ ভেসে আসছে। সে দেয়ালের দিকে ঘুরে ফ্যানের সুইচ খুঁজল। তারপর রেগুলেটার ফুল করে দিয়ে সুইচটা টিপে দিল। বলল, আপনি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। তবু উপায় নেই। সিচুয়েশান ফেস তো করতেই হবে। তার আগে প্লিজ একগ্লাস ঠাণ্ডা চল দিন আমাকে।

সুকোমল আড়ষ্টভাবে উঠল। এটা ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং ঘর। ফ্রিজ খুলে জলের বোতল বের করল। কাচের গ্লাসে ভর্তি করে এনে নিচু টেবিলে রাখল।

জ্ঞানেশ মিত্র জলটা একটানে খেল না। চুমুকে চুমুকে খাচ্ছিল। খানিকটা খেয়ে গ্লাসটা ধরে রেখে একটু হাসল।...আপনার ফ্রিজট্রিজ আছে। ফ্ল্যাটটাও অপূর্ব সাজানো। কত সুন্দর সব বই। ফ্ল্যাটটা নিশ্চয় কিনেছেন?

সুকোমল অস্পষ্টভাবে হুঁ বলল।

আমি সামান্য স্কুলটিচার। তাহলে মহুয়ার টাকাটা যোগ করলে মোটামুটি ভদ্র একটা ফ্ল্যাটে হয়তো থাকা যেতো—ফ্রিজট্রিজ না কেনা হোক। কিন্তু ওর যা খরচের বহর ছিল। না—নিজে তত সেজেগুজে থাকত না, সে তো দেখেছেন। কিসে এলোমেলো উড়িয়ে দিত। দু'সপ্তা পরেই বলত, 'তোমার কাছে টাকা আছে?' আসলে ওর মধ্যে উড়নচণ্ডী স্বভাব—নিজের যা কিছু দায়িত্বহীনভাবে বিলিয়ে দিতে একটুও ভাবেনি। আপনার কী মনে হয় না জীবনের ওপর, পৃথিবীর ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা—অবচেতন ঘৃণা আর দুঃখ থাকলে তবেই মানুষ এমন করতে পারে? বলুন তাই কী না?

আমি জানি না।

ঠাণ্ডা জলে চুমুক দিয়ে জ্ঞানেশ মিত্র গলা নামিয়ে বলল, নিজেকে নিয়ে ও ছিনিমিনি খেলতে শুরু করেছিল—বিয়ের জাস্ট মাস ছয়েক পর থেকে। হঠাৎ একটা পরিবর্তন। তখন আমরা সেই মফস্বলেই আছি। খানিকটা একঘেয়ে লাগে। তাই মাঝে মাঝে কলকাতা চলে আসি। কলকাতায় স্কুলে চেষ্টাচরিত্র করি। তো ভাবলাম, গ্রামে থাকাটা ওর অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই এত অস্থিরতা। পরে বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। মহুয়া প্রকৃতি-ট্রকৃতি ভালবাসত—সেকথা আপনিও জানেন। কিন্তু ব্যাপারটা অন্য। রেগুলার পিল খেত ও। ক্রমশ রিঅ্যাকশন হচ্ছিল। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। জোর করে ওটা বন্ধ করলাম। তাছাড়া একটা কাচ্চাবাচ্চাও হওয়া দরকার মনে হচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি হয়তো জানেন না সুকোমলবাবু যেই কনসিভ করল, তার একমাস পরেই

কলকাতা এসে—আমাকে না জানিয়ে—আর আজকাল তো ব্যাপারটা মেয়েদের কাছে ডালভাত। জাস্ট কয়েকটা দিনেই ফিট হয়ে যায়। তো আমি যখন জানতে পারলাম, ওকে চার্জ করলাম। সোজা বলে দিল, 'আমি মা হবো না—তুমি যা খুশি ভাবতে পারো!' এখন আমি জানি, মহুয়া একই সঙ্গে একটা অপারেশন করিয়ে নিয়েছিল। আশা করি, ওর নাভির নিচে কাটা দাগটা আপনি.....

থামুন! সুকোমল প্রায় গর্জন করে উঠল। নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত।

ক্রুড রিয়্যালিটি, সুকোমলবাবু।....নির্বিকার জ্ঞানেশ মিত্র ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল। ....মর্গে মহুয়ার শরীরটা এখন কাটাছেঁড়া চলছে। বিকেলের আগে বডি ডেলিভারি দেবে না সম্ভবত। আজকাল স্যুইসাইড বড্ড বেড়ে গেছে। আর ওই বধূহত্যা। ভাগ্যিস মহুয়া স্লিপিং ক্যাপসুল খেয়েছিল। তাছাড়া একটুকরো চিঠিও লিখে গেছে। সেকথায় পরে আসছি। তবে আমরা যা করতে চাইছি মহুয়াকে নিয়ে, সেও একটা শবব্যবচ্ছেদ। ওর লাইফটা কাটাছেঁড়া করা। হুঁ, আসুন। কী যেন বলছিলাম.....অপারেশন! নাভির নিচে একটা কাটা দাগ। যে কোন নিঃসন্তান পুরুষের পক্ষে এটা প্রচণ্ড অপমানজনক। ভাবলাম, ওকে নিষ্ঠুরভাবে চাবকাই। আমার হাত উঠল না। আপনি তো দেখেছেন, যত তেজী হোক, ওর মুখে অসহায় নিঃসঙ্গ মেয়ের একটা ছাপ ছিল। খানিকটা অবুঝ বালিকার আদল। বিশেষ করে ওর চোখ দুটো....

দরজার ঘণ্টা বাজল। সুকোমল ইতস্তত করছিল। হয়তো পুঁটির মা এল এতক্ষণে। ওদের বস্তিতে অগাধ জল জমার কথা। আসেনি এটাই রক্ষা। এলেও সমস্যা। কিন্তু তার চেয়েও সমস্যা হত মনু থাকলে। ভাগ্যিস মনু ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

জ্ঞানেশ মিত্র বলল, যান। দেখুন কে এল।

সুকোমল আড়ষ্টভাবে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখল সত্যি পুঁটুর মা। বুড়ি বলল, সমুদ্দুর! সব ভেসে গেছে। কী কষ্ট করে যে—

সুকোমল বলল, কষ্ট করার কী দরকার ছিল? বাড়ি যাও তুমি।

বুড়ি খচে গেল। ঠোঁট বাঁকা করে বলল, খামোকা বকছেন কেন বাবু? কী চলেছে অবস্থাটা, ভাবুন একবার। এক কোমর জল ভেঙে ভেঙে এলাম, আর বলছেন বাড়ি যাও। বেশ। যাচ্ছি। এক দোর বন্ধ তো শত দোর খোলা। যাচ্ছি।

হ্যাঁ, যাও।

বুড়ি গজগজ করতে করতে চলে গেল। সুকোমল দরজা বন্ধ করে এসে বলল, আপনি আর কতক্ষণ থাকবেন ভাবছেন?

যতক্ষণ না একটা হেস্তনেস্ত হয়!

সুকোমল খাপ্পা হয়ে বলল, কী হেস্তনেস্ত? আপনার স্ত্রী স্যুইসাইড করেছে। সেজন্য আমার কী করার আছে? আপনি চলে যান। অকারণ এসব নোংরা ব্যাপারে আমাকে জড়াবেন না। আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। আর ভদ্রতা রাখা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।

গ্রাহ্যই করল না জ্ঞানেশ মিত্র। তেমন হেলান দিয়ে চোখ বুজে থেকে বলল, তিন বছর আগে আপনিও ছিলেন আমার মতো একজন স্কুলটিচার। বহরমপুরে বি টি পড়তে গিয়েছিলেন। মহুয়া তখন রিফ্রেশার কোর্স করতে গেছে। আপনার সঙ্গে আলাপ হল। আপনার প্রেমে পড়ে গেল। এমনিতেই পুরুষচরিত্র পরকীয়া প্রেমের অনুরাগী। আর মহুয়া

পরস্ত্রী হিসেবে ছিল অসাধারণ। আমি একদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গেটা থেকে লক্ষ্য করলাম, আপনারা দু'জনে লনের ওপাশে বসে গল্প করছেন। তখন এই বাইনোকুলারটা ছিল না। কিন্তু চোখ ছিল। বুঝতে পারছিলাম দু'জনের ওই কথা বলার ভঙ্গি, বসার ভঙ্গি—সবকিছুর মধ্যে একটা গাঢ় আন্তরিকতা আছে। সেই তো শুরু। তাই না সুকোমলবাবু?

আপনি যদি এতসব আগাগোড়া জানেন, এতদিন বাধা দেননি কেন আপনার স্ত্রীকে?

দেবার কথা কী ভাবিনি? কোন রক্তমাংসের মানুষ এসব সহ্য করতে পারে? কিন্তু আমার ভয় হত, ওকে তাহলে হারাব। আপনি একে ক্লীবতা ভাবতে পারেন। কিন্তু ঠিক তা নয়। এটা একটা স্যাক্রিফাইস—এটা একটা নিজের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই। জানি না আপনাকে বোঝাতে পারলাম কিনা। আসলে আমি চাইছিলাম, ও যা কিছু করুক, আমার হয়ে থাক। আমার ধরাছোঁয়ার মধ্যে অন্তত থাক।

বুঝেছি, সম্পত্তি ভেবেছিলেন স্ত্রীকে! সুকোমল ব্যঙ্গ করে বলল।

না। এ তা নয়। এ ঠিক পোজেশানের মনোভাব নয়, সুকোমলবাবু। মায়ামমতা, করুণা, দায়িত্ববোধ অনেককিছু এর মধ্যে ছিল। ওর সর্বনাশ ঘটুক এ আমি চাইনি—ওর নিজের দিক থেকে বা অন্যের দিক থেকে। আর এই দোটানার মধ্যে পড়ে আমি খানিকটা অসহায়ও বোধ করেছি বৈকি। না পারি গিলতে, না পারি ফেলতে।

সুকোমল বাঁকা হাসল.....তাহলে আর নিজেকে দায়িত্ববান স্বামী বলে বড়াই করছেন কেন? দায়িত্ববান স্বামীরা কী স্ত্রীকে প্রেম করতে দিতে পারে?

পারে—যদি দেখে তার স্ত্রীর সেই প্রেমিকটিও দায়িত্ববান। আমি আপনাকে তাই ভেবেছিলাম। অথচ আপনি তা নন। আপনি ওকে ঠকিয়েছেন তাই নয়, ওকে বাঁচিয়ে রাখতেও পারেননি। ওকে অতল খাদের দিকেই ঠেলে দিয়েছিলেন।

কীভাবে?

প্রথম কথা, আপনি ওকে—উইদিন কোটেশান বলছি—'সম্মানজনক' চাকরির লোভ দেখিয়েছিলেন।

সেটা অন্যায় নয়। তবে চেষ্টা করব বলেছিলাম এই পর্যন্তই।

কিন্তু মহুয়া আপনাকে এত বিশ্বাস করত যে তারপর সে তার স্কুলের দায়িত্বে ভীষণ অবহেলা করতে শুরু করল। যখন-তখন কামাই, ক্লাসে ফাঁকি, পরীক্ষার খাতায় খামখেয়ালি করে নম্বর দেওয়া কলিগদের সঙ্গে ঝগড়া—কত আর বলব! শেষ পর্যন্ত একদিন ঝোঁকের মুখে রিজাইন দিয়ে এসে বলল, 'চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে এলাম।' আমি কিন্তু মেনে নিয়েছিলাম। কারণ তখনও জানতাম না যে আপনিই এর পেছনে ছিলেন। আপনারই প্ররোচনায় মহুয়া চাকরি ছাড়ার রিস্ক নিয়েছিল।

আমি ওকে চাকরি ছাড়তে বলিনি।

ওকে লাভ দেখিয়েছিলেন। আশা দিয়েছিলেন। তার রিটন এভিডেন্স আমার হাতে আছে।

আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। আপনি যা খুশি করুন।

জ্ঞানেশ মিত্র তৃতীয় সিগারেট ধরিয়ে চোখ জল।....আপনি লিখেছিলেন, 'যদি কখনও মনে করো যে ওখানে অসহ্য লাগছে, তখনই চলে এস। আমার ঘরের দরজা তোমার

জন্যে সবসময় খোলা। পৃথিবীতে কোথাও আশ্রয় না জুটলেও আমার কাছে জুটবে।' লেখেননি?

আপনার দেখছি অসাধারণ মুখস্থ করার শক্তি।

কাল রাত্রে আপনার চিঠিগুলো পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়ে গেছে, সুকোমলবাবু! আপনি ওর স্কুলের ঠিকানায় বড্ড বেশি চিঠি লিখতেন। অতবেশি লিখতেন বলেই আপনাকে দায়িত্ববান—খাঁটি প্রেমিক মানুষ ভেবেছিলাম। নিছক লাম্পট্য মানুষকে এতবেশি কথা বলতে দেয় না। সত্যি বলতে কী, আপনার ওপর আমার সিম্প্যাথির এটাই মূল কারণ।

স্ত্রীর ব্যক্তিগত চিঠি লুকিয়ে পড়তেন—লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল আপনার!

কেন লজ্জা? আপনার চিঠির কথাগুলো আমার নিজেরই কথা আসলে। আমি ঠিক যে কথাগুলো ওকে বলতে চাইতাম, পারতাম না, তারই হুবহু প্রতিধ্বনি! আর সুকোমলবাবু, কাল রাতে যখন আবার চিঠিগুলো নিয়ে বসলাম, বিশ্বাস করুন, আমি নিজেকে গুলিয়ে ফেললাম আপনার সঙ্গে। আমি না আপনি? আপনি না আমি? আর তখন বিছানার ওপর মহুয়া মরে পড়ে আছে। ঝমঝম করে বৃষ্টি ঝরছে। রাস্তায় জল জমতে জমতে সেই জল এসে ঢুকেছে ঘরের মেঝেয়। জলে পা ডুবিয়ে বসে আপনার চিঠি পড়ছি। করবটা কী? কাকে ডাকব ওই দুর্যোগের মধ্যে? কাকে কান্নাকাটি করে বলব আমার স্ত্রী স্যুইসাইড করেছে?

আপনি অদ্ভুত!

মহুয়া তাই বলতে মাঝে মাঝে। এই তো কিছুদিন আগেও আমার পাশে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার বুকের ওপর মাথা তুলে বলল, 'তুমি এমন কেন গো?' বললাম, 'কেমন আমি?' ও বলল কী জানেন সুকোমলবাবু? বলল, 'কেন তুমি আমাকে শাসন করো না? কেন আমাকে আটকে রাখো না? আমার যদি কিছু ঘটে যায়?' বললাম, 'কী ঘটবে আর? কিছু ঘটবার সুযোগ তো রাখোনি!' ও একটু সরে গেল। স্বভাবত আমি ওর সেই অপারেশনটার দিকেই ইঙ্গিত করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারি, ও মৃত্যু ব্যাপারটাকে ঘটনা বলতে চাইছিল। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'তুমি চিরদিন বড় অদ্ভুত মানুষ।' হ্যাঁ সুকোমলবাবু, আমি হয়তো তাই।

আর কতক্ষণ প্রলাপ বকবেন আপনি?

জ্ঞানেশ মিত্র চোখ খুলল।....প্রলাপ? এ তো আমার-আপনার দু'জনেরই জীবন-মরণের প্রশ্ন।

আপনার হতে পারে। আমার নয়।

সুকোমলবাবু! জ্ঞানেশ মিত্র একটু ঝুঁকে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে একটু হাসল। মহুয়ার সঙ্গে আমার দু'জনেই একইভাবে জড়িয়ে গেছি। ধর্মত এবং আইনত।

সুকোমল ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে? কী বলতে চাইছেন আপনি?

মহুয়া গতকাল কোন একসময়ে—তার মানে বৃষ্টির আগেই ঠিক করেছিল, মরবে। চিঠিটা লিখে বালিশের তলায় রেখেছিল। আমার স্কুল সেই বেহালায়। ভেবে দেখুন কাল কী অবস্থা সন্ধ্যা থেকে। সাতটা অব্দি অপেক্ষা করে তখন মরিয়া হয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। কখনও বাস, কখনও রিকশো এই করে তিলজলা পৌঁছতে রাত সাড়ে ন'টা হয়ে গেল। রাস্তায় জল জমেছিল। কিন্তু তখনও ঘরে ঢোকেনি। দরজা ভেজানো ছিল। ঢুকে দেখি মহুয়া কাত হয়ে শুয়ে আছে। দরজা খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে বলে একটু বকাবকি

করে ওকে ওঠানোর চেষ্টা করলাম। সাড়া দিল না। তখনও জানি না ও—যাই হোক, ওকে বিরক্ত না করে জামাকাপড় বদলে কিচেনে গেলাম। দেখলাম খাবার রেডি করা আছে। খেয়ে আলো নিভিয়ে ঘরের কোণায় টেবিলবাতিটা জ্বেলে জানলার ধারে বসে সিগারেট টানছি আর বৃষ্টি দেখছি। আকাশভাঙা বৃষ্টি। উদ্বিগ্নও হচ্ছি, এবার তো ঘরে জল ঢুকবে। সিগারেট শেষ করে দরজার তলায় ওর একটা ছেঁড়া শাড়ি গুঁজে....

আঃ! জড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কেন বললেন?

জ্ঞানেশ মিত্র গলার ভেতর বলল, বলছি। কাল বৃষ্টিটা কিন্তু মাথা খারাপ করে দেওয়া বৃষ্টি। হঠাৎ টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মহুয়ার শরীরের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। এতদিন ওর শরীরের সেই আশ্চর্য স্বাদ আর পাচ্ছি না। ও আমাকে বঞ্চিত রাখছে। আমি জানোয়ার হয়ে গেলাম, সুকোমলবাবু।

জ্ঞানেশ মিত্রের গলা ভেঙে গেছে দেখে সুকোমল তাকাল। চোখের কোণায় জলের ফোঁটা। তাকিয়েই মুখ নামাল সুকোমল।

জ্ঞানেশ মিত্র গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, আমি ওকে জোর দেখাতে গিয়েই থমকে গেলাম। ওর শরীর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা হিম। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ।....

কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগারেট টানার পর চেহারায় আবার আগের মতো রুক্ষতা ফিরিয়ে এনে জ্ঞানেশ মিত্র বলল, মহুয়ার স্যুইসাইডাল নোটে আমাদের দু'জনকেই দায়ী করে গেছে, সুকোমলবাবু। আমাকে এবং আপনাকে।

সুকোমল চমকে উঠেছিল। বলল, আশ্চর্য! আমি কী করেছি?

আপনি করেছেন প্রতারণা আর আমি করেছি মানসিক পীড়ন।

মহুয়া তাই লিখেছে?

হ্যাঁ! জ্ঞানেশ মিত্র নোংরা রুমাল বের করে ফোঁস ফোঁস করে নাক মুছল।

সুকোমল আস্তে বলল, লিখলেই তো হল না। প্রমাণ কোথায়?

প্রমাণ আপনার একগাদা চিঠি।

সুকোমলের মুখ সাদা হয়ে গেল। বলল, বডি তো মর্গে, বললেন।

হ্যাঁ। তবে আত্মহত্যার চিঠিটা আমি পুলিশকে এখনও দিইনি। দিলে প্রচলিত আইনে আমরা এতক্ষণে দু'জনেই অ্যারেস্ট হয়ে যেতাম।

সুকোমল ভারী নিশ্বাস ফেলে বলল, কী করতে চান তাহলে?

আপনিই বলুন সুকোমলবাবু, কী করা উচিত?

বেশ। পুলিশকে দিন।

এবং আপনার চিঠিগুলোও?

সুকোমল তাকাল। তার হাত কাঁপছিল।.....তাহলে তো আপনি সেই ব্ল্যাকমেল করতেই এসেছেন।

না। আমি জানতে এসেছি কেন মহুয়া হঠাৎ আত্মহত্যা করে ফেলল? সুকোমলবাবু, আত্মহত্যার চিঠিতে আত্মহত্যার মূল কারণ লেখা থাকে না।

সুকোমল ক্ষুব্ধভাবে বলল, আমি কেমন করে জানব সেকথা? আগের রবিবার বিকেলে মহুয়া সেই শেষবার এসেছিল। কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে চলে গেল। এমন কোন কথা বলেনি, যাতে মনে হবে সে স্যুইসাইড করবে। হ্যাঁ—ফ্র্যাংকলি বলছি শুনুন। আমি ওকে বললাম, 'কি ডিসিশন নিলে?' বলল, 'নাথিং! বেশ তো আছি। এমনি ফ্রেন্ডলি টার্মে থাকব।' আমি ওকে বললাম, 'এটা কিন্তু ডেঞ্জারাস গেম থেকে যাচ্ছে। তোমার স্বামী কতদিন চুপ করে থাকবেন, বলা কঠিন। মহুয়া—'

আপনি তাই বললেন?

হ্যাঁ। মহুয়া বলল, 'ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে।'

মহুয়া তাই বলল? আবার ফোঁস ফোঁস রুমালে নাক মুছল জ্ঞানেশ মিত্র।

হ্যাঁ। গতবছর এমনি জুলাই মাসে আমরা দীঘা গিয়েছিলাম। ঝাউবনে ও একটা অদ্ভুত কথা—

বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি বলে আপনার সঙ্গে যেত, জানতাম।

এবং ফলো করতেন!

আপনি প্লিজ দীঘার কথাটা বলুন!

মহুয়া ঝাউবনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বলল, 'জানো? আমার স্বামীর সঙ্গে আমার বাবার স্বভাবচরিত্রের আশ্চর্য মিল!' আমি বুঝতে পারতাম, আপনার ওপর ওর খুব শ্রদ্ধাও ছিল।

জ্ঞানেশ মিত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, ছিল। তা ছিল।

কিন্তু আমার ধারণা, গত মাসে গোপালপুর-অন-সি তে আপনাকে দেখতে পাওয়ার পর থেকে আপনার সম্পর্কে ওর শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আপনাকে না দেখতে পেলে স্টিফেন্স লজে আমরা আরও দিন তিনেক থাকতাম।

বোকা মেয়ে! জেদি আর বেপরোয়া! আমার খালি ভয় হতো, কার পাল্লায় পড়ে প্রাণটা না খুইয়ে বসে। জ্ঞানেশ মিত্র ভাঙা গলায় বলল।....ওইভাবে বেড়াতে গিয়ে কতো মেয়ে মার্ডার হয় কিনা বলুন? না না! আপনি কেন মার্ডার করবেন? কিন্তু আজকাল সবখানেই দুর্বৃত্ত মস্তান লোকেরা ঘুরছে। আমি কেমন করে নিশ্চিন্ত থাকি বলুন? আমার মন মানত না সুকোমলবাবু!

সুকোমল ঘড়ি দেখে বলল, সাড়ে ন'টা বাজে! অফিসের সময় হয়ে গেছে।

তাহলে আপনি জানেন না কেন মহুয়া স্যুইসাইড করল?

বিশ্বাস করুন, আমি জানি না।

কিন্তু—জ্ঞানেশ মিত্র সোজা হয়ে বসল। কিন্তু খবরটা যখন আপনাকে দিলাম, আপনি একটুও চমকে উঠলেন না। আঘাত পেলেন না। শুধু বললেন, ও! অথচ আপনি মহুয়ার প্রেমিক ছিলেন। তার সুন্দর শরীরটাকে আপনি যথেচ্ছ—আমি বলতে চাইছি, আদর করেছেন। আপনি কি লেখেননি 'তোমার নগ্ন সুন্দর দেহের সবখানে আমার চুমুর দাগ ফুটে আছে খুঁজে দেখো?' আপনার চিঠি বড় কবিত্বপূর্ণ সুকোমলবাবু! আপনিই তো লিখেছিলেন, 'তোমার শ্বাসপ্রশ্বাসের গন্ধ আমাকে হঠাৎ বিপন্ন করে!' সেই শ্বাসপ্রশ্বাস চিরদিনের জন্য থেকে গেছে মহুয়ার। তবু আপনি এতটুকু বিচলিত নন। সুকোমলবাবু, আমি বুঝতে পেরেছি মহুয়া কেন আত্মহত্যা করেছে।

সুকোমল বলতে যাচ্ছিল, কেন, কিন্তু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জ্ঞানেশ মিত্র কাঁধের ব্যাগ থেকে একগাদা নীল কাগজ বের করে হিংস্র ভঙ্গিতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে সুকোমলের ওপর ছুঁড়তে থাকল। সুকোমল মুখ নামিয়ে মুহুর্মুহু ওই আঘাত অথবা প্রত্যাঘাত, দলাপাকানো ছেঁড়া চিঠি অথবা রুক্ষ শুকনো ঘৃণার পুঞ্জ সহ্য করল।

একটু পরে লোকটা বেরিয়ে গেলে সে উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। তারপর ফিরে এল সোফার কাছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এত চিঠি লিখেছিল মহুয়াকে? এ কী অদ্ভুত ছেলেমানুষি তার! সত্যিই কী মহুয়া এত বেশি চিঠি পাওয়ার যোগ্য ছিল?

চিঠিগুলোর দিকে তাকাতে তার খারাপ লাগল। তাকালেই পড়া হয়ে যাবে। কেন অতসব উচ্ছ্বাস কলমের ডগা দিয়ে বমি করার মতো বেরিয়ে পড়ত, এ মুহূর্তে সে বুঝতে পারছে না। ছেঁড়া দলাপাকানো কাগজ হিসেবেই ঝটপট কুড়িয়ে সে কিচেনে গেল। কিন্তু কীভাবে নষ্ট করবে ভেবে পেল না। শেষে বেসিনে রেখে ট্যাপ খুলে দিল। ভিজে নেতিয়ে গেলে দলাপাকানো একটা বলের মতো করে আবর্জনার বালতিতে গুঁজে দিল।

আশ্চর্য! মহুয়া চিঠিগুলো রেখে দিয়েছিল! ভাবতে ভাবতে সুকোমল বেডরুমে গিয়ে জানলায় উঁকি দিল। রাস্তায় প্রচুর জল জমেছে। গাড়ি বের করা যাবে না। অফিসে ফোন করে দেবে, শরীর খারাপ। সত্যি, গতরাতের বৃষ্টিটা মাথা খারাপ করে দেওয়া।

তারপরেই সুকোমল বসুরায় একটু চমকে উঠল। মহুয়া স্যুইসাইড করেছে। অবিশ্বাস্য মনে হয়। স্যুইসাইড করেছে মহুয়া—সেই নরম ডিমালো মুখ, কালো টানাটানা চোখ, বালিকার অভিমান ঈষৎ পুরু ঠোঁটে, শ্যামবর্ণ ছিপছিপে মেয়ে, একরাশ কোঁকড়ানো চুল এবং নাভির নিচে একটা ক্ষতচিহ্ন। তার সমস্ত শরীরে সুকোমলের ঠোঁট ঘুরে ঘুরে আদর দিয়েছিল। জ্ঞানেশ মিত্র তাকে কী ভেবে গেল? নিছক লম্পট—নিতান্ত ভুল প্রেমিক? আচ্ছা, মহুয়া যদি হতো সুকোমল বসুরায়ের স্ত্রী এবং জ্ঞানেশ মিত্র তার প্রেমিক? সুকোমল বসুরায়ও তো অমনি ভেঙে পড়ত। মাথা খারাপ হয়ে ছুটে যেত জ্ঞানেশ মিত্রের কছে এবং এতক্ষণ সুকোমল বসুরায় এই ফ্ল্যাটে একা বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদত এবং বারবার থানা ও মর্গে ফোন করত কখন বডি পাওয়া যাবে—আর তার এই নধরকান্তি চেহারা যেত রাতারাতি শুঁটকো রুক্ষ হয়ে, মুখে খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি—কিছু পাকা, কিছু কাঁচা, এবং—

ভীষণ আতঙ্কে জানলার রড আঁকড়ে ধরল সুকোমল বসুরায়। আবার আকাশ কালো করে বৃষ্টি আসছে। মাথা খারাপ করে দেওয়া এই বৃষ্টি আবার কার কী সর্বনাশ নিয়ে আসছে হয়তো।.......

মৃত্যুর ঘোড়া

আমার বয়স যখন ন'বছর, একদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখি ঘরের দরজার কাছে মা দাঁড়িয়ে আছে—মুখটি লাল আর ফুলো ফুলো, চোখ দুটো ভিজে। মা অনবরত ফোঁসফোঁস করে হলুদের ছোপ লাগা আঁচলে নাক মুছছে। বারান্দায়—দরজার পাশেই মোড়ায় বসে আছে একটা লোক। লোকটার পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি, গায়ে ভীষণ ময়লা সাদা হাফশার্ট গোছের, যেটার কাঁধের দিকে কোনও কলার নেই। তার পায়ে কোনও জুতো ছিল না। থ্যাবড়া হলদে আর বাঁকাচোরা পায়ের আঙুলগুলো। ফাটা হাজাধরা বিচ্ছিরি পা দুটো দেখেই আমার সামান্য অভিজ্ঞতা বলে দিল, এই লোকটা নির্ঘাত মাঠেঘাটে বনবাদাড়ে জলকাদায় দিনের পর দিন হেঁটেছে। আঙুলে আঙুলে আঁকড়ানো হাত দুটোও তেমনি বিচ্ছিরি হলদে, ভীষণ পুরু আর খসখসে। প্রচণ্ড বাধা পার হতে হতে যে জিনিসটিকে এগোতে হয়—সম্ভবত সেই জিনিসটিকে চালিয়ে বা ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যে তার হাত দুটোর এ দশা হয়ে থাকবে। কারণ, ওই বয়স থেকেই এক রকমের ক্ষমতা আমার ছিল, যা দিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু লক্ষ্য করতে পারতাম। বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারতাম। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমার এ চেষ্টা সত্যের কাছে পৌঁছে দিত আমায়। এই যে লোকটির হাত পা দেখছিলাম, তার সঙ্গে সহজেই ইতিহাসের ভোলানাথবাবুর হাত-পায়ের তুলনা করা গেছে। চকের হালকা রঙলাগা আঙুল, বেশ লম্বা আর হালকা, ডিমের মত সাদা চেটো—তাতে শিরাগুলো অর্থাৎ কররেখা খুবই স্পষ্ট আর গোলাপি—বিশেষ করে ওঁর হাতের চাপ সময়ে আমায় অনুভব করতেও হয়েছে—যাতে টের পেয়েছি খুবই নরম। ওঁর হাত দুটো এবং সময়ে পা দুটো টেবিলে তুলে দিলেও একই রকম ধারণা করা গেছে। তাছাড়া লাস্ট পিরিয়ডে সেদিন ইতিহাসের ক্লাস ছিল।

বাদামি কোঁচকানো শিরাবহুল দেহ নিয়ে যে লোকটি মোড়ায় বসে রয়েছে, তার চিবুক-গাল সাদা-কালো দাড়িতে ভরা, কেবল গোঁফটা যত্ন করে কামানো। তার মাথায় জালের মত ঝাঁঝরা গোল—কতকটা ওল্টানো বাটির সাইজ, একটা কালো টুপি। পরে ওর সঙ্গে যখন যেতে হচ্ছিল, জেনে নিয়েছিলাম, ওই টুপিটা তালগাছের বাগড়ার নিচে যে জালের মত জটিল শক্ত শিরাগুলো থাকে, তাই দিয়ে সে নিজেই তৈরি করে নিয়েছে। লোকটির আশ্চর্য ক্ষমতায় আমার তাক লেগে গিয়েছিল। যেতে যেতে তারপর আরও যা সব শোনাচ্ছিল, চারপাশের পাড়াগেঁয়ে সেই পৃথিবীর খুঁটিনাটি জিনিসে কত সব রহস্য, কী মজার ব্যাপার রয়ে গেছে—আমি তো ওকে মনে মনে আমার মাস্টারমশাইদের চেয়ে অনেক বড়, অনেক মহৎ, অনেক শক্তিমান বলে ভাবতে শুরু করেছিলাম, প্রতিটি পদক্ষেপে লোকটি জানিয়ে দিচ্ছিল যে, পৃথিবীতে মোটামুটি দু'জাতেরই মানুষ আছে—এক জাতের মানুষ সে নিজে এবং অন্য জাতের মানুষ হচ্ছেন ইতিহাসের ভোলানাথবাবু। আমি কোন জাতের, তা জানতে চাইলে নির্ঘাত সে জবাব দিত, তুমি এখনও খুব ছোট তো—তাই তোমায় মানুষ বলা ঠিক হবে না।

খুব গোলমাল করে ফেললাম কি? আগে অনেকগুলো দিন ভাবতে হয়েছে, ঠিকঠাক পূর্বপরম্পরা গোছানোর চেষ্টা করতে হয়েছে; কিন্তু লিখতে গিয়েই সব আমার বড় মুশকিল, এই গল্পটা লিখবার পূর্বাপর সামঞ্জস্য ও সরলতা আমি হারিয়ে ফেলতে বসেছি।

এর কারণ কিন্তু একটাই। স্মৃতি ভীষণ দুশমন। স্মৃতি বড় ঈর্ষাকাতর। স্মৃতি কলহপ্রিয়। বদমেজাজী খিটখিটে কটুভাষী। তাকে আমি বলব একটা রোগা হাড্ডিসার রোঁয়াওঠা নেড়িকুত্তা—যে আমার কত কিছু নিয়ে আগলে বসে আছে, এশপের গল্পের দি ডগ ইন দি ম্যানজার—নিজেও খাবে না, আমায়ও খেতে দেবে না।

বারান্দায় উঠতে গিয়ে সেদিন আমি ভড়কে গিয়েছিলাম। সচরাচর এই গড়নের বা চেহারার কোনও লোককে এত খাতির পেতে দেখিনি। ওকে দস্তুরমত একটা মোড়া দেওয়া হয়েছে। একটু খুলে বলতে হয়। আমার দাদু মুসলিম সমাজের এক ধর্মগুরু। ইসলাম ধর্মে যদিও বা জাতিবর্ণভেদ নেই, সব মুসলমানই মানুষ হিসেবে সমান, বাদশাহের পাশের আসনে পথের ভিখিরিও বসার অধিকার পায়—অনুশাসনের সঙ্গে প্রথার কিন্তু ফারাক আছে অসামান্য। কালগুণে সব ধর্মের মত ইসলামের একদা হাজার বছর পরে প্রথাকে খুব বড় করে দেখা হচ্ছিল। ফলে অভিজাত নিম্নজাত মানুষরা চিহ্নিত হতে থাকল পৃথক পৃথক চিহ্নে। আমাদের বংশধারা অভিজাত। যার দরুন আমায়ও পাড়াগেঁয়ে সমাজে লোকেরা খুব সম্মান দেখাত। বিশেষত আমার দাদু ধর্মগুরু মৌলানা। আর ব্যাখ্যার দরকার হবে কি? তা হলে তো গল্পটা আর লেখা হয়ে ওঠে না!

…অথচ আমরা ছিলাম, সত্যি বলতে কী, ভীষণ গরিব পরিবার। যতদূর জানতাম, এই গরিব থাকার প্রকৃত কারণ আমার দাদুর আচরণ। কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি তাঁর ছিল। কিন্তু একে যাযাবর চরিত্র (দাদু বলতেন, আমরা এসেছি পারস্যের খোরাসান থেকে), তায় ভীষণ অমিতব্যয়ী এবং আবেগপ্রবণ। তাঁর বাবা উত্তর বাংলায় এক শিষ্যবাড়ি থেকে মারা যান। দাদুর বয়স তখন পনের। ফলে, নিজের বউ নিজেই খুঁজে নিয়েছিলেন তিনি। এই বন্ধ্যা মেয়েটি কী কারণে আত্মহত্যা করেছিল। দাদু তারপর হয়ে উঠলেন আরব্য উপন্যাসের সেই বাদশাহ শাহরিয়ারের মত—যে রাতের পর রাত বিয়ে করে আর প্রতি প্রত্যুষে তাকে হত্যা করে ফেলে—নারীজাতির প্রতি ক্রোধপরবশ হয়ে। না, অতটা সম্ভব ছিল না দাদুর পক্ষে। কারণ, তিনি বাদশাহ নন এবং সেটা ছিল ইংরেজ রাজত্ব। মুসলিম ধর্মমতে একই সঙ্গে চারটে বউ রাখা যায়। দাদু চারটে হিসেবে দুবার, দুটো একবার এবং পরিশেষে মাত্র একজনকেই বিয়ে করেছিলেন। এই শেষ বউটি ছাড়া সকলেই বিদঘুটে রোগে মারা গিয়েছিল। সেকালে সামান্য জ্বরজারিরই ওষুধ ছিল না ভালো, অতি সহজে মানুষ গরম গায়ে শুয়ে পড়ত আর ঠাণ্ডা হয়ে যেত। আমার ঠাকুমা দাদুর শেষ বউ। খুব খুঁটিনাটি লক্ষ্য করার মত ক্ষমতা ছেলে বেলায় না থাকলে আমি তো জানতেই পারতাম না যে, আমার এই ঠাকুমাটি এক নিম্নবংশীয় হিন্দুর মেয়ে—যাকে যুবতী বয়সেই ডাইনি বলে গাঁয়ের লোকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। লোকের অপরাধ আমি খুঁজি না। সে যুগে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির যোগাযোগ যত বেশিই থাক না কেন, তারা প্রকৃতিকে ভীষণ অমঙ্গলের আর রহস্যময় বলে মনে করত। এখন, এই মেয়েটির সঙ্গে নাকি প্রকৃতির যোগাযোগ ছিল একটু ভিন্ন রকমের। সে সাধারণত রাত্রিচারিণী ছিল—গভীর রাত্রে বনেবাদাড়ে তাকে চুপি চুপি হাঁটতে, গাছপালা-পাখি-জন্তুজানোয়ার-পোকামাকড়দের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে লক্ষ্য করা গেছে; কেউ দেখেছে সে মাথায় বাতি নিয়ে অন্ধকারে ফাঁকা মাঠে পিছু হেঁটে অর্থাৎ পিছুতে পিছুতে কোথায় উধাও হয়ে যায়। সে ছিল বিধবা— তাদের জাতে সাঙা বা পুনর্বিবাহের প্রথা ছিল। কিন্তু সে আর পুরুষ যাচেনি। একটা গাইগরু, দুটো ছাগল, কয়েকটা হাঁসমুরগি (মুরগিও সে জাতের মানুষ পুষত) আর উঠানের সবজির মাচা কী দু-চারটে ফলমাকড়ের গাছ নিয়ে ছিল তার সংসার। হ্যাঁ, একটা ডাহুক পাখির বাচ্চা একবার বাঁশবনে কুড়িয়ে পেয়েছিল সে। বড় মায়ায় তাকে পুষেছিল। পাশের গাঁয়ের হাট থেকে খাঁচা কিনে এনেছিল। ডাহুকটা বেশ

বড় হল একদিন। গভীর রাতে নিশ্চয় সে ডাকত—কু...কু..কু...কু!...ওফ, ঠাকুমার পাশে শুয়ে এইসব গল্প শুনতে শুনতে আমি সব স্পষ্ট দেখতে পেতাম, শুনতে পেতাম এবং কেন কে জানে, কু...কু...কু...কু ডাকটা অনুমান করলেই মনে হত, কে নিষুতি রাতে আচমকা এসে আমার বুকের ভিতর আঙুল গলিয়ে কলজেয় খোঁচা দিচ্ছে এবং...না না! যন্ত্রণা নয়, ভীষণ কাতুকুতু পেয়ে হিহি করে বেদম হাসছি। ঠাকুমা বলতেন, তুই হাসছিস খোকা, কেন রে?...এখন বুঝি সে ছিল ঠাকুমার দুঃখের গল্প। কারণ, আমার হাসি দেখে ঠাকুমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু বলতেন, ঘুমো। রাত হয়েছে।

তারপর কী যেন ঘটেছিল। সেই গাঁয়ের কোন বড়বাবু না ছোটবাবুর ছেলের রঙ ছিল দুধের মত সাদা। একটা লাউ বেচতে গিয়ে রহস্যময়ী যুবতীটি আর লোভ সংবরণ পারেনি। উঠোনে ধুলোয় খেলতে বসা খোকাটিকে কোলে তুলে বলেছিল, আহা হা, মানিক সোনা, তোর দিকে কারোর মন নেই রে! তুই কি ধুলোয় খেলবার ধন? তুই থাকবি কিনা বাবুমশায়ের খাটপালঙ্কের শোভা...সন্ধ্যার দিকে সাদা খোকাবাবুটি হঠাৎ নীল হয়ে জুড়িয়ে যেতেই ওদের মনে পড়ল কুসুমের কথা! বাংলা দেশের সেই সময়টা অজ পাড়াগেঁয়ে যা জঘন্য না ছিল! ভাগ্যিস দাদু সেদিন সেখানে মুসলমানপাড়ায় শিষ্যবাড়ি আস্তানা গেড়েছেন। আহত যুবতীটিকে উদ্ধার করবার জন্য ছোটখাটো রকমের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ঘটে গিয়েছিল। মামলা হল দাদুকে মূল আসামী করে—শুধু দাঙ্গার দরুন নয়, এক হিন্দু যুবতীর প্রতি লাম্পট্যের দরুনও বটে এবং আশ্চর্য একটু ভুল নিশ্চয় করা হয়েছিল বাদীপক্ষে—যুবতীটি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বলে দিল,...উফ, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়—যুবতীটি বলল কী জানেন? বলল, ধর্মাবতার মৌলানা আমার ইচ্ছানুসারে আমায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন এবং সাদি করেছেন... আদালতসুদ্ধ তো বটেই, আমার দাদুর চক্ষু নিশ্চয়ই ছানাবড়া হয়ে থাকবে!

এখন বুঝি, এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না ঠাকুমার। তারপর আর কী! নতুন বউ সঙ্গে নিয়ে সদলবলে জাঁকিয়ে বাড়ি ফিরলেন দাদু। কুসুম হল কুলসুম। শূন্য ঘর ভরে উঠল এতদিনে। ঘাসের উঠোনে পড়ল রাঙামাটির লেপন। চাঁপাগাছে চাঁপা ফুটল। শিউলি গাছে শিউলি।

কথায় বলে, হিন্দুদের বাড়ি, মুসলমানের হাঁড়ি। দুটো যেখানে এক হয়, সেখানের ব্যাপারটা কল্পনা করুন। দাদুর নোংরা বাড়িটা রাতারাতি সুন্দর হয়ে উঠল। উঠোনে ফুলফলে গাছ, ঝকঝকে রাঙামাটির লেপন সবখানে। যেখানে খুশি গা গড়ানো যায়। সুচ পড়লেও চোখ এড়ায় না। ঝকঝকে বাসনকোসন, ছিমছাম রান্না, রাতে শুয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ঘুমানো যায়। তবে রান্নার ব্যাপারে—হ্যাঁ ঠাকুমার ট্রেনিংয়ের দরকার ছিল। মাসখানেক থেকে গেলেন দাদুর বোন। ননদ যত্ন করে শেখালেন পোলাও-কোর্মা-কালিয়া-কোপ্তা-কাবাব তৈরি, কারণ দাদুর ভোজনবিলাসের কোনও মাত্রা ছিল না, তাছাড়া শেখালেন আরবি ফারসি কেতাব পড়তে, শেখালেন কোরান পাঠ এবং নমাজ ইত্যাদি অবশ্য পালনীয় ধর্মাচরণ, বোঝালেন হাদিস অর্থাৎ অনুশাসনের সূত্রাবলি! আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল ঠাকুমার! কিছুদিন পরেই, যখন দাদু ঘরে নেই, আকস্মিক জরুরি কোনও ব্যাপারে মামলা অর্থাৎ অনুশাসনের বিধিটা কী জানবার জন্যে লোকে বিবিসায়েবের কাছে মতামত নিতে আসে!

আর একটা কথা ভাবতে অবাক লাগে। দাদুর বয়স তখন বাহান্ন কি পঞ্চান্ন, ঠাকুমার বয়স বড়জোর তেইশ কি পঁচিশ—এই দাম্পত্য প্রেমের রহস্য কী? আমি জানি না, বুঝি না। তাঁরা কি অসুখী ছিলেন পরস্পর? বলা দুঃসাধ্য। ওই ন'বছর বয়স অবধি যতটা

স্মৃতির থাবার ফাঁকে ঠাহর করি, কোনওদিন কোনও দাম্পত্য কলহের প্রসঙ্গ তাতে দেখি না। খুবই বিনীত নম্র আচরণ ছিল তাঁর। শিষ্যবাড়ি সফর শেষে দাদু ফিরলে ঠাকুমা যেভাবে সবার সামনে তাঁর পা-দুটোয় চুমু (অর্থাৎ কদমবুসি) খেতেন—তাতে মনে হত, উনি আগের হিন্দু জীবনের ভাষায় বলতে চান, তুমিই আমার দেবতা।

ঠাকুমা মরে যাবার পর দাদু একরকম বাড়ি আসা ছেড়েই দিয়েছিলেন। পুরো একটি বছর আর তাঁর দেখা নেই। তবে মাঝে মাঝে তাঁর মুরিদ অর্থাৎ শিষ্যবাড়ি থেকে লোক আসত এক কলসি গুড় কিংবা কয়েক সের ছোলা-মুসুরি কী দুটো নারকোল নিয়ে। মা দাদুর ওপর খাপ্পা ছিল—কারণ, দাদুর কোনও আয়ই আমরা আর পাইনি। বাবা দাদুর মত মৌলানা না হয়ে নিজের চেষ্টায় পাস করে স্কুলে পড়েছিলেন। এন্ট্রাস পাস করে তিনি বিদেশে চাকরি করেন। মাসে-মাসে যে টাকা আসে তা দিয়ে আমাদের কোনওরকমে চলে যায়।

সেই এক বছরে অনেকবার দাদু আমায় দেখতে চেয়েছেন—মা পাঠাতে রাজি হননি। আমার খুব ইচ্ছে করত যেতে। বিশেষ করে দাদু চলে যাবার পর মাঝে মাঝে পোলাও-কোর্মা খাবার চমৎকার সময়গুলো আর আসছিল না। দাদুর ঘরের ছাদ থেকে টাঙানো শিকগুলোতে শূন্য এনামেলের হাঁড়ি লক্ষ্য করে রাগে ক্ষোভে ঢিল ছুঁড়তাম। একসময় হাঁড়িগুলো কোনও না কোনও সুখাদ্যে পূর্ণ থেকেছে। দাদু ভীষণ ভোজনবিলাসী ছিলেন কি না!

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে লোকটাকে দেখে আমার খুব খুশি হওয়া উচিত ছিল—কেন না, এতে নিশ্চয় কোনও গুড় নারকোল কিংবা সুন্দর উপহার আশা করব। কিন্তু খুশি হওয়াকে চেপে ধরেছিল বিস্ময়। লোকটি মোড়ায় বসার উপযুক্ত নয়—এবং মা কাঁদছে দরজার আড়ালে! কী ঘটেছে?

আমি এগিয়ে যেতেই মা আমায় দু'হাতে বুকে ধরল। তারপর চাপা স্বরে বলল, খোকা, তোমার দাদু মারা গেছেন।

মারা গেছেন! সত্যি বলতে কী মারা যাওয়া সম্পর্কে তখন এক অদ্ভুত ধারণা আমি পোষণ করি। আমার বরাবরই বিশ্বাস ছিল, যেহেতু আমরা মৌলানা এবং কুলগুরুদের ঘর—আমাদের কারুরই মারা যাওয়ার উপায় নেই। তার মানে, আমরা—আমি, বাবা, দাদু, মা ও ঠাকুমা ছাড়া দুনিয়ার সবাই তো শিষ্য বা মুরিদ মানুষ। ওরা সাধারণ, আমরা অসাধারণ। তা না হলে কেনই বা লোকে আমার মত খুদে লোকটিকেও এত ভক্তিশ্রদ্ধা করে! কাজেই আমরা অবশ্যই বেঁচে থাকব। ঠাকুমাকে মরতে দেখেও এ বিশ্বাস ঘোচেনি। কারণ, ঠাকুমা তো হিন্দু ছিলেন!

মায়ের কথাটা শুনে তাই আমি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলে উঠলাম, যাঃ! কে বলেছে?

মা বলল, ওই লোকটি খবর এনেছে।

অস্ফুট চেঁচিয়ে বললাম, ও মিথ্যাবাদী।

বলার সময় লোকটির দিকে আড়চোখে তাকিয়েছিলাম। দেখি, সে যেন হাসবার চেষ্টা করল—মাথাটা দোলাল—তারপর আপসোসে জিভে চুকচুক শব্দ করল মাত্র।

মা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, চুপ চুপ। বলতে নেই। খোকা, তোমার দাদু সত্যি মারা গেছেন। তোমার বাবার এদিকে কোনও খবর পাচ্ছিনে—মাসের গোড়ায়

মনিঅর্ডার এসেছে—তাতে কুপনে অল্প একটুখানি চিঠি ছিল। কী হল, কিছু বুঝতে পারছিনে—তার ওপর এই বিপদ।...

মাকে চুপ করতে দেখে আমি বললাম, ও লোকটা বসে আছে কেন? চলে যেতে বল না!

মা আমায় টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। পরক্ষণে অবাক হয়ে দু'হাতে আমার মুখটা তুলে ধরে তাকিয়ে রইল। ...তুই কাঁদছিস খোকা? কাঁদিসনে! এ বড় দুঃসময় আমাদের!

হ্যাঁ, আমি দাদুর জন্যে কাঁদছিলাম না। ওই লোকটির প্রতি আমার রাগ হচ্ছিল। কারণ সেই তো খবর এনে মাকে কাঁদিয়েছে, আমায় তোলপাড় করে ফেলেছে। ওর বসে থাকা দেখে মনে হচ্ছে একটুকরো আস্ত কালকুট্টে মেঘ—ফের দড়াম করে ফেটে যাবে, তার বিদ্যুৎ ঝলকাবে, বাজ পড়বে—উত্তাল আলোড়ন ঘটে যাবে এক্ষুনি এই ছোট্ট বাড়িটাতে!

এবার লোকটা আমার উদ্দেশে মুখ খুলল।...আপনার দাদুসাহেব মরার সময় আপনাকে দেখতে চেয়েছিলেন। আর তেনার ইচ্ছে ছিল, যেন আপনি তেনার কবরে এই ভিটের চাট্টি মাটি দিয়ে আসেন।

ন'বছরের ছেলে আমি। আমায় 'আপনি' বলাটায় অবাক হবার ছিল না। পাড়ার বেশিরভাগ মানুষই আমায় আপনি বলত। কিন্তু এই লোকটির কথাগুলো শুনে আমি অবাক হলাম। মায়ের কাছ থেকে সরে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, দাদুর ইচ্ছে!

জি হাঁ। লোকটি সসম্ভ্রমে মুখটা নামাল। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, হুজুরসাহেব ইচ্ছের কথাটা আজ ভোরবেলায় জানিয়েছিলেন। তখনই আসা উচিত ছিল। কিন্তু খোদার ইচ্ছে! বড় আপসোস—আমার জমির জরুরি কাজ ছিল। ভাবলাম খেত থেকে ফিরে তারপর বেরিয়ে পড়ব। আপনাকে নিয়ে যাব। তা খোদার ইচ্ছেয়—যখন আমার খেতের কাজ আধাআধি হয়েছে, খবর গেল উনি মারা গেছেন। আমার গোনাহ হয়ে গেল, কী করব!

লোকটা কপালে করাঘাত করতে থাকল।

তাহলে আমায় এক্ষুনি ওর সঙ্গে যেতে হবে—সঙ্গে কিছু মাটি নিয়ে। দাদুর কবরে দিতে হবে। তা না হলে নাকি দাদুর আত্মা শান্তি পাবে না! মা সারা গায়ে ভালোমত কাপড় জড়িয়ে লোকটার পাশ দিয়ে বেরল। উঠোনের ওপাশে রান্নাঘর। তার লাগোয়া একটা ছোট্ট ঘরে দাদু থাকতেন। একটা কাটারি দিয়ে খানিক মেঝের মাটি তুলে আঁচলে রাখল মা। তারপর বলল, খোকা তাক থেকে ওই প্যাঁটরাটা নামা।

প্যাঁটরায় ঠাকুমার কিছু কাপড়চোপড় ছিল। একটা পরিষ্কার সুন্দর রেশমি শাড়ি—ঠাকুমা বলতেন ওর নাম ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি, ওঁর বিয়ের উপহার—আমার চোখের সামনে ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলল মা। বিস্ময়ে ক্ষোভে বলে উঠলাম, ছিঁড়ে ফেললে! অমন সুন্দর শাড়িটা?

মা কেমন হাসল। তারপর মাটিগুলো যত্ন করে সেটায় বাঁধল। হাতে তুলে তার ওজন পরখ করলও একবার। আমি নিয়ে যেতে পারব কি না, তাই দেখছিল মা। বললাম, মাটিগুলো দাদুর কবরে দেব। কিন্তু শাড়িটা?

মা চিন্তিতমুখে বলল, ফেলে দিস ওখানে কোথাও। যা ইচ্ছে করিস।

ঠিক এতক্ষণে আমার গল্পটা শুরু হল।

সময়টা ছিল এমনই শরৎকাল। সবুজ ধানের মাঠ পেরিয়ে ভিজে ঘাসেভরা স্যাঁতসেঁতে আলপথে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। আকাশটা ছিল ঘন উজ্জ্বল নীল আর বৃষ্টিধোয়া। কেবল মাঠের শেষ দিগন্তে ধূসর রঙের কুয়াশা দেখা যাচ্ছিল। বাঁপাশে সূর্য রেখে আমরা কোণাকুণি চলেছি। বাতাস বইছে শনশন করে। পায়ের জুতো খুলতে হচ্ছে বারবার—আলে কোথাও কোথাও কাদা জমে আছে। হাঁটুর নিচেটা ঘাসের ফুলে কুটকুট করছে। বারবার হাত বাড়িয়ে ঝাড়তে গিয়ে ধানের গোড়ায় খেতের কালো জল লক্ষ্য করছি। সেই স্বচ্ছ চমৎকার জলে অজস্র পোকা আর খুদে মাছ ছোটাছুটি করছে। কোথাও বা শামুক শুঁড় বাড়িয়ে ঘাসের ডগা স্পর্শ করছে।

মাঝে মাঝে এইসব দেখবার জন্যে দাঁড়াতেই পিছন থেকে লোকটা তাড়া দিচ্ছিল, জলদি চলুন, জলদি। অনেকটা দূর যেতে হবে।

অত বড় মাঠটা ঢালু হতে হতে যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে শুধু জল আর জল। ধানের খেত থেকে বেরোতেই সামনে হঠাৎ বিশাল উজ্জ্বল উত্তরঙ্গ জল—প্রচণ্ড ভয়ে থমকে দাঁড়িয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। পায়ের কাছে ঢেউয়ে ফেনা আর খড়কুটো দুলছে। কলকল ছলছল আলোড়নকারী ধ্বনিপুঞ্জের কাছে নিজের কণ্ঠস্বর খুবই অসহায় আর অবশ ঠেকল। বলছিলাম, আমরা কোথায়?

পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। আমার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে সে তার বড়বড় হলুদ দাঁত খুলে হাহা করে হাসল। বলল, ডর লাগছে? পানি পেরতে হবে না। আমরা এবার বিলের ধারে ধারে যাব।

বেনা কাশকুশে ছোটবড় ঝোপের পাশ দিয়ে উঁচু পগারে আমরা বিলটার সমান্তরালে কিছু দূর হেঁটে গেলাম। কাঁটা ঝোঁপে সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি উড়ছিল। কয়েকবার হাত বাড়ালাম তাদের ধরবার জন্য। একবার শুধু সামান্য একটুর জন্যে হাত ফসকে পালাল একটা। পরে দেখি আঙুলে গুঁড়ো গুঁড়ো রং লেগে রয়েছে তার ডানার। এত ভালো না লাগল! গাঙফড়িংয়ের ডানায় রোদের ঝিকিমিকিতে চোখে দুটো কতবার ধাঁধিয়ে দিল। ঘাসফড়িং উঠে গেল হাঁটুর ফাঁক দিয়ে। একটা নির্ভীক মুখে আমার বুকপকেটে বসে রইল। ইচ্ছে করেই তাকে বিরক্ত করলাম না। কিন্তু মাঝে মাঝে সাপ চলে যাচ্ছিল কিলবিল করে—চমকে উঠছিলাম। আর পিছন থেকে লোকটা বলে উঠছিল—ওর বিষ নাই, পা চালান।

ততক্ষণে খুব আলগোছে আমার মাথায় নানারকম ভাবনা এসে জুটেছে। এইসব পোকামাকড় প্রজাপতি গাঙফড়িং ঘাসফড়িং সাপ আর জলের দুনিয়ায় আর কতক্ষণ আমার হেঁটে যেতে হবে? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমায়? প্রবল অবিশ্বাসে আড়চোখে পিছনে লক্ষ্য রাখছিলাম। শুধু দেখতে পাচ্ছিলাম ওর থ্যাবড়া হাজাধরা হলদে পা দুটো—বিচ্ছিরি বাঁকাচোরা মোটা কয়েকটা আঙুল! ওই পা-দুটো সারা জীবন—কতদিন ধরে এমন সব বিচ্ছিরি দুর্গম পথ হেঁটেছে এবং আমায়ও কি অমনি করে হাঁটাতে চায় সে? আর আশ্চর্য, এই পথ বিচিত্র দুনিয়া সম্পর্কে ওর বিন্দুমাত্র ভীতি নেই, বিস্ময় নেই, আশ্চর্যরকম নির্বিকার সে। চোখ দুটোয় শেষবেলার লালচে রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে—জল থেকে অসম্ভব উজ্জ্বলতা তুলে নিয়ে ওই রোদ দৃষ্টিকে দিচ্ছে ধাঁধিয়ে—অথচ সে ঠিকই পা ফেলছে, আমি টলছি। শেষে স্থির করলাম, বাঁ পাশে জলের দিকে আর তাকাব না।

ক্রমশ পথ সামনে উঁচুতে উঠে গেল। একটু পরেই দেখি—নদী।

নদী! নদী সেই বয়সে বার তিনেক মাত্র দেখেছি। আমাদের গাঁয়ের পাশে কোনও নদী নেই। পিসির বাড়ির পাশে নদী দেখেছি। সেই নদীটাই তিনবার মাত্র। তারপর নদীর কথা ভূগোল পড়েছি। সেই নদী পেরোতে হবে যে!

একটা জোড়াবাঁধা তালডোঙায় মাঝি আমাদের পার করে দিল। ওপারে গিয়ে পয়সা চাইলে লোকটি আমার পরিচয় দিল সবিশেষ। দাদুর মৃত্যুসংবাদ জানাল। শুনে মাঝি বিড়বিড় করে কী বলতে বলতে ডোঙাটা ঠেলে দিল। খুব অবাক লাগল। আমাদের চলায় কেউ কোনও বাধা দিচ্ছে না যেন! সবাই পথ মুক্ত রাখতে সাহায্য করছে।

বেলা শেষ। আবছায়া ঘন করে তুলেছে বিস্তৃত নীলাভ কুয়াশা—ধানের খেতে, গাছপালায়, গ্রামের ওপর—সবখানে। যেন খুব যত্ন করে কুয়াশা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে দুনিয়াটাকে। কেন? খুঁটিনাটি লক্ষ্য করার প্রবণতার কথা আগে বলেছি। তাই এটা ছিল আমার নিভৃত সকুণ্ঠ প্রশ্ন। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারের রঙ পুরো নীলচে দেখাল। হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল আমার। দৃশ্যমান বিরাট দুনিয়া থেকে হঠাৎ সরে গেছি যেন—ভীষণ একলা হয়ে পড়েছি—খুব গভীর সব কিছুর আড়ালে আমায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, একটা কবরের দিকে, যে কবরের নিচে দাদুর আত্মা অপেক্ষা করছে আমার জন্যে, একমুঠো মাটি তাঁকে আমি দেব...আচমকা ভয় পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। আমার...আমার যেন মনে হল, অবিকল মৃত্যুর স্বাদ আমি পেয়ে গেছি। মৃতদের গায়ে গন্ধ আমি টের পাচ্ছি। এমন কি, তাদের প্রতীক্ষিত নীল উজ্জ্বল চোখ দুটো আর ধূসর খড়ি-খড়ি কেঠো গতরগুলোও স্পষ্ট দেখছি। ওদের মধ্যে যে আমার দাদু সে একটা ভিজে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছে—ডাকছে, আয় রে খোকা, আয়!

মৃতরা তো ওইরকমই। কবরের নিচে পোকামাকড় আর প্রজাপতিদের ডিম, উইপোকারা থিকথিক করে, শেয়াল কি খরগোশ গর্ত বানিয়ে নেয়, কাঁকড়া, শামুক বা সাপ শীতের শুরুতেই ঘুমোতে চলে যায় মাটির নিচে, এবং এইসবের মধ্যে দাদুরা বিচরণ করেন।...

আমার চুল খাড়া হল। রোম কাঁটার মত শক্ত হল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

লোকটা হাত বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুঁল আমায়। আলগোছে তুলে একেবারে কাঁধে বসিয়ে দিল। বলল, আহা, হা আমারই ভুল মিয়াসাব। ব্যস, বসেন—আমার মাথাটা ধরে বসে থাকেন। ঘোড়ার মতন টগবগিয়ে হাঁটতে লাগি এবার। আহা হা...কচি ছেলে!

কে এই লোকটা! অন্ধকারে কুয়াশার মধ্যে দুলে দুলে যাচ্ছি আর মাঝে মাঝে ওর তালশিরের টুপিটা স্পর্শ করছি। গা শিউরে উঠছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ও হাঁটছিল—তারপর আস্তে আস্তে চলার গতি বাড়িয়ে দিল। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খাচ্ছিলাম। ও একটা সত্যিকার ঘোড়ার মত দৌড়তে শুরু করেছে। যতদূর পথ আমরা এসেছি, সবাই আমাদের সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়েছে—সরে গেছে। এবার আরও দ্রুত দু'পাশে সরে যেতে থাকল—যেন জীবজগৎটা পথ পরিষ্কার করে দিল একেবারে।

তারপর অন্ধকার রাতের মাঠ কুয়াশা পথ গ্রাম পেরিয়ে—কত দূর দূরান্ত পাড়ি দিয়ে ও এগিয়ে যাচ্ছিল একটা কবরের উদ্দেশ্যে। ক্রমে সব একাকার হয়ে যাচ্ছিল। দৃশ্যহীন কালো দুনিয়ায় কেবল চিৎকার করছিল কিছু পেঁচা, কতিপয় শেয়াল আর হাজার লক্ষ কোটি—সংখ্যাহীন পোকামাকড়েরা। কিছুক্ষণ পরেই মাথার ওপর নক্ষত্রময় আকাশটাও ঢেকে গেল। তখন যেন একটা অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করলাম আমরা। আমি কেশর-ফোলানো ধাবমান একটা ঘোড়ার গলা জড়িয়ে সেঁটে রইলাম। এক হাতে ঠাকুমার রেশমি

শাড়ির টুকরোয় বাঁধা দাদুর ভিটের কিছু মাটি। স্যাঁত স্যাঁত করে সারা জীবজগৎ সসম্ভ্রমে দু'পাশে সরে-সরে যেতে থাকল।

আমার গল্পের এখানেই শেষ।

তবে কি, কোনও গতিবান যানে—ধরুন ট্রেনে দীর্ঘ ভ্রমণের পর যেমন সেই গতির অনুভব গোপন প্রতিধ্বনির মত দেহে বা মনে কিংবা দেহমনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জেগে থাকে, তার মানে—আপনি স্থির মাটির ওপর দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে থেকেও গতিময় সেই চলার হাত থেকে নিষ্কৃতি পান না—আমার হয়ে গেছে সেই দশা!

অনেক সময় হয়ত বা ভুলে থাকি—মানুষের ভিড়ে বা পরিবারের মধ্যে—কিংবা কাজে ব্যস্ততায় দায়িত্ব-পালনে আদর্শবোধ খাওয়া-দাওয়া সামাজিকতা কত কিছুতে। কিন্তু যখনই একলা হয়ে পড়ি, ন'বছর বয়সের এক শরৎরাত্রির সেই অভিযাত্রার শক্তিমান থ্যাবড়া পা-ওয়ালা ঘোড়া কিংবা মানুষটার চলার ঝাঁকুনিতে আমি অস্থির হয়ে উঠি। আমার হাড়মাংস থেঁতলে দলা পাকিয়ে যেতে থাকে। হয়ত নিছক প্রতিধ্বনি—প্রতিধ্বনির মত প্রতিভাসিক। অথচ আমার ওই দীর্ঘস্থায়ী জ্বর দেখা দেয়। আঁতকে উঠে ভাবি, আমি কোথায় চলেছি? আরে, আরে! কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমায়—এই অন্ধকারে কুয়াশায় শিশিরে? রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে, যখন হঠাৎ স্মৃতি ফিসফিসিয়ে ওঠে—তোমার যাত্রা তোমার পূর্বপুরুষের কবরাভিমুখে! আর চোখ খুলতেই দেখি, চরাচরের সব বর্ণময় উজ্জ্বলতা ক্রমান্বয়ে ঢেকে যাচ্ছে মাকড়সার জালের মত নীল ধূসর ব্যাপক কুয়াশায়—স্যাঁত স্যাঁত করে সমম্ভ্রমে দুপাশে সরে যাচ্ছে জীবজগৎটা, আর প্রসারমান বিশাল অন্ধকারের দেশে আমি চলে গেলাম—তারপর মাথার ওপর সকল নক্ষত্রকেও প্রায় নিঃশব্দে ঢেকে ফেলা হল। পাছে মুঠো আলগা হয়ে যায়, যা নিয়ে চলেছি তা খুলে পড়ে, ঠাণ্ডা মুঠোটা অধিকতর শক্ত হতে থাকবে। আমি প্রস্তুত হই কী এক পবিত্র দায়িত্ব পালনে।...

তা হলে বলা যায়, ওই ন'বছর বয়সেই জীবন ও মৃত্যুর পারস্পরিক সম্পর্কটা আমি টের পেয়ে গিয়েছিলাম।

রানীরঘাটের বৃত্তান্ত

সে অনেক বছর আগের কথা।...

নদীর ওপারে এক শহর, এপারে এক ঘাট। তার নাম রানীরঘাট। নদীর নাম ভাগীরথী। লোকেরা বলে মাগঙ্গা। মাগঙ্গার কোলে ছোট্ট মেয়ের মত রানীরঘাট হেসেখেলে দিন কাটায়। গাঁয়ের মেয়ের চোখে শহরে ঘোর লাগা ভাবটুকুও চোখে না পড়ে পারে না। কিন্তু ওই আলতো ঘোরটুকুই ছিল তখন, আর কিছু না।

একটা বাসস্ট্যাণ্ড ছিল। কয়েকটা ছোটোখাট দোকান ছিল। রিকশ খান পাঁচেক। এক সময় ঘোড়ার গাড়িও ছিল। সারাদিন বাইরের মানুষের ভিড়ে হইচই বড় বেশি। তারপর সন্ধ্যা হতে না হতে ভিড় কমে যায়। শেষ বাস ছেড়ে যায় সাড়ে সাতটাতেই। বাঁশবনে শেয়াল ডাকে। তক্ষক ডাকে। পেঁচা ডাকে শিমুল গাছে। নিঃঝুম রাতে ঘাটের ধারে আটচালায় একটা লণ্ঠন। কাদের চাপা গলায় গপ্পসপ্প। আর মাঝে মাঝে ঘাটের ইজারাদার চৌবেজির চেরা গলায় হাঁক—শম্ভুয়া—আ—আ! শেষ খেয়া ফিরতে হয়ত দেরি করছে।

সেবার শীতে জেলাবোর্ডের সেন্সারে বাবুরা এসে আধঘণ্টাতেই রানীরঘাটের গণনা শেষ করে ফেলেছিলেন। রোদে দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খেতে একজন হঠাৎ তামাশা করে বললেন—আরে, ওই পাগলীটা যে রয়ে গেল! লিখে নাও।

আটচালার ধারে বসে পাগলীটা তখন যাকে দেখছে, চেঁচাচ্ছে—ও বাবারা! ওগো বাবারা! সবাইকে ওর বাবা বলা অভ্যেস! কিন্তু বাবা বলে ডাকছে কেন, কী বলতে চায়, বোঝা যায় না। ভিক্ষে দিলেও তো ছুঁড়ে গায়ে ফেলে দেয়।

পাশের তেলেভাজার দোকান থেকে ময়রাবুড়ী ফিক করে হেসে বলল—তা লিখে নেবেন তো নিন বাবুরা। লিখুন, সুরেশ্বরী। লোকে বলে সুরিখেপী! সেও তো একটা মানুষ বটে। রানীরঘাটে সাত বছর আছে। সবার নাম লিখলেন, ওর কেন লিখলেন না?

প্রথমবাবু বললেন—আর কে আছে ওর?

—আবার কে থাকবে? যে যা দয়া করে দেয়, খায়। আটচালাতে ঘুমোয়।

দ্বিতীয়বাবু দেখছিলেন সুরিখেপীকে। ভুরু কুঁচকে চাপা গলায় বললেন—মেয়েটা মনে হচ্ছে প্রেগন্যাণ্ট! স্ট্রেঞ্জ!

প্রথমবাবু হেসে ফেললেন—ভাগ! তুমি তো ব্যাচেলার। কিসে বুঝলে?

—এসব বুঝতে বিয়ে করা লাগে না। দেখ না, জাস্ট লুক অ্যাট দ্য থিং।

সুরিখেপী ছেঁড়া নোংরা শাড়িটা সামলাতে পারে না। অথচ মাথায় ঘোমটাটি থাকা চাই-ই। প্রথমবাবু দেখলেন। অবাক হয়ে বললেন—সত্যি তো! মানুষ মাইরি এখনও জানোয়ার।

ময়রাবুড়ী ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ভারি গম্ভীর হল। গোমড়ামুখে বলল—মা-গঙ্গার চোখের সামনে এই পাপ। সইবে ভেবেছেন? দেখুন না কী হয় পেলয়কাণ্ড! রানীরঘাট ভেসে যাবে। ধুয়েমুছে যাবে। বেঁচে থাকলে দেখে যাব।

দ্বিতীয়বাবু হো হো করে হেসে বললেন—ও বুড়ীমা, কী করে দেখবে? তুমিও তো ভেসে যাবে!

বুড়ী বিকৃত মুখে গরম তেলে বেগুনি ছাড়ল। চড়চড় করে আওয়াজ হতে থাকল। কনুই গড়িয়ে জলের ফোঁটা পড়েছে বুঝি। বাবুর কথার জবাব দিল না। পাপের শাস্তি নিজের হাতে দিচ্ছে যে।

প্রথমবাবু চায়ের ভাঁড় ছুঁড়ে ফেলল আকন্দের ঝোপে। পা বাড়িয়ে আবার রসিকতা করল।—তাহলে লিখতে হলে দুটো নামই লেখ। সুরেশ্বরী না কী বলল যেন, আর তার পেটে যেটা আছে।

—ছেলে হবে, না মেয়ে হবে তার ঠিক নেই। দ্বিতীয়বাবু সিগারেট ধরিয়ে পা বাড়ালেন।

—একটা কমন নাম দেওয়া যাক।

—মাথায় আসছে না।

—অজস্র আছে, অজস্র। শোন বলছি। ঊষা, পার্বতী, রেণু, উমা...আঙুল গুণতে গুণতে প্রথমবাবু বললেন। ক'টা হল? দাঁড়াও, আরও বলছি। রমা।...

সুরি পাগলী চেঁচিয়ে উঠল—বাবারা! ও বাবারা! ওগো বাবারা!

ঘাটের ধারে উঁচু পাড়ে ঘাটের ইজারাদার চৌবেজির গদি। পূর্ণিয়ার লোক। এ ঘাটে আছেন চৌদা বরষ। যখন এসেছিলেন, তখন চুল ছিল কুচকুচে কালো। এখন অর্ধেক পেকে গেছে। ফি-সাল জষ্ঠি মাসের সংক্রান্তিতে গঙ্গাপুজোর মেলার দিন ন্যাড়া হন। ময়না পোষার শখ খুব। খাঁচাটা সামনে ঝুলছে। রাম নাম শেখান সকাল সন্ধ্যা। নিজে পড়েন তুলসীদাসের রামচরিতমানস। কালেক্টরিতে এ বছর একইশ হাজার রুপেয়া গুনে দিয়ে ঘাট জিতেছেন। আনা-আনা পারানি। তবে বিলাঞ্চলের যুবতী মেছুনীদের বেলা আনাকড়ি নয়, রাতের জলের ফসল ঝকঝকে রাইখয়রা মাছ। চৌবেজি মাছও খান, মাংসও খান। খৈনি ডলেন, গড়গড়াও টানেন। গদীতে কোলে তাকিয়ে নিয়ে বসে ভাঙা উচ্চারণে গানও গেয়ে ওঠেন—'কেমনে ও গঙ্গা হোবো পার/হামি জানে না সাঁতার।' মাছের গন্ধ লাগা বেলুন-বেলুন বুক খিলখিল হাসিতে ফুলে ওঠে, দুলে ওঠে। —ওত্তা হাসো মাৎ রি! ফাট যায়গা!

—ঘাটোয়ারিবাবু না ঘাটের মড়া! কোথায় শিখলে এমন গান! আ ছি ছি।

আর ফচকেমির সময় নেই। শম্ভু মাঝি ডাক দিয়েছে—এ অষ্টসখী রাধিকে সুন্দরীরা।...

ওদিকে ডাক দিয়েছে ইসমাইল ড্রাইভারের বাসও। হর্নের ভ্যাঁক ভ্যাঁক আওয়াজ চলে যাচ্ছে নদী পেরিয়ে ওপারের ঘাটে।—পুরন্দরপুর মনসুরগঞ্জে বিনোটি মহিমাপুর। ছেড়ে গেল, ছেড়ে গেল। সবুজ বাসের ভেতরে লোক, বাইরে লোক, ওপরে লোক। অলীক ফলন্ত বৃক্ষ হেলতে দুলতে যাবে। রাস্তা মহা ফক্করবাজ।

—বাবারা! ওগো বাবারা! ও বাবারা! সুরিখেপী মাটিতে থাপ্পড় মেরে সেই হাত কপালে আনে। আমার মাটিতে থাপ্পড়। ধুলোয় কপাল ধূসর।

ময়রাবুড়ী চেঁচায়—চুপ! চুপ! গলায় দোব গরম তেল ঢেলে! লজ্জা করে না বড় গলা করে চেঁচাতে? তখন কোথায় ছিল এ গলা? চিহরিপোকার (শ্রীহরি) কামড় খেয়ে বোবা হয়েছিল?

মাঘের শেষে রানীরঘাটে শিমুলের ডালপালায় যেন হাজার অলীক বনমোরগ উড়ে এসে বসেছে। লাল লাল ঝুঁটি। ফাল্গুনে তাদের সাদা পালক উড়ে পড়ে মাগঙ্গার বুকে। স্বচ্ছ কালো জল বালির চরে মাথা কুটে কুটে পথ প্রার্থনা করে। যেতে পায় কী পায় না! শ্যাওলায় ঠোঁট ঘষে বেড়ায় মৌরালার ঝাঁক। প্রতিমার খড়বাঁশের টাট উল্টে গেছে যে স্রোতে, তা এখন স্মৃতি এবং পরবর্তী প্রতীক্ষা। মড়াখেকো দাঁড়কাক এসে সেই টাটে বসে সবাইকে খেতে ডাকে—খা খা! ময়রাবুড়ী তাই শুনে বলে—ওই ঘাটের মড়াটাকে খা। এ ঘাটে অনেক মড়া। কোন মড়ার কথা বলে দাঁড়কাক জানে না। সুরিখেপীকে বুড়ী এনেছে চান করাতে। বুড়ীর হাতে কঞ্চি। কঞ্চিটা নাচাতে নাচাতে বলে—ভালমানুষের বেটি হবি তো বস। বসে পড় জলে। তাই বলে ওকে ছোঁবে না বুড়ী। নিজে-নিজেই চান করতে হবে সুরিখেপীকে। তাই আবার স্নান। পা ছড়িয়ে আঘাটার জলে বসে কপাল থেকে জলের দিকে এবং জলের দিক থেকে কপালে হাত।—বাবারা! ওগো বাবারা! জল বলে ধুলোমাখা কপাল ধুয়ে যায়, এটাই এখন সুবিধে। বুড়ী বলে—হাতখানা বুকে দে লো, বুকে দে। বাবারা বলে বুকে দে দিকিনি।

শীতটা চলে গেল। গ্রীষ্ম এল। ঘাটের ধারে আকন্দঝাড়ে ফুল ফুটল। ঘাটোয়ারিজি গঙ্গাপুজোর দিন ন্যাড়া হলেন। আটচালায় সুরিখেপীকে আড়চোখে দেখে দয়া করে ভাত পাঠিয়ে দিলেন। এবছর অচানক দশ হাজার টাকা বেড়ে গেছে ইজারার দর। তাই বলে চৌবেজি রানীরঘাট ছাড়বেন না। বুড়ো হয়ে মরবেন, তখন কেউ গদি দখল করুক। বড় মায়া বসে গেছে রানীরঘাটে।

বর্ষায় এক রাতে তুলকালাম বৃষ্টি। তার মধ্যে সুরিখেপীর বাচ্চা হল আটচালায়। কজন দূর গাঁয়ের গাড়োয়ান গরুমোষের গাড়ি নিয়ে এসে আটকে পড়েছিল। তারাই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ছুটোছুটি করে অবশেষে ময়রাবুড়ীকেই পেল। মানুষের জন্মটা ওইসব গেঁয়ো গাঁড়লদের কাছে নিশ্চয়ই খুব দামি। তারা একটা হারিকেন দিল পর্যন্ত। আটচালার কোণটাও কাপড় টাঙিয়ে ঘিরে দিল। মেয়েমানুষের আর্তনাদ শুনে তাদের হৃদয় গলে যাচ্ছিল। বৃষ্টি না থাকলে তারা এ সময় দূরে সরে থাকত। মানুষের জন্ম তাদের কাছে বড় পবিত্র ঘটনা। তারা একে সম্মান দিতে চাইছিল। কিন্তু বৃষ্টি! আর বুঝি সময় ছিল না বর্ষাবার। তারা বর্ষার বাপান্ত করছিল।

ময়রাবুড়ী বলল—আগুন চাই যে এখন। দেখ দিকি, এ অসময়ে গুখেকোর বেটি এ কী করে বসল!

গাড়োয়ানরা ঘাটোয়ারিবাবুর গদি থেকে শুকনো লকড়ি এনে দিল। একটু পরে শোনে, ওঁয়া ওঁয়া কান্নাকাটির মধ্যে বুড়ী হেসে-হেসে আদর করছে—এ রাঙা টুকটুক কোত্থেকে এল রে! এ ভাঙাঘরে চাঁদের হাট কোন মুখপোড়া বসালে রে! একে আমি কোথায় রাখব রে! আহা হা, যেমন নাক তেমনি চোখ। যেমন মুখের গড়ন, তেমনি রঙ। ওরে ছোঁড়া, এ মুখ তুই কোথায় পেলিরে?.....

সে এক দীর্ঘ পদ্য, ছড়ার সুরে গায়। রানীরঘাটে সকাল হতে না হতে সুখবর পড়ল ছড়িয়ে। তখনও ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের নামগন্ধ নেই কোথাও। রানীরঘাটের স্থায়ী জনসংখ্যা বাড়ল, এই যথেষ্ট। প্রসূতিকে কড়া চা খাইয়ে-খাইয়ে ঢোল করার অবস্থা। ময়রাবুড়ী চোখ পাকিয়ে কপট ধমকায়। বাসের লোক রিকশর লোক, আর যতসব উটকো লোকের ঝামেলা সে ছাড়া আর কে সামলাবে? সে আঁতুড় আগলে দাঁড়িয়ে বলে—কী দেখার আছে? অ্যাঁ? কারও মা-বোন বিয়োইনি?

সেন্সাস বাবুদ্বয় অনেকগুলো নাম আওড়ে গিয়েছিল। রানীরঘাট নিল না। আদর করে নাম নিল ফালতু। আসলে এতকাল যেন কাজের মত কাজ, কিংবা খেলার মত একটা চমৎকার খেলা পাচ্ছিল না কেউ। এতদিনে পেল। পেল তো এমনভাবে পেল যে হুজুগের মাত্রাটা গেল বেড়ে। ছোকরা কণ্ডাক্টররাই লিড নিল। চাঁদার লিস্টিতে প্রথম নাম চৌবেজির। পাঁচ টাকা। দ্বিতীয় নাম ইসমাইল ড্রাইভার। দু'টাকা। ঘাটে ফিস্টি হবে। সুরিখেপীর ব্যাটার জামাপেণ্টুল কিনতে হবে। একখানা নতুন শাড়িই বা কেন কেনা হবে না? এ প্রস্তাব শম্ভু মাঝির। আর সেইদিনই দৈবাৎ এসে পড়েছে একটা নাটুকে দল। লোকে বলে আলকাপ দল। ছেলেটা মেয়ে সেজে নাচে গায়। বেঁটে লোকটা সঙ দিয়ে লোক হাসায়। ঘাটের পিছনের চত্বরে ত্রিপল টাঙিয়ে আসর হল। ঘাটবাবুর হ্যাজাক জ্বলল। রানীরঘাটে এ ছিল উৎসবের রাত। আর তখনও রানীরঘাটে ব্রিজ হয়নি। বিদ্যুৎ আসেনি। মাইক বাজত না। দূর উত্তরে ফরাক্কায় ফিডার ক্যানেলটাও খোঁড়া হয়নি। দেশ দু'টুকরো হয়নি! কত কী হয়নি। সে অনেক বছর আগের কথা।....

সুরিখেপীর চেহারা আহামরি ছিল না। মুখটা ছিল গোলগাল, সরু বেঁটে নাক, নিচের ঠোঁটটা একটু পুরু। গতরটা ছিল থলথলে প্রচুর মাংসে ভরা। ময়রাবুড়ী বলত—সাতশো শ্যালশকুনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না। শুধু দেখবার মত জিনিস ছিল তার চুল। কী চুল কী চুল! ছেলে হওয়ার পাঁচদিনের দিন, আঁতুড় থেকে যেদিন বেরোয়, সেই পাঁচোটে'র দিন কঞ্চি তাড়না করে মমতাময়ী বুড়ী তাকে নাইয়ে আনে এবং গড়গড় করে এক বাটি নারকোল তেল ঢেলে দেয় চুলে। সেই একবার তেল। ফলটা হল কী আটচালার ধুলো-ধাসড় মেখে পুরোটা গিয়েছিল জট পাকিয়ে। জটার প্রতি লোকের ভক্তি আছে। পরে যখন রানীরঘাটওলারা সুরিখেপীর জন্যে বাসস্ট্যান্ডের পিছনে একটা ছফুট-চারফুট-সাতফুট মাপের খুপড়ি বানিয়ে দিয়েছিল, সুরি বাচ্চা কোলে নিয়ে সেখানে বসে বাবাদের ডাকাডাকি করত, আর ধর্মভীরু দেহাতি মেয়েরা পয়সা ছুঁড়ে দিত! পয়সাগুলো সুরি পাল্টা ছুঁড়ে ফেলবেই। সেই পয়সা ঘাটেরই কেউ না কেউ কুড়িয়ে জোর করে ওর আঁচলে গেরো বেঁধে রাখবেই। তাতে আপত্তি ছিল না সুরির। কিছুতেই আপত্তি ছিল না। পরে গঙ্গাপুজোর আগেরদিন ময়রাবুড়ী চুপি চুপি একদলা সিঁদুর ঢেলে দিয়ে এল সিঁথিতে। চেহারাটা খুব খুলে গেল মেয়েটার। টুকটুক করে তাকিয়ে দেখে বলল, আহা! শাঁখানোয়াখান হলে কী মানান মানাত পোড়ারমুখীকে! ব্যস, খবর গেল শম্ভু মাঝির কাছে। ওপারে ঘাটের ওপর শাঁখাপট্টি। তাও জুটে গেল। ময়রাবুড়ী খুপরির সামনে কোমরে দু'হাত রেখে কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখল। দেখে দেখে সাধ আর মেটে না। ছেলেপুলের মায়ের যা যা দরকার, তা নইলে চলে? দেখ তো মুখপুড়ীকে এখন কেমন মানিয়েছে। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বুড়ী দৌড়ে যায় দোকানের দিকে। রানীরঘাটে পাখপাখালি যত, তত কুকুরবেড়াল। তার ওপর কড়াইতে তেল ধোঁয়াচ্ছে।.....

সেবার গঙ্গাপুজোর দিন সন্ধ্যেবেলা খুব কালবোশেখি হল। বিষ্টি হল। বাইরের লোকেদের খোয়ারের হল একশেষ। কিন্তু রানীরঘাটে গজিয়ে গেল এক দেবী। আবার কে? ওই সুরীখেপী। সে 'খেপী মা' হয়ে গেল। লোকে তার কাছে জ্ঞাতব্য তথ্য আদায় করতে চায়। খেপী মার শুধু ওই এক কথা—ওগো বাবারা! ও বাবারা! আর ডানহাত কপাল থেকে মাটিতে, মাটি থেকে কপালে! রাতদুপুরে নিঝুম রানীরঘাটে হঠাৎ শোনা যায় —ওগো বাবারা! ও বাবারা!

কিন্তু এত যে যত্নআত্যি লক্ষ্য, তার তলায় তলায় আরেক তরঙ্গ বইছিল রানীরঘাটে। কাজটা কার হতে পারে? পাপ হোক, পুণ্য হোক, ভাল বা মন্দ হোক, এ একটা ঘটনাই বটে। কে সে? জানোয়ার হোক, মানুষ হোক—দৈবাৎ মতি টলেছিল, কিন্তু কার? নানা

ফিকিরে বাচ্চাটার মুখ দেখা হয়, ফিরে এসে রানীরঘাটে মুখ খুঁজে মেলাবার চেষ্টা চলে। মেলে না। চৌবেজি ঘাটোয়ারির নামটাও উঠেছিল। টেকেনি। অত সাফসুতরো মানুষ। গদির সাদা চাদরে এককণা ময়লা পড়তে দেন না। দু'বেলা স্নান আহ্নিক করেন। খালি গায়ে ধবধবে সাদা পৈতে থেকে জ্যোতি ঠিকরে পড়ে। নোংরা দুর্গন্ধ এক নারীশরীরে কোন দুঃখে সুখ খুঁজতে যাবেন? তার ওপর লাখপতি লোক। ইচ্ছে করলেই ওপারের অলিগলি খুঁজে সুন্দরী সংগ্রহ করাটা ডালরোটি খাওয়ার সামিল। কেউ বলেছিল, ইসমাইল ড্রাইভারই বা! যা মদ-তাড়ি খায় লোকটা। রাতের দিকেই ঘটেছে। হিসেবমত আশ্বিন মাসেই বটে। সে-আশ্বিনে প্রায়ই রাতে ঝড়বৃষ্টি হত। কিন্তু মনে পড়ল, তখন ইসমাইল অ্যাকসিডেণ্ট করে অনেকদিন হাসপাতালে ছিল।

এইভাবে জনাদশেক প্রজননক্ষম পুরুষ মানুষ, যারা কিনা ঘাটেরই বাসিন্দা এবং বয়স পনের থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে, সবাইকে যাচাই করে-করে বাদ দেওয়া হল। অতএব দায়িত্বটা বাইরের লোকের ঘাড়েই ফেলতে হয়। আশ্বিনে তো ঝড়জল গেছে। বারোমাসই ওই আটচালায় রাতের আশ্রয় নেয় কত জায়গার পথিকজন, গাড়োয়ান, ভিখিরি, ফকির, সন্ন্যাসী—কত রকম মানুষ। কার মাথায় কটকট করে 'চিহ্রিপোকা' কামড়েছিল! শেষঅবধি হাল ছেড়ে দেওয়া হল। ও পোকা বিষম পোকা। কামড়ালে উত্তর-পুব জ্ঞানগম্যি থাকে না।

আর দিন যায় রাত আসে। রাত যায়, দিন। মাস যায়, বছর। ঢ্যাঙা শিমুলে অলীক লালঝুঁটি মোরগের ঝাঁক আসতে ভোলে না। ঘাটোয়ারিজির ময়না কবীরের দোঁহার একটি শব্দ পেরিয়ে যেতে যেতে হিমশিম খায়। ঘাটোয়ারিজির বাকি চুল সাদা হয়ে ওঠে। খেপীমায়ের 'থানে' পয়সা পড়ে এবং চুরিও যায়। এক শীতে ময়রাবুড়ীও গঙ্গা পায়। খেপী চেঁচায়—বাবারা! ওগো বাবারা! ও বাবারা!

ফালতু তখন গুটগুট করে হাঁটতে শিখেছে। আর রানীরঘাটের সবাই তার বাবা। আধো আধো বুলিতে ছোঁড়াটা কাপড় ধরে টানে—বাবা! বাবা! ব্যাপারী, দালাল, ফড়ে, মামলাবাজ, গাড়োয়ান আর বাবু—সবাইকে বাবা ডাক। চৌবেজির উঁচু গদির ধারে দাঁড়িয়ে ছোট্ট নোংরা হাত বাড়িয়ে ডেকে ওঠে—বাবা! চৌবেজি হাসতে হাসতে ধমকান —ভাগ! ভাগ! তাই বলে কেউ ওর গায়ে হাত তুললেই হয়েছে! সারা রানীরঘাট এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

দেখতে দেখতে ফালতু বড় হল। আবার এক গঙ্গাপুজোর মেলার দিন খুব জলঝড় এল। সেই রাতে সুরিখেপী আচমকা বমি কাপড়ে-চোপড়ে করে ভোররাতে ঠান্ডা আর নীলবর্ণ হয়ে মারা পড়ল। মায়ের গুয়েমুতে ছোঁড়াটা বেহদ্দ ঘুমোচ্ছিল। বাঁশবনে বাঁশ কেটে খাঠুলি বানানো হল। ওপাশের শ্মশানে খেপীমা পুড়ল। রানীরঘাটে সেও একটা দিনের মত ছিল। আবার চাঁদা তুলে ফিস্টি। আবার এক আসর গান। শেয়ালমারার ষষ্ঠীপদ কেত্তুনে নিখরচায় গেয়ে গেল। ফালতুকে কেউ যদি শুধোয়—তোর মা কোথায় রে? ফালতু শ্মশানের দিকটায় তুলে ছড়া গায়—হো হো! কেপী গেচে পুলতে/ছসেল পতোল তুলতে!' অর্থাৎ কী হাসির কথা! খেপী গেছে পুড়তে, ছসের পটোল তুলতে। কে শেখাল? শম্ভু মাঝিই বা। সে বড় রসিক মানুষ। নয়ত দিনদুপুরে মাঝ গঙ্গায় লগি ঠেলতে ঠেলতে কেউ গায়—'এ ভরা গাঙমে চেকন জোসনা ডুব দিয়ে পার হবি লো সই/সই লো —ও—ও—ও?'

হাফপেন্টুল পরা উদোম-গা ফালতু ভালরকম বুলি ফুটলে বাসের মাথায় উঠে চ্যাঁচায় —চলে এস! আভি ছোড় দেগা! জলদি ছোড় দে গা!

আর এর ফলটা হল এই যে, সে গতি চিনল। গতিকে ভালবাসল। ইসমাইলের বাসেই তার জীবনটা জড়িয়ে গেল দেখতে-দেখতে। পুরন্দরপুর মনসুরগঞ্জো বিনোটি মহিমাপুর। কখনও ইসমাইলের সঙ্গে গঙ্গা পেরিয়ে শহর। শহরে ইসমাইলের বাড়ি। তার বউ ফালতুর ইতিহাস জানে। দেখলেই মুখটা গম্ভীর করে। জল চাইলে ফুটো এনামেলের গেলাসে জল দেয়। ছিঘেন্নার চূড়ান্তই করে। ইসমাইল কাঁচুমাচু হাসে খালি। কী বলবে? অথচ ছোঁড়াটা খুব কাজের। পাকাচুল তোলে। ফরমাস খাটে। নিজের ছেলেরা ইস্কুলে পড়ে। তারা যেন এ হারামি ড্রাইভারী কাজের ত্রিসীমানা না ঘেঁষে! হাতে স্টিয়ারিং এলে দুনিয়াটা পয়মাল হয়ে যায়, কে বুঝবে? থিতু হয়ে বসা যায় না ঘরে। শয়তানের চাক্কা ঘোরে সারাক্ষণ এই শরীরে। থামতে দিলে তো? আর শয়তান তোমাকে শেষঅবধি জাহান্নামের দিকেই চলেছে, টের পেয়েও কিছু করার নেই তোমার।......

কতকাল পরে রানীরঘাটে আরেক শীতে আবার এসেছেন সেন্সারের বাবুরা। এ বাবুরা সেই তাঁরা নন। এঁরা সরকারি বড় সেন্সাসের লোক। এ রানীরঘাটও সে রানীরঘাট নয়। তিনটে বাসরুট এসে মিলেছে ঘাটে। দোকানপাট বেড়েছে। বিদ্যুৎ এসেছে। শ্মশানঘাটের ওপাশে ব্রিজ গড়ে উঠছে। চৌবেজি ঘাটোয়ারির এই শেষ ইজারা। খাঁচার ময়নাটাও গেছে মরে। আর পাখি পোষেন না। তক্তপোশের তলায় ঘুণ ধরা খাঁচাটার কী অবস্থা কেউ জানে না। সেন্সারের বাবুরা ঘুরে-ঘুরে লোক গুনছিলেন। পোষা জীবজন্তুর হিসেবও নিচ্ছিলেন। আরও কত কী তথ্য। লোকসংখ্যা সতের থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে বাহান্ন। নেহাত পেটেরটা বাদ দিয়ে ধরলে। লোকেরা ব্রিজের দিকেই সরে যাবার তালে ছিল। কিন্তু গিয়ে করবেটা কী? নেহাত ঘর বেঁধে থাকাই হবে। উঁচু পুলের ওপর দিয়ে বাসবোঝাই লোকজন সোজা গিয়ে ওপারে নামবে। এখানে কোথাও আর রাস্তা আগলে দাঁড়াবার সাধ্যি নেই। রানীরঘাট হিম হয়ে ঝিম মেরে গেছে। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সময় গোনা! নেহাত ভিটের মায়ায় কেউ কেউ থেকে যাবে। সেন্সারের বাবুরা টের পেলেন, এ বাহান্ন আবার সতেরয় নামবে, কিংবা আরও নেমে সাতে ঠেকলেও অবাক হবার কিছু নেই। যারা দোকানদারি করতেই এখানে ঘর বেঁধেছে, তারা ওপারে নতুন বাসস্ট্যান্ডের কাছে দু'চার হাত জমির জন্যে মাথা ভাঙছে।

অথচ বাইরে-বাইরে এই মৃত্যুযন্ত্রণা বোঝার উপায় নেই। তেল ফুরোবার আগে সলতে পুড়ছে হু হু করে। রানীরঘাট ভিড় হল্লাজেল্লায় চঞ্চল। মোটর অফিসের টেবিলে শেষ সংখ্যা বসিয়ে সেন্সারের বাবুরা নেমে এলেন চায়ের দোকানে, যেখানে আগের সেন্সারের দুই বাবু চা খেয়েছিলেন। ওপরে একটুকরো টিনে লেখা : অন্নপূর্ণা টি স্টল। বাঁকাচোরা হরফ। তার তলায় লেখা প্রো : জগন্নাথ—পদবি ধুয়ে গেছে। চা বানাচ্ছে ষোল-সতের বছর বয়সের একটি মেয়ে। শ্যামলা ছিপছিপে গড়ন। দেখতে মন্দ না। ভেতরে দরমাবাতার দেয়াল ঘেঁষে একটা বেঞ্চের কোণায় বসে চা খাচ্ছে এক নবীন যুবক। মাথায় ঝাকড়-মাকড় চুল। সরু চিকন গোঁফ। তামাটে রঙ। শক্তসমর্থ চেহারা। তার পরনে তোবড়ানো খাঁকি ফুলপ্যান্ট, আর খয়েরি শার্টের ওপর হাতকাটা সোয়েটার। বাঁহাতে স্টিলের বালা। ভারি অমায়িক তার হাবভাব।

তার দিকে ঘুরে জগন্নাথের মেয়ে টুকটুকি হাসল।—ও ফালতুদা তোমার নাম লিখিয়ে দাওনি বাবুদের?

সেন্সাসবাবুদ্বয় বেঞ্চে বসেছেন। ফালতু ভুরু কুঁচকে বলল—কিসের নাম?

হাসতে হাসতে টুকটুকি বলল—ওর নাম লিখুন! ও যে বাদ পড়ে গেল!

প্রথমবাবু বললেন—তুমি বুঝি এখানেই থাকো?

ফালতু নিস্পৃহ ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে সিগারেট ধরাল। পানুটি কি এখানে? বত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা ঠেঙিয়ে বাস নিয়ে এসেছে একটু আগে। পথে দুবার বিগড়েছিল। ঠেলতে হয়েছে। মালিককে বললে বলেন, আর ক'টা দিন চালিয়ে নে বাবা। নতুন গাড়ি আসছে। ইসমাইলকে বুড়ো করেছে এ গাড়ি। সেই গাড়ি ফালতুকেও বুড়ো করবে।

দ্বিতীয়বাবু কাগজপত্র বের করেছেন ব্যাগ থেকে।—কেউ তো বলেনি তোমার কথা! হুঁ নামটা বলো ভাই।

ফালতু হেসে বলল—কী হবে?

প্রথমবাবু বোঝাতে শুরু করলেন। টুকটুকিও বলল—ভয় নেই বাবা! কেউ ধরে নিয়ে যাবে না। আমারও নাম লিখে নিয়েছে। নেননি বাবু? বলুন তো একবার।

একটু পরে কাঁচুমাচু মুখে ফালতু রাজি হল।—লিখুন তাহলে। ফালতুই লিখুন।

—ফালতু! হাসলেন উভয় বাবুই। ওটা নিশ্চই ডাকনাম? আসল নাম বল।

মেয়েটা হেসে খুন হল। চায়ে দুধ ঢালতে গিয়ে উনুনে পড়ে গন্ধে উঠল। ফালতু গোঁ ধরে বলল—আসল নকল জানি না সার, ফালতু আমার নাম। লিখতে হয় লিখুন, নয় বাদ দিন।

—বেশ, ফালতু। হুঁ বয়স?

—বিশ-পঁচিশ হবে।

আবার হাসি উঠল অন্নপূর্ণা টি স্টলে।—বিশ, না পঁচিশ?

—যা মনে হয় লিখুন! ফালতু বিরক্ত হয়ে বলল।

—মাঝামাঝি লিখছি। বাইশ। কেমন? জাতি কী ভাই?

একটু চুপ করে থাকার পর ফালতু বলল—হিন্দুই লিখুন।

—বাবার নাম?

হঠাৎ বজ্রাঘাত। জগন্নাথ মেকদারের হাসিখুশি মেয়েটা শক্ত হয়ে গেল। আড়চোখের বাঁকানো দৃষ্টি ফালতুর গায়ে গিয়ে পড়ছে। হঠাৎ রানীরঘাট নিঃঝুম। ঝড়ের আগে যখন পাতাটিও গাছে নড়ে না। খালি বাজ পড়ার শব্দ।

—বল ভাই!

ফালতু বেঞ্চের কোণায় সিগারেট ঘষটে নেভাল। তারপর বলল—মায়ের নাম লিখুন সুরিখেপী। তাহলেই হবে।

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল জগন্নাথ মেকদারের মেয়ে।—না। সুরেশ্বরী লিখুন। বাবা বলত খেপীমার নাম সুরেশ্বরী। উইখানে থাকত—মাথায় জটা! আমি দেখিনি। বাবা দেখেছে। ঘাটের কত লোক দেখেছে। গঙ্গাপুজোর সময় নাকি ভর হত। লোকেরা মানত করত।.....

সবাই গম্ভীর। তারপর আস্তে বললেন দ্বিতীয়বাবু—হুঁ, অজ্ঞাত। এবার বল, বাড়িতে কে আছে। কখানা ঘর। পোষা জীবজন্তু আছে কি না। বাড়ির গার্জেন থাকলে তার নাম কী....

প্রথমবাবু বললেন—ট্রেন চালিও না। একে একে জিগ্যেস করো।

ফালতু উঠে দাঁড়াল। বলল—বাড়িটাড়ি নেই। থাকি মোটরআপিসে। তারপর চলে গেল।

বাবুরা চা খাচ্ছেন। তখন গঙ্গার নেয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে মেয়ের বাবা জগন্নাথ এসে গেল। কোমরে বরাবর বাত। এখন শরীর দু'ভাঁজ হয়ে গেছে। কোমর থেকে মাথা অব্দি মাটির সমান্তরাল। তাই হাঁটলে হাত দুটো উড়ন্ত শকুনের ডানার মত দুপাশে ছটপট করে। এখন একহাতে ঘটি। ঘটিতে গঙ্গাজল। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে সেই হাতটা ঝুলে স্বাভাবিক হয়েছিল। কিন্তু ঘটি রাখতেই আবার যে-কে সেই। সেন্সাসের বাবুদের চা খেতে দেখে খুশি হল। টুকটুকি ঠোঁটের কোণায় হেসে বলল—ফালতুদার নাম লিখে নিয়েছে বাবা। আমিই বললুম তো লিখতে। বাদ পড়ে যেত কেমন!

জগন্নাথ হাসল।—তোর যেন দিদির স্বভাব। বুঝলেন স্যার? সেবারে আপনারা আসেননি। অন্য দুজন এসেছিলেন। আপনাদের চেয়ে বয়স অনেক কম। দিদি থাকত ওই যে ভিটে দেখছেন, ওখানে। ওই ফালতুর মায়ের নাম লিখিয়েছিল। খুব ভালবাসত মেয়েটাকে!

কথার কথা হিসেবে প্রথমবাবু বললেন—কাকে?

—সুরিখেপীকে। মানে ফালতুর মা। জগন্নাথ রোদে দাঁড়িয়ে পুঁথি খুলল। পুঁথিতে অল্পবিস্তর রঙ চড়বেই। তাই—কোন জাত না কোন জাত মানামানি নেই। দিদি ঘাটে ফেলে মেয়েটাকে রগড়াত। কী ভাল না বাসত স্যার! ঘাটের অনেকে জানে। দেখেছেও, যারা ছিল তখন। আমার দিদি মুরুক্ষু মেয়ে হলে কী হবে, প্রাণটা ছিল বড়। ফালতুর জন্মের রাতে কী বিষ্টি কী মেঘ! পেলয়ঙ্কর চলছে। তার মধ্যে দিদি কাঠ রে আগুন রে সেঁকা রে পোড়া রে, আপনার মশাই লণ্ঠন রে করে রানীরঘাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে! আজকাল আর অমন মানুষ হয় না স্যার! তো ফালতু এখন মানুষ হয়েছে। এ লাইনে খুব পাকা ড্রাইভার। ও জানেই না এসব কথা। কে ওর চোখে কাজল পরিয়ে, গায়ে তেল মাখিয়ে রোদে বসে থাকত জিগ্যেস করুন, বলতে পারবে না।

সেন্সারের বাবুদ্বয়ের অত সময় নেই। শহরে শিক্ষকতা করেন। স্কুলের সময় হয়ে গেল। উঠে গেলেন পয়সা দিয়ে। জগন্নাথ একটু বেজারই হল। এক সময় সুরিখেপীর বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারটা রানীরঘাটের মনমেজাজ চাঙ্গা রাখত। কার না মনে পড়ে সে-সব দিন? ফিস্টি। গানের আসর। সুরিখেপীর ঘর গড়ার দিন কত হইচই স্ফূর্তি। যে আসছে, সেই হাত লাগাচ্ছে। জগন্নাথ কত কাপ চা খাইয়েছিল হিসেব নেই। আজকাল সবাই কেমন যেন হয়ে গেছে। ফালতু তখন মোটেই ফালতু ছিল না। এখন ফালতু তো বটে, মানুষই যেন ফালতু হয়ে গেছে। ঘাটোয়ারিজি একটা লাল হাপপেন্টুল দিয়ে ফালতুকে বলেছিলেন —যেদিন বাবা বলা ছাড়বি, সেদিন থেকে রোজ একপো করে রসগোল্লা। ফালতু ছাড়তেই পারেনি। ও বাবা, তোমার পাখিটা দাও না! ও বাবা, আমি খৈনি খাব। ও বাবা, দুটো পয়সা দাও। হুঁ, ফুক্কুরে লোকেরা শিখিয়ে দিত ছোঁড়াটাকে। ঘাটোয়ারিজিকে নাকাল করে ছাড়ত। শুধু ঘাটোয়ারিজি কেন, জগন্নাথের ওপরও লেলিয়ে দিত না? একবার অশ্বিনী দারোগা এসেছেন ঘাটে। কে লেলিয়ে দিয়েছে ফালতুকে। ফালতু দারোগাবাবুর হাফপেন্টুল খামচে ধরে বলে—ও বাবা, সাইকেল চাপব। বাবা, সাইকেল চাপব! দারোগাবাবু বললেন—এটা সেই পাগলীর বাচ্চাটা না? আহা! রানীরঘাটে সে এক দিনকাল ছিল! দুঁদে দারোগা হো হো করে হেসে সাইকেলের রডে চাপিয়ে সত্যি একচক্কর ঘুরিয়ে দিলেন! নামিয়ে দুআনা পয়সাও দিলেন। বললেন—কী রে ছোঁড়া? আমার সঙ্গে যাবি? আমার বাড়িতে থাকবি। লেখাপড়া শেখাব। অ্যাঁ? যাবি?

সেদিন ফালতু গেলে ভালই করত। রানীরঘাটের লোকগুলো যেন ছোঁড়াটার মায়ায় পড়ে গিয়েছিল। ও গেলে যেন ঘাট ফাঁকা হয়ে যাবে। এক ফাঁকে শম্ভু মাঝি ডাকল—আয়

রে! লৌকোয় চাপবি! ফালতু চলে সঙ্গে সঙ্গে। দারোগাবাবু সাইকেলে চেপে গেলেন আসামী ধরতে কনকপাড়া গোপগাঁ।.....

তবে ছোঁড়াটার লোভ ছিল না কিছুতে। দিদি একখানা বেগনি হাতে দিলে তো প্রায় সারাদিন ধরে তাই কুচ কুচ করে দাঁতে কেটে খাবে। দিদি ওদের মা-ব্যাটার মত যত্ন করত! এখন ভাবলে অবাক লাগে। কেন এমন করত দিদি? কেন কেন করতে করতে জগন্নাথের শীতটা গেল বেড়ে। তোবড়ানো মুখে ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকল।

—বাবা, আমি আসছি।

জগন্নাথ তাকায় মেয়ের দিকে।—নাও! মাথায় পোকা কামড়াল! খদ্দেরপাতি আসবে-টাসবে।

—তুমি দেখ না ততক্ষণ! মরতে তো যাচ্ছি না!

লম্বা পা ফেলে টুকটুকি বাসস্ট্যান্ডের ওপাশে চলে গেল। মা-মরা মেয়ে নিজের জোরে বড় হয়েছে। বাড়টা বড্ড বেশি। ঘাটসুদ্ধু লোক তার কুটুম্ব। মামা খুড়ো কাকা মামী খুড়ি কাকিমা, দাদা বউদি, আরও কত রকম সম্পর্ক মানুষের থাকে।

বাস সিন্ডিকেটের লক্ষ বাবু ডাকেন—ও টুকটুকি কোথা যাচ্ছিস? টুকটুকি সোজা বলবে—আপনার কনে খুঁজতে দাদামশাই! লক্ষ্মণবাবু দাড়ি চুলকে বলবেন—ওরে, ওরে! তুইই তো আমার কনে। টুকটুকি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলবে—আমার বর যে ঠিক হয়ে আছে দাদামশাই। আহা, আগে বলতে হয়।

আর ওই চৌবেজি। ওকে দেখলেই খৈনি ডলতে ডলতে—'কেমনে হোবো এ গঙ্গা পার/হামি জানে না সাঁতার।'

ঘাটোয়ারিজির লোটা হাতে শিমুলতলায় দাঁড়িয়েছিলেন। কানে পৈতে জড়ানো। হাতমাটি করা হয়ে গেছে। মোছা হয়নি। নির্মীয়মাণ ব্রিজ দেখছেন। দেখতে দেখতে ঘুরলেন ডাইনে বাঁশবনের দিকে। আকন্দ ও সাঁইবাবলার ঝাড়ের পিছনে জগন্নাথের মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। হাতমুখ নেড়ে কথা বলছে কার সঙ্গে। একটু সরলে ঘাটোয়ারিজি অবাক। ওটা ফালতু না? চোখের নজর ইদানীং কমেছে। তাহলেও চিনতে ভুল হল না। হেঁড়ে গলা কাঁপা-কাপা সুরে গেয়ে উঠলেন—'কেমনে হোবো এ গঙ্গা পার....' টুকটুকি হনহন করে চলে গেল গঙ্গার আঘাটায়। ফালতু একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর বাস অফিসের দিকে হাঁটল। চৌবেজি খুব হাসলেন। কতক্ষণ আপনমনে হাসলেন। হাসার পর গম্ভীর হয়ে গেলেন। মন খারাপ হয়ে গেল।

—টুকটুকি! ও রী টুকটুকী! শুন, শুন! ইধার আ।

—বলো ঘাটোয়ারিজি। যা বলার ঝটপট বল, আমার শোনার সময় নেই।

—আ রী বৈঠবি, তব তো বোলবে।

—হুঁ, বসলুম, বল।

—হাঁ, রী। এত্তো কী ফুসুর-ফাসুর কোরে বেড়াস ফালতুর সঙ্গে?

টুকটুকি মুঠো পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—মারব! তারপর কান্নার ভান করে—হুঁ, মাগো! এবং আবার মুঠো তুলে—মারব!

চৌবেজী নির্লজ্জের মতো ফিসফিস করলেন—সাচ বলছি রী বেটি। বাত তো শুন।

—শুনব না! চিলচ্যাঁচানি চেঁচাল জগন্নাথের মেয়ে।

—পাগলী বেটি! বোল বিভা করবি তো বোল হামাকে। হামি লাগিয়ে দেবে! চৌবেজি চাপা স্বরে বলতে থাকলেন। আরী! হামি তো ঘাট ছেড়ে চলেই যাব। তোদের বিভা দেখে যাই। এত্তোকাল ঘাটে থেকে বুঢ়া হোয়ে গেল। হামার বহৎ সুখ হোবে, বেটি! বহৎ ধুমধাড়াক্কা লাগিয়ে দেব।

টুকটুকি ভেংচি কেটে পালিয়ে গেল। তারপর থেকে তারও মন খারাপ। চৌবেজিকে দেখলে সেখান থেকে কেটে পড়ে। জগন্নাথ তাকে ওপারে শহরে পাঠালে সে আঘাটায় জল ভেঙে চলে যায়। শীত যত যায়, জল তত শুকোয়। বালির চড়ায় মাথা কোটে। ওদিকে ঘাটের সামনে বারোমাস দহ। ফালতুকে বিয়ে করলে ঘাটোয়ারিজির কেন সুখ হবে, টুকটুকি বোঝে না। শীত ফুরিয়ে বসন্ত এল। রানীরঘাটের বনভূমি সাধ্যমতো সাজাল। এবার নিষ্পত্র ঢ্যাঙা শিমুল শ্মশানে দাঁড়িয়ে রইল কিংবদন্তীর সেই রাহুচন্ডাল। ভাগীরথীর বুকে ঘূর্ণি ঘুরে বেড়ায়। ভূতেরা নাইকুন্ডল খোঁজে আপন-আপন। নাইতে গিয়ে টুকটুকি চেঁচায়—গরু খা, গরু খা, গরু খা! সেই সময় একদিন শম্ভু মাঝি থপথপ করে হেঁটে ফালতুর কাছে এল।

—কেমন আছিস বাপ ফালতু?

খাতির করে সিগ্রেট দিয়ে ফালতু বলল—ভাল আছি শম্ভুকাকা। তুমি ভাল তো?

রানীরঘাটের সবচেয়ে বড় আর বুড়ো শিরীষগাছের তলায় ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল শম্ভু মাঝি। —বাপ ফালতু রে!

—বল কাকা!

শম্ভু মাঝি হঠাৎ গামছার খুঁটে চোখ মুখে বলল—জোয়ান হয়েছ। বড় হয়েছ। ভাল রোজগারপতি করছ।

—তা করছি কাকা! ফালতু অকৃতজ্ঞ নয়। রানীরঘাটের এসব লোকই তাকে মানুষ করেছে, সে জানে। সবাইকে শ্রদ্ধাভক্তি করে চলে।

এবারে বিয়েটিয়ে করে ফেলো বাপ। আর কদিন আছি? ঘাটও তো উঠে যাচ্ছে। তোমার বিয়েটা দেখেই যাই!

ফালতু হাসল। —আমাকে কে মেয়ে দেবে শম্ভুকাকা?

বুড়ো ঘাটমাঝি তার গায়ে হাত বুলোতে থাকল। লগিধরা কড়া-পড়া হাত। লোলচর্ম বহু। গোঁফ ছাপিয়ে জল ঝরছে। কী স্নেহে কোন মায়ায় কাঁদে এতদিন বাদে, কে বলতে পারে সে গুহ্য কথা? —যদি ইচ্ছে কর, জগাইকে বলি। লজ্জা করে কী হবে? ঘাটে তো সবাই জেনেছে, তোমাদের বড্ড মনামনি ভাব। বুড়ো ঘাটমাঝি ফ্যাঁচ করে নাকই ঝেড়ে ফেলল, এমন আবেগ এসেছে!

ফালতু হো হো করে হেসে উঠল।—ধ্যাৎ। আমাকে কেন মেয়ে দেবে? কাকার আবার কথা!

শম্ভু গম্ভীর হয়ে বলল—দেবে। দিয়ে বর্তে যাবে। আমরা ঘাটসুদ্ধ গিয়ে ধরব। ঘাটোয়ারিজি বলেছেন, সবাই মিলে ফালতুর বিয়ে দেব। খরচ যা লাগে তিন ভাগ ওনার। খুব ধুমধাম হবে বইকি।.....

সেদিনই একটু রাত গড়ালে চৌবেজির গদীতে সভা বসেছে। পুরনো লোকেরা সবাই এল। জগন্নাথকেও ডাকা হল। সে-বেচারা কিছুই জানে না। দু হাত দু পাশে ছড়িয়ে শকুনের ডানার মতো ঝটপট করতে করতে কুঁজো হয়ে এল। এসেই অবাক। তার খাতিরটা বড্ড বেশি করা হচ্ছে। ধরাধরি করে তাকে উঁচু গদীতে উঠিয়ে দিল লোকেরা। মদন কন্ডাক্টর এখন চুলপাকার দলে। ফালতুর ব্যাপারে সেই বরাবর লিড নিয়েছে। এবারও নিল। চৌবেজির দিকে তাকিয়ে বলল—তাহলে কথাটা উঠুক খাঁটোয়ারিজি! সবাই সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। চৌবেজি বললে—জরুর!

মদন শুরু করল। ফালতুর মা সুরিখেপী থেকেই শুরু করল। ফালতুকে মানুষ করার ইতিবৃত্তি, ফালতু চালচলন, ইসমাইল ড্রাইভারের স্নেহ (আহা, এখন সে বেঁচে থাকলে কত খুশি হত, এবং কয়েকটি জিভের চুকচুক শব্দ, মাথা নাড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ), খুঁটিনাটি ঘটনা, অশ্বিনী দারোগার আহ্বান (খুব হাসির রোল পড়ে গেল এইতে), ফালতুর দুষ্টুমি—আধঘণ্টারও বেশি। তার সঙ্গে রানীরঘাটেরও নানা ঘটনা জুড়ে দেওয়া হল চারপাশ থেকে। ব্রিজও এল। রানীরঘাটের অনিবার্য মৃত্যুর প্রসঙ্গও উঠল। (দীর্ঘশ্বাস ও নীরবতা) তারপর জগন্নাথের দিদি—যাকে সবাই বলত ময়রামাসি, তার কথা—এ পাপে রানীরঘাট একদিন ভেসে যাবে! তাই যাচ্ছে। আগের দিনের মানুষেরা যা বলত, ফলে যেত!

এই সময় চৌবেজি মানুষের লোভকেই দায়ী করলেন। তুলসীদাস আওড়ে বললেন—'সেবক সুখ চহ মান ভিখারী/বাসনী ধন সুভ গতি বিভিচারী/লোভী জুন চহ চার গুমানী/নভ দুহি দুধ চহত এ প্রাণী।' মানুষ আকাশ দুহে দুধ চায়! হায়রে লোভ!

জগন্নাথ খুব মাথা নাড়ল। মদন কন্ডাক্টর বলল—তো কথা হচ্ছে, ময়রামাসির কাছে শোনা কথা, (স্রেফ মিথ্যে কিন্তু) সুরিখেপী মাসির আগের চেনাজানা ছিল। মাসির স্বজাতিরই মেয়ে। স্বামীর অত্যাচারে....

এ পর্যন্ত শুনেই জগন্নাথ জোরে মাথা নেড়ে বলল—না! না!

শম্ভু মাঝি একটু তফাতে মাটিতে বসে ছিল। বলল—আহা, বলতেই দাও জগাইদা।

মদন একটু হেসে বলল—মাসি আমাকে বলেছিল। সত্যমিথ্যে সেই জানত। আমি যা শুনেছি বলছি। আর স্বজাতি না হলে অমন সেবাযত্ন করত? বলুন সবাই! না কি ঘাটোয়ারিজি? বলুন।

সবাই শোরগোল তুলে বলল—ঠিক ঠিক। বেজাত হলে অমন করবে কেন?

জগন্নাথ গতিক বুঝে গুম হয়ে বলল—হলেও হতে পারে তাহলে।

মদন বলল—আমরা রানীরঘাটওয়ালারা ছেলেটাকে মানুষ করেছি। এখন লায়েক হয়েছে। ভাল কামাচ্ছে। লাইনের নামকরা ড্রাইভার। না হয় লেখাপড়াটাই ভুল করে আমরা শেখাইনি। তাতে কী? যে বিদ্যে ধরেছে, তাই বা মন্দ কী! বইপড়াও বিদ্যা, গাড়ি চালানোও বিদ্যা।

সবাই সায় দিয়ে বললে—একশোবার একশোবার।

মদন বলল—এখন তাহলে ওর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার। ওর মা-বাবা নেই তো কী হয়েছে। আমারই ওর মা-বাবা। আমরাই ওর বিয়ে দেব। চৌবেজি আপনাকে তিন ভাগ খরচ দিতে হবে। বাকি এক ভাগ আমরা দেব। কী বলো জগাইদা?

আগে থেকে সাজানো ব্যাপার। জগন্নাথ না জেনে বলল—নিশ্চয় দেব।

এবার মদন আচমকা পর্দা তুলল।—ফালতুর স্বজাতের কনে রানীরঘাটেই আছে—উপযুক্ত কনে। মদন হেসে বলল। না কী চৌবেজি?

—জরুর।

মদন গলা ঝেড়ে বলল—আমরা সবাই জানি। সকালসন্ধে দেখছি ওদের দুটিতে খুব ভাব-ভালোবাসা। আমরা এখন বাকিটুকু ছেড়ে দিলুম কনের বাপের হাতে।....বলেই সে চতুর হেসে জগন্নাথের কাঁধে ডান হাতটা রেখে সহাস্যে বলে উঠল—বলো জগাইদা!

আর যায় কোথায়? কুঁজো বুড়ো নড়বড় করে প্রায় ঝাঁপ দিলে নিচে। তোবড়ানো মুখখানা যতটা পারে ভয়ঙ্কর করে চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল—ন্না! আবার ডানা ঝটপট করে গদীর দিকে ঘুরে গর্জন করল। —না! কক্ষনো না!

শোরগোল শুরু হল। সবাই ওকে বোঝাতে চায়। জগন্নাথের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। কাকুতিমিনতি কতরকম। সাধ্যসাধনা। জগন্নাথ দু হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে মাথাটা দুপাশে জোর দোলাতে বলল—না না না! না না না! না না না....

বুড়ো মানুষ অমন করে কাঁদলে বড্ড খারাপ লাগে। যেন জবাই করা হচ্ছে ওকে। অদ্ভুত লোক তো! দেখব কী দিয়ে বর জোটে মেয়ের।.....

তখন ফরাক্কার ফিডার ক্যানেল খোঁড়া হয়নি। বসন্তের শুরুতেই ভাগীরথীর জল শুকিয়ে যেত। জ্যোৎস্নারাতে বালির চড়ায় বসে যুবক-যুবতীদের চমৎকার প্রেম জমত। ওপারে শহরে বিদ্যুৎ, এপারে রানীরঘাটে বিদ্যুৎ—ভাগীরথীর গর্ভে সে আলো পৌঁছয় না। জ্যোৎস্নাটা ভালই খেলে। রানীরঘাটের নিচে অবশ্যি কিছুটা দহ। দক্ষিণে শ্মশানের ওদিকটায় প্রায় সবই শুকনো, একখানে সেই মাথা কুটতে থাকা জল ঝিলমিল করে বয়ে যায়। ফুরফুরে বাতাসে গা শিরশির করে। দুটিতে বসে অনুচ্চ স্বরে কথা বলছিল।

—ঘাটে কিসের মিটিঙ ডেকেছে। গেলে না যে?

—আমাকে ডাকেইনি।

—ডাকবে আবার কী? তুমি ঘাটের লোক নও?

—নাঃ। আমি ফালতু।

—শোন, তুমি এবারে একটা নাম নাও। ভাল নাম।

—তুমিই দাও না একটা নাম।

—নেবে?

—হুঁউ।

—আগে জানলে ওই গুণতিবাবুদের কাছে....আচ্ছা, ওরা আর লোক গুণতে আসবে না?

—কে জানে? কী নাম দিচ্ছ, দাও আগে।

—দিচ্ছি। নতুন বাসমোটর কবে আসবে তোমার?

—ব্রিজ খুলুক। কেন?

—প্রথম—একেবারে প্রথম পেসেঞ্জার আমি। ভাড়া দেব না কিন্তু। চাপাবে?

—হুঁউ।

—তখন থাকবে কোথায়?

—ওপারে নতুন আপিস হচ্ছে না? সেখানে। আমার থাকার ঘরও হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে আবার—বাবা ওখানে জায়গাই পেল না। লক্ষণ দাদামশাইকে বলতে বলেছিল বাবা। বলেছি তো। সে কথা নেই, শুধু দেখলেই ফক্কুরি করে। তুমি বলবে একবার?

—বড় মুখ করে বললে যখন বলব।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর—গুণতিবাবুদের কাছে তুমি বাবার নাম বললে না। আমার খুব খারাপ লাগছিল, জান? যা হোক একটা বলতেই পারতে! কী ভাবল ওরা?

—কী ভাববে? বয়ে গেল।

—যাঃ বাবা না থাকলে চলে? বাবা না থাকলে....

—কী?

—আমার লজ্জা করছে। তুমি হয়ত রেগে কাঁই হয়ে যাবে।

—না, না। বলই না!

—থাক। তোমার বাবার কথা জানতে ইচ্ছে করে না?

জোরে মাথা দোলাল এবং জ্যোৎস্নামাখা বালিতে আঁচড় কাটতে থাকল প্রেমিক যুবক। গায়ে ছায়া ফেলে উড়ে গেল একঝাঁক রাতের পাখি। শ্মশানের বাঁশবনে শেয়াল ডেকে উঠল। তার একটু পরে কী একটা শব্দ হল কোথায়। তারপর প্রেমিকা তরুণী উঠে দাঁড়াল ঝটপট। অস্ফুট স্বরে বলল—কে যেন আসছে! আমি যাচ্ছি! এদিকেই আসছে যেন। যাচ্ছি!

ডানা থাকলে উড়ে যেত এভাবে চলে গেল, যেন পা বালি ছোঁয় না। নিঃশব্দে। ফালতু উঠল একটু পরে। সিগারেট ধরাল। আলো দেখেই আওয়াজ এল—কে ওখানে?

ফালতু লম্বা পায়ে এগিয়ে গিয়ে বলল—জগাইকাকা নাকি? আমি ফালতু।

—টুকটুকি কই? হাঁড়ির ভেতর থেকে জগন্নাথ কথা বলল যেন।

একটু দ্বিধা হল। তারপর সেটুকু ঝেড়ে ফেলে বলল কী হয়েছে জগাই কাকা?

জগন্নাথ একটা অদ্ভুত ব্যবহার করল। সে খপ করে ফালতুর হাত দুটো ধরে ফেলল। তারপর মরণকালের ঘড়ঘড় শ্বাসকষ্টের আওয়াজ তুলে বলে উঠল—ফালতু, বাবা! তোর হাত দুটো ধরে বলছি রে, নিশুতি কাল। মা গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে বলছি। ঘাটওলারা ষড়যন্ত্র করেছে, জোর করে তোর সঙ্গে আমার টুকটুকির বিয়ে দেবে। ফালতু রে! আবার বলছি, মা গঙ্গার বুকে দাঁড়িয়ে আছি—ওরে, তোরা ভাইবোন রে! আমি মহা পাপী রে! টুকটুকি আর তুই ভাইবোন—তোদের বিয়ে হয় না রে.....

এক ঝটকায় ফালতু হাত ছাড়িয়ে নিল।

—আমি বলছি বাবা। নিচে মা গঙ্গা, আমি বলছি আমার পাপের কথা।

ফালতু হুঙ্কার দিতে গিয়ে সামলে নিল। সে জানে, সে দুঃখী। লোকের করুণায় বেঁচেছিল। জোর দেখাতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যায়। অমনি চুপসে যায়। আস্তে বলল—

হতে পারে তুমি লম্পট। হতে পারে বইকি। আমার মা আটচালায় থাকত আর তোমরা রানীরঘাটওলারা....থাক সে কথা। এখন বয়েস হয়েছে তো। বুঝতে পারি সব। কেন আমাকে মানুষ করা, সবই বুঝি।

জগন্নাথ ফ্যাঁচ করে নাক ঝেড়ে পাছায় হাত মোছে। ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও করে কুডাক ডাকতে ডাকতে একটা পেঁচা উড়ে যায় শ্মশানের পাশে শিমুল গাছটার দিকে। কোত্থেকে একটা সাদা কুকুর এসে একটু দাঁড়িয়ে একবার কেঁউ করে ডেকেই চুপ করে যায়। লেজ নাড়ে। জ্যোৎস্নায় নিজের ছায়া শোঁকে একবার।

ফালতু আবার বলতে থাকে—আজ পারুলিয়ার নতুন রুটে গাড়ি খারাপ হয়েছিল। মিস্ত্রি ডাকতে পাঠালুম। মাথায় টুপিপরা, সাদা দাড়ি মুখে, এক মুসলমান হাজিসায়েব এল। চিনলেও চিনবে। ইব্রাহিম হাজি নাম বলল।

ভাঙা গলায় জগন্নাথ বলে—হ্যাঁ। ডাকাত ছিল। পরে তীর্থ করে হাজি হয়েছে। খুব চিনি বাবা, কে না চেনে! খুনের মামলায় জেল হয়েছিল যাবজ্জীবন। তাও জানি।

—কথায়-কথায় বলল, ঘাটে এক পাগলী থাকত—সে বেঁচে আছে, না মারা গেছে? বললুম, মারা গেছে। আমি তারই ছেলে। শুনেই লোকটা আমাকে জড়িয়ে ধরল। তুমি তারই ছেলে বাবা? আমি তো অবাক। এমন কেন করছে লোকটা? তারপর কিছুতেই আসতে দেবে না। প্যাসেঞ্জার আছে গাড়ি ভর্তি। শোনে না। মিষ্টির দোকানে নিয়ে গেল। বলে—আবার ব্যাটাকে পেট ভরে রসগোল্লা খাইয়ে দাও। আমার কেমন যেন লাগল। আমি খেতে পারলুম না। সে আমাকে ছাড়বে না। জড়িয়ে ধরে টানাটানি। বলে, আশ্বিন মাসে ঝড়জলের রাতে.....

এ পর্যন্ত শুনেই জগন্নাথ বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। রাতটুকু ওপারে মোক্তারবাবুর বাড়িতে লুকিয়ে থেকে পরদিন আদালতে হাজির হত। অত রাতে তখন খেয়া বন্ধ। শম্ভু গাঁজা খেয়ে মড়া। এদিকে ঝড়জল। ইব্রাহিম আমাকে জায়গা চাইল। খুনী ফেরারকে জেনেশুনে জায়গা দিতে পারলুম না। বললুম, আটচালায় গিয়ে থাক বরং।

ফালতু সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল জোরে। সাদা কুকুরটা দৌড়ে গিয়ে শুঁকল এবং ছ্যাঁকা খেয়ে ফোৎ ফোৎ করে নাক ঝাড়তে থাকল। —এতকাল পরে ওর খেয়াল হল সুরিখেপীর কথা। ফালতু দম-আটকানো গলায় বলে উঠল।—ওই ছাতুখোর ঘাটোয়ারি! ওই মাতাল মদন কন্ডাক্টার! আবার দেখি জগাইকাকা তুমি! তুমি আরও এককাঠি সরেস। কী না টুকটুকি আর আমি ভাইবোন। এবার ফালতু গর্জন কিংবা হাহাকার করে উঠল। —কী বাবা দেখাচ্ছ আমাকে সবাই মিলে? রানীরঘাটের মড়াখেকো শেয়ালকুকুরগুলো ফালতুকে বাবা দেখাচ্ছে। আমার বাবার দরকার নেই। হুঁ, বাবা দেখাচ্ছে শালারা! আরে, আমার হাতে যে স্টিয়ারিং ধরে দিয়েছে, সেই আমার বাবা।......

ময়রা মাসি বলেছিল—এ মহাপাপ সইবে না। রানীরঘাট ভেসে যাবে। শেষ অবধি তাই ফলে গেছে। এখন ভাগীরথীর ওপর বিশাল ব্রিজ হয়েছে। ফরাক্কার ফিডার খাল থেকে জল আসছে। বারো মাস নদী কূলে-কূলে ভরা। সেই কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ কাজল জল আর নেই। শ্যাওলার গা ঘষে বেড়ানো রূপসী মৌরালার ঝাঁকও আর দেখা যায় না। রোদে-জ্যোৎস্নায় বুকের তলার রূপোলি বালুকণাও আর অলীক মুক্তোর ঝিলিক দেয় না। চৌবেজির গদী, আটচালা, জগন্নাথের অন্নপূর্ণা টি স্টল জুড়ে আকন্দ সাঁইবাবলা কালকাসুন্দে আর বনতুলসীর জঙ্গল। সুরিখেপীর 'থানে', বাস স্ট্যান্ডের চত্বরে, হরেকরঙা গাঁদা ফুলের ঝাড়। এক সাধু এসে আশ্রম খুলেছেন। পিচের রাস্তায় কবে কারা ধানচাষ

করেই ফেলবে। বিদ্যুতের শালকাঠের খুঁটি যে যা পেরেছে, উপড়ে নিয়ে গেছে। শুধু ঘাট আর শ্মশানের মাঝামাঝি জায়গায় সেই রাহুচণ্ডাল শিমুলটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এখনও মাঘ মাসে সে মাথায় লাল পট্টি জড়াতে ভুল করে না।......

ওই একটু দূরে ষাটসত্তর ফুট উঁচু পুলের ওপর দিয়ে ঝকঝকে এক রূপোলি বাস যাচ্ছে পুরন্দরপুর মনসুরগঞ্জো বিনোটি মহিমাপুর। ড্রাইভারটি মধ্যবয়সী। সারা পথ দুধারে যত গ্রাম আছে, যত মানুষ আছে সবার কাছে তার মোটরগাড়ি সময় জানিয়ে দেয়। খেতের মুনিশ বলে ওঠে, ফালতুর গাড়ি গেল। নাস্তা এল কই? স্ল্যাবে ধানশুকোতে দেওয়া চাষীবউ, ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়েটা, খুঁটি ও দুরমুষ হাতে গাইগরু বাঁধতে আসা বুড়ি—কার সঙ্গে না কথা বলে যাবে সে! গাড়ির গতি কমিয়ে বলে যাবে—বোনটি ভাল আছ তো? ও বুড়ীমা, কাল দেখিনি কেন? ও বউঠান, মাছ রেখ তো চাট্টিখানি—ফেরার সময় নিয়ে যাব। ওরা বলবে—ফালতুদার খবর ভাল তো? বাবা ফালতু, দুটো মাথাধরার বড়ি এনে দিস বাবা, আমার সোনার বাবা! বিনোটির মাস্টারমশাই স্কুল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে বলবেন—ফালতু! প্রেসক্রিপশানটা নিয়ে যা বাবা! এই নে টাকা। বেশি লাগলে দিস, দোব'খন।

ফালতু এখনও ফালতু নামেই থেকে গেছে। যে তাকে নতুন নাম দিতে চেয়েছিল, রানীরঘাটের জগন্নাথের মেয়েটা, তার মত নির্বোধ আর কেই বা ছিল! বাপ যেই না বলা, তোরা ভাইবোন—হতভাগী আপন দাদার সঙ্গে জ্যোৎস্না রাতে মা গঙ্গার বুকে শুয়েছে, এই তীব্র পাপবোধে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি। বিষাক্ত করবী ফল, কেউ বলে ধুতরো, শিলে বেটে গিলে ফেলেছিল। বাপ কোন মতলবে কী বলেছে বুঝবি তো তলিয়ে!

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ফালতুর রাগ হয়। স্পিড বাড়ায়। পৃথিবীকে চাকার তলায় মাড়িয়ে শোধ নেয়।

আক্রান্ত

তিন ডেসিমেল প্লট। মোটামুটি চৌকো। এককোণায় একটু খাঁজ। পৌর নর্দমার পচা জল মাটিকেও পচিয়ে দিয়েছে। তাই ওই ক্ষয়ের দাগ। দিলওয়ার হোসেন ক্ষয়টির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিল। শ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে। বলেছিল 'এখানটা...'

'সামান্য ব্যাপার।' হাসুমিয়াঁ দালাল তাকে থামিয়ে দিয়েছিল। 'ওই দেখুন কত্তো ইট। বাঁধিয়ে ভরাট করে নেবেন। আজকাল এক ইঞ্চি মাটির দাম হিসেব করলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

কিন্তু মাথা খারাপ করার আরও একটা জিনিস ছিল। সীমানার কাছে একটা পুরনো ইটের কবর। তার ওপর একটা ডালিম গাছ। কবরটার কথা বলতে গিয়ে দিলওয়ার হোসেন বলে ফেলেছিল, 'বাঁজা, না ফল ধরে?' কবরটা ডালিমগাছ হয়ে গিয়েছিল।

দালাল হেসে কুঁজো। 'কথাটা আপনিও জানেন মাস্টারসায়েব! সবুরে মেওয়া ফলে। ফলবে। সবকিছুর সিজন আছে।' সে মক্কেলকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল, যেদিকটাতে দু'ঘরের ছোট্ট বাড়ি। ইটের দেয়াল, অ্যাজবেস্টসের চাল। একটুকরো বারান্দা। ফাটলে শ্যাওলা, অবিশ্বাস্য ঘাস। 'মেরামত করলেই ফিটফাট নতুন। আসুন, ভেতরটা দেখাই।' বলে বারান্দায় পৌঁছে মুখে ও গলায় রহস্য এনে ফিসফিস করেছিল। 'সময়মত ভেঙে দোতলা বানাবেন। মাছের তেলে মাছভাজা, বুঝলেন তো? একতলার আগাম সেলামির টাকায়....আজকাল যা হচ্ছে। সে ভাববেন না। আমি জুটিয়ে দেব।' সে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি হাসছিল। খুব হাসতে পারে হাসুমিয়াঁ। অথবা ঘরবাড়ি জমিজায়গার দালালদের এরকম হাসতে হয়।

কিন্তু ডালিমগাছটা মাথায় ঢুকে গেল দিলওয়ার হোসেনের। অথবা কবরটাই ওই প্রতীক হয়ে সেঁটে রইল। মালিক এক হিন্দু ভদ্রলোক। কাঠগোলার কারবারি। শহরের এই সম্পত্তি এবং মহল্লাটি মুসলমানের, দুটোই চিন্তাযোগ্য। আর চিন্তাযোগ্য বিষয় একটা কবর।

তহমিনা বেগমও স্বামীর মত স্কুল টিচার। বাসে চেপে পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামের বা গ্রামনগরীর স্কুলে যাতায়াত করে। খুঁটিনাটি জেনে বলল, কবর, তাতে কী? আমাদের বাড়ির উঠোনেই দাদিমার কবর ছিল। পরে পাঁচিল তুলে পার্টিশন করে দিয়েছিল........ও কিছু না। নিয়ে নাও।'

'তুমি দেখবে না একবার? দিলওয়ার হোসেন একটু অবাক হল।

'দেখার কী আছে?' সহজভাবে কথাটি বলল তহমিনা বেগম। 'মাটির যা অবস্থা আজকাল। পা রাখার জায়গা নেই কোথাও।'

অবিকল দালাল হাসুমিয়াঁর কণ্ঠস্বর। অবশ্য দিলওয়ার হোসেন জানে, তার বউ সব কিছুতে এমন শীতল। সহজে মেনে নেয় সব কিছুই স্কুলে কিছু ঘটলেও। এমনকি, একদা দিদিমণিদের মধ্যে একটা হাতাহাতি বা চুলোচুলির ঘটনাও না হেসে শীতলতার বর্ণনা করেছিল। দিলওয়ার হোসেন ভাবে, হয়ত এ এক ধরনের শক্তি।

চিন্তিত দিলওয়ার হোসেন একটু পরে বলল, 'কবরটাতে একটা ডালিমগাছ আছে।'

‘ভালই তো!’ তহমিনা বেগম স্কুলের শাড়ি স্বামীর সামনে বদলে নিচ্ছিল। একটা মাত্র ঘর। অন্যায়রকমের ভাড়া। তবু পাওয়া গেছে, সৌভাগ্য। যদিও কিছু গোপন ও অনুচ্চারিত বিধিনিষেধ আছে। বাইরের লোকজন ঢোকানো চলবে না, এবং নিষিদ্ধ মাংস-টাংস। তাছাড়া এক বছরের চুক্তি। বাড়ির মালিকের মেয়ে তহমিনা বেগমের এক কলিগ। সেটাই সূত্র। কলিগটি মালিক মাকে সুপারিশ করেছিল, ‘ওদের যা ভাবছ, মোটেও তা নয়। দেখবে একেবারে আমাদের মতই। কথাবার্তা চালচলন।’ শোনা কথা একটা। তবে বাড়িওয়ালা বৃদ্ধা এই দম্পতিকে দেখে এবং কথাবার্তা বলে আশ্বস্ত হন। দিলওয়ার হোসেন বলেছিল ‘গণ্ডগোলটা কালচারের।’ পরে রমলা একদিন চুপিচুপি প্ররোচনা দেয়, ‘মা ওইরকমই। মিনু, কাবাব খাওয়াবে?’ অর্থাৎ সে ওসব মানে না।....

দিলওয়ার হোসেন দ্বিধান্বিত হেসে বলল, তোমার দাদিমার কবরটার মত পার্টিশনের আড়ালে রাখা যায়। কিন্তু....

‘কিন্তু কী? ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তহমিনা চুলে চিরুনি দিল। ‘কিন্তু টিন্তু নয়। এমন চান্স ছাড়লে আর মাথা ভেঙেও পাবে না।’ সে দ্রুততায় চিরুনি টানছিল, যেন এখনই বাইরে যাবে। কিংবা একটা ছটফটানি।

‘না—মানে, কবরটার কথা বলছি।’ দিলওয়ার হোসেন একটা কাগজে স্কেচ করতে থাকল। সে মোটামুটি ছবি আঁকতে জানে। চিত্রকর হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ছেলেবেলায়। এঁকে বলল, এই দেখ পজিশন।’

খাটে স্বামীর পাশে বসে স্কেচটা দেখতে দেখতে তহমিনা বেগম আস্তে বলল, ‘পার্টিশন পরে হবে। এখানে অনেকটা স্পেস, দেখছ? একটু গার্ডেনিং করব। বড্ড ইচ্ছে করে, জানো?’

‘রাতবিরেতে তুমি ভয় পাবে না তো!’ বউয়ের রঙিন ফুলবাগিচার ওপর একটু ছায়া দিল দিলওয়ার হোসেন। ঈষৎ দুষ্টুমি ছিল।

কিন্তু তহমিনা বেগম শীতল কণ্ঠস্বরে বলল, ‘মিলাদ দেব। মৌলবি এনে কোরান পড়াব।’

স্কুল শিক্ষক প্রেমবশে বউকে টানল। ‘কবরে যে আছে, সে যদি আমার মত হয়?’ বলে চুম্বনের চেষ্টা করতেই বাধা পেল। বউ উঠে গিয়ে সুইচ টিপে আলো দিল। চোখ জ্বলে গেল স্কুল শিক্ষকের।

তহমিনা বেগম ঘরের কোণায় কেরোসিন কুকারের কাছে বসল। ‘চা-টা খেয়ে এখনই হাসুমিয়াঁর বাড়ি যাও। ওকে নিয়ে কাঠগোলায় যাবে। বায়না করতে হলে তাও করে এস।’ এই কথাগুলিতে বিস্ময়কর উত্তাপ ছিল, অপ্রত্যাশিত এবং নতুন। অবশ্য শহরে একটি নিজস্ব বাড়ির স্বপ্ন তার আছে, দিলওয়ার হোসেন জানে।.....

এ ভাবেই তিন ডেসিমেল মাটি একটি দু’কামরার নিচু ঘর, একটি জীর্ণ কবর, একটি ডালিমগাছ সমেত কেনা হয়ে যায়। শিক্ষক দম্পতি সেখানে এসে ওঠে। অ্যাজবেস্টসের চালের তলায় সমতল কার্ডবোর্ডের মসৃণ সিলিং একটু আধটু ফাটল মেরামত ও রঙের কাজ পোড়ো বাড়িটিকে বাসযোগ্য এবং সুন্দর করে তোলে। মিলাদ মহফিল, টুপি পরা মুসলিমবৃন্দ এবং মাইক্রোফোনে এক বৃদ্ধ মৌলবীর রাতভোর পুরো কোরানপাঠ তাকে প্রচুর আধ্যাত্মিক শুচিতা ও রক্ষাকবচ দিয়েছিল।

কলিগ রমলাকে এক প্রাকসন্ধ্যায় স্কুল থেকে ফেরার সময় টেনে নিয়ে এল তহমিনা বেগম। তার অঙ্কুরিত ফুল-বাগানটি দেখাল। রমলা কবরটি খুঁজছিল, সে শুনেছিল। 'মিনা, কবর আছে বলেছিলে?' সে দেখতে চাইল।

তার কলিগ দ্বিধাহীন পা বাড়িয়ে বলল, 'ওই তো!'

'বাঃ!'

'কী?'

'ওই গাছটা!'

'ডালিমগাছ!' তহমিনা বেগম উজ্জ্বল মুখে বলল, একটি ঘোষণা। 'এপ্রিলে ফুল ফুটবে। তুমি ডালিমফুল দেখেছ কখনও? অসাধারণ! ফলের কথাও ভাবো!'

রমলা অবাক হয়ে বলল, 'গাছটা তো করবে। সেই ডালিম খাওয়া যাবে?'

হাসল তহমিনা বেগম 'জানি না! আগে তো ধরুক, তখন দেখা যাবে।'

'আচ্ছা শোনো।' রমলা নার্ভাস একটু হাসল।' 'তোমার—তোমাদের ভয় করে না?'

'কিসের ভয়?' বলে তহমিনা বেগম ঠিক করল, তার হিন্দু কলিগকে ব্যাপারটা বোঝানো উচিত। 'মুসলমানদের ভূত-টুত হয় না। কেন জানো? আমরা আত্মাকে বলি রুহ। মৃত্যুর পর রুহ বন্দী থাকে ইল্লিন-সিজ্জিন নামে একটা জায়গায়—কোনও একটা গ্যালাক্সিতে বলতে পারো। সেখানে থাকে। তারপর ডুমস-ডে-তে তাদের রেজারেকশন।

'কিন্তু মামদোভূত ডিকশনারিতে দেখেছি মুসলমানদের প্রেতাত্মা।'

তার কলিগ খুব হাসতে লাগল। 'ভুল ধারণা। এক্কেবারে ভুল। আমাদের ভূত হওয়ার চান্সই নেই।'

'তা হলে তোমরা ভূত মানো না বলছ?' রমলা চার্জ করল। 'কতজনকে দেখেছি, তারা মুসলমান। ভূত মানে।'

তহমিনা বেগম সিরিয়াস হলে বলল, 'ভূতটুত না, জিন। মুসলমানরা জিন মানে।'

'একই কথা।'

'উহুঁ! মানুষ মাটি থেকে তৈরি, আর জিন আগুন থেকে।' তহমিনা বেগম ব্যাখ্যা করতে থাকল। 'আসলে কী হয় জানো? মানুষের মতো কোনও-কোনও দুষ্টু জিনও আছে। তারা পৃথিবীতে এসে দুষ্টুমি করে।'

রমলা সন্দিগ্ধ দৃষ্টে কবরটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধ;রো যদি তেমন কেউ ওখানে ডেরা পাতে?'

তহমিনা বেগম জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ। সে তুমি বুঝবে না। ওটা হয় না। কবর শুধু মানুষদের জন্য রিজার্ভ প্লেস।'

'কিন্তু কবরটা কার?'

'জানি না।' খুব আস্তে কথাটি বলল তার কলিগ। তারপর হাত ধরে টানল। 'এস, ঘরে গিয়ে বসি। ও এখনই এসে যাবে। আজ কী যেন মিটিং আছে।......'

কবরটা কার, ওই গোপন ও অস্বস্তিকর অনুসন্ধিৎসা শিক্ষক দম্পতির মনে থেকে গিয়েছিল। মফস্বল শহরের এদিকটায় মুসলিমমহল্লা। কুটিরশিল্পী, রিকশচালক, ঠিকে মজুর,

কিছু খুদে দোকানদার, আপিস আদালতের বেয়ারা, 'মেহনতি জনগণ' এবং কতিপয় উকিল ও ডাক্তার। যথেচ্ছ বৃক্ষলতার ভেতর ওতপ্রোত, ঠাসাঠাসি, অসম্বন্ধ বাড়িসকল উঁচু বা নিচু। আর প্রহরে-প্রহরে মাইক্রোফোনে আজান। সব সময় নিঝুম পারিপার্শ্বিক হঠাৎ-হঠাৎ এভাবে গর্জন করে জানিয়ে দেয় একটি জোটবদ্ধ অস্তিত্বের স্বকীয়তা। এদিকে অনুসন্ধিৎসাটি খুব ভেতরে ঘাই মারে। কখনও পুরুষটি কখনও স্ত্রীলোকটি চমকে উঠে তাকায়, 'কে ছিলে তুমি? পুরুষ না স্ত্রীলোক?' ডালিমগাছটি শেষ চৈত্রের বাতাসে ছটফট করে। ক্রমে বিন্দু-বিন্দু লালচে ফুলগুলি ফুটতে থাকে। ক্রমে রক্তাক্ত, যন্ত্রণা মনে হয়। কোন কোটি কোটি আলোকবর্ষের দূরত্বে 'ইল্লিন-সিজ্জিনে' একটি মানবাত্মা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে আছে ধ্বংসের দিন রোজ কেয়ামতের প্রতীক্ষায়, যখন সে নিজস্বতা ফিরে পাবে এবং আবার ব্যক্তি উঠবে! তহমিনা বেগমের এরকম চিন্তা হয়। দিলওয়ার হোসেনের অন্যরকম চিন্তাভাবনা। মানুষটি কি দুঃখী ছিল, যার কবর ফাটিয়ে ওই রক্তাক্ত অভ্যুত্থান? আসলে সে একটু রোমান্টিক। জ্যোৎস্নার রাতে তার খুব আশা হয়, সে কাউকে দেখতে পাবে, পরনে সাদা কাফন। সে কিছুতেই ভয় পাবে না। কাছে গিয়ে বলবে, কে তুমি?

খালপোলের ওপর এক বিকেলে দেখা হয়ে গেল হাসুমিয়াঁর সঙ্গে। 'মাস্টার সায়েবের কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?' বলে সে কপালে হাত ঠেকাল। মুখে দালালের মধুর হাসি।

দিলওয়ার হোসেন বলল, 'খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'কিসের?' বলে সে হাতের একটা ভঙ্গি করল, আশ্বাসের। 'ভাববেন না। লোক মুখিয়ে আছে। বাজিয়ে দেখে তবে নিয়ে আসব। ইনশাল্লা! দোতালা বাড়ি করিয়ে দেবই। ওপরতলায় থাকবেন। সিনসিনারি দেখবেন।'

'না, না।' শিক্ষক বিরক্ত হলেন। 'কবরটার কথা বলছি।'

দালাল কাঠের সাঁকো মচমচিয়ে হাসতে লাগল। 'তাই! ও কিছু না। সেই পার্টিশনের সময়কার ব্যাপার! তখন আপনার জন্মই হয়নি। কে এক মিয়াঁসাহেব কালেক্টরিতে চাকরি করতেন। অপশন নিয়ে পাকিস্তানে যান। পরে এসে নারায়ণবাবুর বাবাকে বেচে গেলেন। জোর করে গছিয়ে যাওয়া বলতে পারেন। এ মহল্লায় তখন কেনার লোক নেই। সবাই ভাবছে পপুলেশন-এক্সচেঞ্জ হবে।....না, না। কিছু ভাববেন না।'

দালাল সিগারেট দিল। দিলওয়ার হোসেন কদাচিৎ খায়। নিল ধোঁয়ার সঙ্গে আস্তে বলল, কিন্তু কবরটা কার?

হাসুমিয়াঁ প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে নোংরা জলেভরা খালের দিকে নাক ঝাড়ল। মুছে বলল, 'হঠাৎ গরম পড়ে সর্দি। একটু বৃষ্টি-ফিষ্টি হলে....' আবার সে শব্দ করে হাসতে লাগল। 'পার্টিশন করে দেবেন বলেছিলেন। দেননি?'

'না'। বউয়ের চেয়ে শীতল কণ্ঠস্বরে বলল দিলওয়ার হোসেন।

'নতুন বাড়ি উঠলে দেবেন। ক হাত জায়গা ছাড়লে ক্ষতি কী?' দালাল চোখে একটা ভঙ্গি করল। 'হিসেব করলে নারায়ণদাকেও ছাড়তে হয়েছে কি না বলুন আপনি? টু পার্সেন্ট লেস। আমারও তাতে কিছু কমিশন লস। হিসেব করুন।'

অসহিষ্ণু স্কুলশিক্ষক বলল, 'আহা! কবরটা কার?'

দালাল অগত্যা সিরিয়াস হল। 'তা কে বলবে? মহল্লায় খুঁজতে হয় বুড়োটুড়োদের কাছে। তবে বাড়ির উঠোনে কবর। খুব.....খুবই আপনজন ছাড়া.....' একটু নড়ে উঠল

হাসুমিয়াঁ। 'বরকত ডাক্তার মহল্লার পুরনো লোক। জিজ্ঞেস করবেন তা।'

বাড়ি ফিরে দিলওয়ার হোসেন দেখল, এক বুড়ি বারান্দার নিচে বসে থালা-হাঁড়ি ধুচ্ছে। মাথার কাপড় টেনে দিল নোংরা হাতে। তা হলে লোক পাওয়া গেছে। তারপর ঘুরেই একটু চমকে উঠল। তহমিনা বেগম কবরের খুব কাছে দাঁড়িয়ে ফুলবতী ডালিমগাছটি দেখছে। 'ওখানে কী করছ?'—শুনে সে মুখ ফেরাল। মহল্লার গাছপালার ফাঁক গলিয়ে একটি নরম গোলাপি আলোর রেখা পলকে সেই মুখে এসে বিঁধল। যখন সে স্বামীর কাছে ফিরে আসছে, তখন তার স্বামী বুঝতে পারছিল না, চোখদুটি কি ভিজে দেখেছে, না ভুল দেখা?

তহমিনা বেগম একটু হাসল। গলাটা ঈষৎ ধরা। 'নানি পাতিয়েছি। তুমিও কিন্তু নানি বলবে। বুড়ো মানুষ। দুবেলা এসে যতটুকু পারে, সাহায্য করবে।'

মহল্লায় কাজের লোক পাওয়া কঠিন। ঝিয়ের কাজ করতে চায় না। কুটিরশিল্প, নিজেদের ঘরকন্যা এসবেই দম ফেলার নাকি সময় নেই। অথচ একজন কাজের লোকের খুব দরকার হয়েছে ইদানীং। তহমিনা বেগমেক ডাক্তার বলেছেন, ভারী কাজকর্ম যেন না করে। ঝুঁকে কিছু করাও ঠিক নয়। তবু কুকার জ্বেলে চা করল। সুজি ও ডিম ভাজল। দিলওয়ার হোসেন যখন অন্যমনস্ক হাতে সেগুলি মুখে তুলছে, তখন তহমিনা বেগম বলল, 'নানির কাছে সব শুনলাম, জানো? এক ভদ্রলোক এখানে—'

'জানি। হাসুমিয়াঁ বলছিল। পার্টিশনের সময় বেচে দিয়ে যান নারায়ণবাবুর 'বাবাকে'।

'ভ্যাট!' তহমিনা বেগম বলল। 'গণি উকিলকে। টিনের চালে মরচে ধরেছিল। ফেলে দিয়ে অ্যাজবেস্টস চাপায়। গোডাউন করেছিল। চোরের জায়গা। শেষে নারায়ণবাবুকে বেচেছিল। তাই না নানি?'

বুড়ি আস্তে বলল, 'হুঁ। এ মহল্লায় সব খালি জায়গা নারায়ণবাবু কিনেছে। কে জানে কী মাথায় আছে!'

দিলওয়ার হোসেন বুড়ির দিকে তাকাল 'কবরটা কার, জানো?'

'সন্ধেবেলা ওসব কথা থাক।' 'বুড়ি উঠে দাঁড়াল। সেই মুহূর্তে মাইক্রোফোনে আজানের শব্দ। 'আল্লারসুলের নাম করো। আমি আসি, নাতনি!' বলে বুড়ি বেরিয়ে গেল। সম্ভাষণে কোমল আত্মীয়তা ছিল।

তহমিনা গলায় ভেতরে বলল, 'বলব। পরে শুনো।'.....

এ রাতে পাশাপাশি দুটিতে চুপচাপ শুয়ে ছিল। হাতে হাত, আঙুলে আঙুল। নিষ্পন্দ দুটি মানবশরীর। একসময় স্ত্রীলোকটি বলল, 'শোনো!' সে কনুই বালিশে রেখে উঁচু হল। ফিসফিসিয়ে বলতে থাকল, 'যদি আমারও তেমন কিছু হয়....বাচ্চা হতে গিয়ে যদি আমিও অমনি করে...' সহসা সে পুরুষটির বুকে মুখ গুঁজে দিল। 'তুমি বলো! কথা দাও! আমাকেও উঠোনে কবর দেবে।' সে ভালবাসার প্রার্থনায় বা একটি স্বপ্নের ব্যর্থতা আশঙ্কা করে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। বারবার বলছিল, 'কথা দাও, তুমি মুখ ফুটে বলো!' 'আমার কবরে অমনি ডালিমগাছ....'

সূর্যমুখী

এ মেয়ে সেই মেয়ে। নবীন খুবই চেনে। পাড়াগাঁয়ের পথে দুপুরবেলার ভিড়ে অনেক সোনামুখ রাঙামুখ ঢলঢলে মুখের এক মুখ। কত নামে নবীন তাদের ডাকে। মুখের নামে ডাকে। আর এই মেয়েই তো বলে, 'কাপুড়ে'র মনে যেন নামের লিস্টি নেকা আছে গো!

হুঁ, এই সেই মেয়ে। কিন্তু কোন গাঁয়ের পথে চেনাচিনি ঠিক মনে পড়ে না। কবে কিছু কিনেছিল কিনা—রাঙা ব্লাউজ কিংবা সাদা লেসের নকশা-কাটা সুনীল সায়া, অথবা বোনের জন্যে রঙ ঝিলমিল ফ্রক, ভায়ের জন্যে ডোরাকাটা পেণ্টুল—বলতে পারে না নবীন। কতজনে তো কেনেই না। শুধু হাত বুলিয়ে রঙ ছোঁয়, নরমতার স্বাদ নেয় টিকাল আঙুলে আর কত হাতে শাঁখা-নোয়া কত হাতে বেলোয়ারি চুড়ি, কত হাত শূন্য ধূসর ও বিষাদময়।

এ মেয়ে কি কিছু কিনেছিল কোনোওদিন? দু-চারবার খুঁজে ছেড়ে দেয় নবীন। হাতের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নেয়। সধবার হাত। মুখের দিকে একবার আলগোছে ঘুরে তাকিয়ে নেয়। বিকেলের নিস্তেজ রোদ্দুর উরুলিঝুরুলি রুক্ষ চুলের ওপর আচমকা হু হু ফেটে পড়ে এবং জ্বলে যায়। ঘোর লাল আর মারমূর্তি সিঁদুরটা তেড়ে আসে নবীনকে। সে চোখ নামায় পথের মাটিতে। কী নামে ডেকেছিল এই মেয়েকে? সোনামুখী না—রাঙামুখী, ঢলঢলমুখী? নামের লিস্টিতে কত নাম নেকা আছে নবীনের। ডেকেছিল শশীমুখী, বিধুমুখী, হাসিমুখী—নাকি মধুমুখী? নিশ্চয় একটা কিছু বলে ডেকেছিল। মনে নেই, মনে পড়ে না। ছটফট করে মনে মনে। এলোমেলো পা পড়ে তার। ধুলোয় ধূসর স্যান্ডেল দুটো সরু চিকন খটখটে আলপথে চাপা আওয়াজ তোলে। তারপর আর মন মানে না নবীনের। এই অগাধ নির্জনতা, সুবিশাল মাঠ, এই শান্ত বিকেল—তার মন ছটফট করে।

কী হল 'কাপুড়ে'? দাঁড়ালে ক্যানে গো? ...পিছন থেকে পাখির স্বরে কথা বলে ওঠে মেয়েটি।

একটা কথা। ...বলে নবীন কাপুড়ে ঘোরে। খিকখিক করে একটু হাসে। বনকাপাসি—নাকি ঝাঁপুইহাটিতে দেখেছিলাম?

মেয়েটি হাসে। ভুরু কুঁচকে বলে, উঁহু—হলই না।

চণ্ডীতলা?

মরণ আমার! সব থাকত ওই গাঁয়ে? কথায় বলে, 'এ গাঁয়ে ভাতার নাই তো নগাঁসিঙাড়!'*

কী ঠোঁটকাটা মেয়ে রে বাবা! এই অবেলায় ধুধু মাঠ—জন নেই মানুষ নেই গাছ নেই পালা নেই, গায়ে পায়ে ঢলঢল যৌবন এবং পরপুরুষ। নবীন বিবেচনা করে। সে বিব্রতমুখে বলে, শানকিভাঙা?

বুড়ো আঙুল নাচিয়ে মেয়েটি খিলখিল করে হাসে। ...হল না, হলই না।

আমপাড়া?

চোখ পাখিয়ে সে জবাব দেয়, হুঁ—আর কাজ ছিল না। শ্যাখের গাঁয়ে জন্মো নিয়েছিলাম।

তাও বটে। ...বলে নবীন পা বাড়ায়। আমপাড়ায় তো সবাই মুসলমান। পিঠের বোঁচকাটায় একটু ঝাঁকুনি দিয়ে সে কুঁজো হয়ে হাঁটে।

পিছন থেকে মেয়েটি বলে, তাহলে পারলে না তো?

নাঃ, পারলাম না।

হট মানছ?

মানছি।

নবীন কাপুড়ে একটু বিরক্ত হয়েছে। হয়ত নিজের ওপর, হয়ত মেয়েটির ওপর। কিন্তু এদিকে কী এক জ্বালায় পড়া গেছে। পিছনে কী টান, কী টান! এ মাঠ যেন মাঠ নয়—নদী। উজানে যেতে বড় কষ্ট হয়। বগলের ফাঁক দিয়ে বাঁধা বোঁচকাটা পিঠের ওপর চেপেয় বসছে আস্তে আস্তে। একটা চাপ কষ্ট শরীরে আর মনে গরগর করছে। নবীনের ঘাম হচ্ছে। কোথায় দেখেছিল—অনেক বার দেখা, দরাদরি, ব্লাউজ কিংবা সায়া কিংবা ফ্রক কিংবা পেণ্টুল, খুব চেনা মুখ—অথচ মনেই পড়ল না। যেন মনে পড়লে কিছু একটা ঘটে যায়।

কাপুড়ে!

হুঁ, বল।

কী বলে ডেকেছিলে মনে নাই?

না তো। খুঁজছি।

তাও ভুলে বসেছ! কী মানুষ রে বাবা! ...পিছনে মেয়েটি বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে, তা নবীন অবিকল দেখতে পায়।

নবীন বিরক্ত হয়েই বলে, কত গাঁয়ে ঘুরি, কত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। অত কী মনে থাকে?

তবে যে খুব চেনা, বললে?

হ্যাঁ, বললাম। আমাদের এমন হয়। চেহারা দেখে চেনা লাগে—ওটুকুনই।

মেয়েটি যেন নিরাশ হল। হাসল একটু। কিন্তু কেমন দুঃখিত হাসি। ...কপাল আমার! নিত্যিকার চেনা মানুষ দেখে দৌড়ে এসে সঙ্গ নিলাম, তো এ কী বুলি মানুষের! জানো কাপুড়ে, আজ আমার আসাই হত না—তোমাকে না দেখতে পেলে? পিসি একা একা ছাড়ত ভেবেছ? যা তা লয় বাবা, ধুল্লোউড়ির মাঠ—বুক ফেটে চ্যাঁচালেও কেউ আসবে না।

মুখ তুলে মাঠটা একবার দেখে নবীন। সামনে পুবে দূরে—অনেক দূরে ধূসর গ্রাম পিছনের পড়ন্ত সূর্যের লালচে রোদ্দুর মুছে ফেলছে গা থেকে। শূন্য খেতে বন-চড়ুই শালিখ পায়রার ঝাঁক শস্যদানা থেকে ঠোঁট তুলে অন্যমনস্ক তাকাচ্ছে। দূরে আল কেটে কেটে তৈরি মরশুমি গাড়িচলা পথে ছইঢাকা একটা গরুর গাড়ি চাকায় চাকায় ধুলো উড়িয়ে চলেছে। আরও দূরে ঘরে-ফেরা গরুবাছুরের ক্ষুরের চাপে উড়ন্ত পুঞ্জ পুঞ্জ ধুলোয়

ধোঁওয়া ভাসছে। এই মাঠে চৈত্র থেকেই ধুলো ওড়ে দিনরাত। যেতে যেতে নখের আঁচড়ে মুঠো মুঠো ধুলো ওড়ায় হাওয়া। ধুলোয় ধুলোয় ঘূর্ণি বয়ে যায় অগ্নিকোণ থেকে বায়ুকোণে —মাথায় তাদের খড়কুটো পাখির পালক শুকনো পাতা আর সাপের খোলাস দিয়ে গড়া অদ্ভুত 'মটুক'। এ মাঠ তাই 'ধুল্লোউড়ির মাঠ' দুপুরে এ মাঠে সোনালি ঝড়ের ছবি আঁকা থাকে। থরথর করে সেই ছবিখানা কাঁপে। আর উদাস নিঝুম পাড়াগেঁয়ে দুপুরে কাঁথা সেলাই করতে মেয়েরা গুনগুন করে গায় :

'ধুল্লোউড়ির মাঠে রে ভাই

রোদ ঝনঝন করে।

পানের সখার সঙ্গে দেখা

বেলা দুপহরে।।'...

...'আর যাব না আর যাব না

ধুল্লোউড়ির মাঠে।

একলা পেয়ে গায়েগতরে

ডংশালে কালসাপে।।'...

...'ও ছুঁড়ি তোর পিঠে কী

ম্র চোখখাকী তোর তা কী,

ধুল্লোউড়ির মাঠে

বসতে ধুলো শুতে ধুলো

আমি করব কী।।'...

তবে কিনা নবীন কাপুড়ে ফেরিওলা মানুষ। সূর্যকে পিছনে নিজের ছায়া সামনে রেখে সে ধুল্লোউড়ির মাঠ পেরিয়ে গাঁওয়ালে যায়, আবার সূর্যকে পিছনে নিজের ছায়া সামনে নিয়ে সে ধুল্লোউড়ির মাঠ পেরিয়ে ঘরে ফেরে। সূর্যটি তখন যেমন মাটি ছুঁইছুঁই, ফেরার সময়ও তেমনি মাটি ছুঁইছুঁই—রঙ ঘোর লাল, ডিমের কুসুম। তখন যেমন নবীনের ছায়াটি লম্বা, এখনও তেমনি লম্বা। ধুল্লোউড়ির মাঠের সোনলি ধুলোমাটির ওপর সে দু'বেলায় শুধু বেড়ে যায় আর বেড়ে যায়। নবীন পিঠের বোঝাটির চাপে একটু ঝুঁকে শুধু ছায়াটিকেই দেখতে দেখতে হাঁটে। নিজের চেয়ে ছায়াটি বেড়ে যায়, কেবলই বড় হতে থাকে—এ এক আশ্চর্য বটে।

আজ অন্য রকম। তার ছায়ায় ওপর আরেক ছায়া। ধুল্লোউড়ির মাঠের ওপর আজ আরেক ধুল্লোউড়ির মাঠে এসে পড়েছে। বিকেলের ওপর দুপুরের উৎপাত—সেই সোনালি ঝড়ের ছবি। আর ধুল্লোউড়ির মাঠটি এখন কাঁসর ঘণ্টা। একটু ছুঁলেই ঢঙঢঙ করে বেজে উঠবে ভয় আছে। নবীন সাবধানে হাঁটে। কী কথা বলে বসলে মুখরা মেয়েটি, গা বাজে নবীন কাপুড়ের। যা তা নয় বাবা, ধুল্লোউড়ির মাঠ—বুক ফেটে চ্যাঁচালেও কেউ আসবে না।

কী একটা হয় নবীনের। গুরুগুর করে কোথাও কী চাপা আওয়াজ ফোটে নাকি? যেমন কিনা সারা আকাশ খালি, অথচ দিগন্তের কোথায় চুপিচুপি ঝিলিকি, থমথমে ভাব, সামান্য আবছা ওদিকটা, কোথাও কোনও দূরের দেশে নাকি ঝড় চলেছে—ঠিক রকম লাগে।

তখনই শনশন করে একটা হাওয়া এল গায়ে। চুলগুলো দুলতে লাগল। কিছু ধুলো উড়ে গেল সামনে দিয়ে। ...কাপুড়ে, তাহলে বুঝলে তো? ...হাঁটুর ওপরটা ঢাকতে ঢাকতে মেয়েটি বলল।

হুঁ।

চেনা মুখের সাহসে সাহস। তাইতে আসতে দিলে পিসি। কিন্তু ওম্মা! ...আবার খিলখিল করে সে হাসে।...এসে দেখি, কাপুড়ে বলছে কি না—আমাদের অমন হয়। কী হয়, কেমন হয় শুনি? হ্যাঁ গো কাপুড়ে, তা হলেও বাপু কথা আছে। কাকেও-কাকেও তো মনে পড়বে? সব্বাই তো এক ছাঁচে গড়া লয়। না কী?

নবীন ঘোঁত ঘোঁত করে বলে, পড়ছে বই কি মনে।

ছাই পড়ছে। আমাকে তুমি কী বলে ডেকেছিলে, শুনবে? সুজ্জমুখী।

নবীন দাঁড়ায়। পিছনে ঘুরে বলে, সূর্যমুখী?

হুঁ, সুজ্জমুখী।

অন্যমনস্ক নবীন বলে, ক্যানে?

মরণ। তা তুমিই জানো ক্যানে বলেছিলে।

নবীন আবার হাঁটতে থাকে। ঊরু দুটো ভারি লাগে তার। বুকের ভিতর হাতুড়ি পড়তে থাকে। কেন এমন হচ্ছে সে বুঝতে পারে না। একটু পরে সে বলে, তুমি আগে যাও না বাপু। পিঠে ভার নিয়ে ঘুরতে অসুবিধে হচ্ছে। আগে আগে চল, সোজামুখে কথা বলতে বলতে যাই।

উঁহু। ...মাথা দোলায় সে। ...বেশ তো যাচ্ছি।

নবীন আবার দাঁড়ায়। শুকনো হেসে বলে, কাজের কথা নয়। এস, এগোও। কথায় বলে, পিছের মানুষকেই পোকায় (সাপে) কাটে।

আর আগে গেলে যে বাঘে খায় তার বেলা? ...সে চাপা হাসে। নবীন একটু সাধে। ...আহা শোনই না কথাটা। পিছনে একটা কিছু হলে জানতেই পারব না।

ভুরু কুঁচকে তাকায় মেয়েটি। নাকের ফুটো মৃদু কাঁপে। নাকছাবিটা ধুধু জ্বলে। ...কী হবে, শুনি?

কথার কথা। আগে আগে যেতে হয় মেয়েছেলেদের।

রূপ দেখতে দেখতে যাবে নাকি? ও কাপুড়ে! ...বাঁকা ঠোঁটে হাসে সে।

মলোচ্ছাই! ...ফের বিরক্ত হয়ে নবীন পা বাড়ায়। ...সূর্যমুখীর মুখ কি পিঠের দিকে নাকি? বলে সে একটু জোরেই হাঁটে।

ধুপ ধুপ শব্দ ওঠে পিছনে। ...একটু আস্তে চল বাপু। অত রাগ ক্যানে তোমার? কাপড় গছাবার সময় তো দেখি না—তখন মুখে মধু ঝরে যেন।

নবীন রা কাড়ে না। সেই চাপা গুরুগুরু আওয়াজটা মন দিয়ে শোনে। একবার করে মুখ তুলে আদিগন্ত বিশাল ব্যাপকতা মেপে নেয়। নির্জন ধুধু ধুল্লোউড়ির মাঠ। মাথার ওপর বালিহাঁসের ঝাঁক চলে যায় শনশন শব্দে। ফিনফিনে রেশমি রোদ্দুরটাও কিছুক্ষণ কেঁপে ওঠে কুচিকুচি ছায়ার আঁচড়ে।

হ্যাঁ কাপুড়ে, সেদিন সেই জামাটা দেখলাম—সামান্য দু আনার জন্যে দিলে না, মনে পড়ছে না? বেচে দিয়েছ, না আছে গো? হুঁ, কাপুড়ের রাগ হয়েছে।

পিঠের ওপর কণ্ঠস্বর, যেন দু'কানে এসে শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটানি লাগে—নবীন চমকায়। তবু কথা বলে না। কী জানি, অমর্ত ফুলের ঘ্রাণে আত্মা কোটরে সাপের মতন নড়ে ওঠে।

চপলতা করে সে পিছনে। ...একবার তোমার বুলিটা শোনাও না বাপু। ফক-সায়া-বেলাউস! ফক-সায়া-বেলাউস।

পিছনে অদৃশ্য ফুলের বনে ঝড় বইছে। ফুলের বনে এখন সোনালি ঝড়ের ছবি—ধুল্লোউড়ির মাঠে একটা দুপুর থরথর করে কাঁপছে নবীন দরদর করে ঘামে। কোনও কথা বলে না।

আর কী বলো যেন? ...'নিলাম নিলাম। কী নিলাম?' 'পছন্দ!' 'নিলাম নিলাম। কী নিলাম!' 'পয়সা!' পাখির বুলি শিখেছ বাপু! আহা, বলই না একবার, ও কাপুড়ে! 'নিলাম পয়সা, দিলাম কী?' তারপর কী বল যেন? ছাই, মনে পড়ছে না। নিলাম পয়সা, কী দিলাম... ও কাপুড়ে, কী দাও বল না?

নবীন হঠাৎ মুখটা ঘোরায়, চোখ দুটো কাঁপে—বলে, নিলাম পয়সা দিলাম রূপ-যৌবন।

পলকে লজ্জায় রাঙা 'সূর্যমুখী' মুখ নামায়। ...যাঃ!

হাঁ, তাই তো দিই।

তুমি বড্ড কী যেন। যাও!

নবীন বলে, সেই জামাটা দেখবে না?

এখন পয়সা নেই সঙ্গে। ...মুখ নামিয়ে সে পা বাড়ায়। কণ্ঠস্বরও কাঁপছিল।

পয়সা পরের কথা। ...নবীনের কণ্ঠস্বরও কাঁপে। অমন জিনিস কখন কোথায় কার হাতে চলে যাবে, ঠিক নেই। কোনও প্যাঁচামুখীর ময়লা গতরে। ছ্যা, ছ্যা! কেন মনে খেদ থেকে যাব—সূর্যমুখী বলে ডেকেছি। এস দ্যাখ।

নবীন বোঁচকাটা আলের ওপর ঝকঝকে কঠিন মাটিতে ধুপ করে ফেলে দেয়। পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে। ছোট্ট আকন্দ ঝাড়ের কাছে মেয়েটি দাঁড়িয়ে গেছে। আলতারাঙা পায়ের আঙুলে শুকনো ঘাস টানে সে। ঘাস দেখে। চিবুক বুকে বিঁধে থাকে। খোঁপা সামান্য টলে পড়ে চৈত্রের হাওয়ায়। রুক্ষু উরুলিঝুরুলি কিছু চুল ওড়ে কানের পাশে, কপালের ওপর। নাকের ডগায় ঘামের ফোঁটা টলটল করে। নাকছাবিটা হু হু জ্বলে যেতে থাকে। দুটো বাহু এসে তলপেটের নিচে মিলে থাকে, আঙুলে আঙুলে জড়ানো। কী বাহু, নাকি দুটো লাজুকতাময় নরম প্রতিরোধ। কী বুক, ওঠে পড়ে, শ্বাসপ্রশ্বাসে পুষ্পের ঘ্রাণ, অসামান্য সুখবৃক্ষের দুটি স্বাদু ফল। আর নবীনের মনে হয়, ওখানে কোথাও জল দাঁড়ায় না, রেশমি ব্লাউজ পিছলে খসে পড়ে যায়। আর রক্তে কাতর হতে থাকে নবীন কাপুড়ে, মাংসে ছটফট করে তার ফেরিওলার আত্মাটা। সে বলে, হাঁ, দেখ—দেখতে দোষ নেই। সব—সব দেখ, যা পছন্দ হয়। এইটে, এইটে... কিংবা এইটে...। একটার পর একটা রঙিন ব্লাউজ বের করে তুলে ধরে সে। দাঁতে হাসি চকচক করে তার। ...কী হল? সূর্যমুখী বলে ডেকেছিলাম, তুমিই বললে। তাই ডাকছি, সূর্যমুখী, রাগ করলে নাকি? আর লজ্জাই বা কিসের? ধুল্লোউড়ির মাঠের এ বাজারে আর তো কেউ নাই। শুধু দুজনা—তাই না সূর্যমুখী? তুমি একলা খদ্দের, আমি একলা দোকানদার। কী বলো...ঘোঁত ঘোঁত করে হাসে নবীন।

আড়চোখে তাকিয়ে আছে সূর্যমুখী, নবীন টের পায়। নবীন 'কাপুড়ে-মানুষ' বলেই মেয়েমানুষের কত কিছু টের পায়। একটা করে ভাঁজ খোলে, পড়ন্ত বেলায় রোদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, লাল রঙের আগুন জ্বলে, নীল রঙের আগুন জ্বলে। সূর্যমুখীর শরম সঙ্কোচ ভীরুতা জড়তার ওপর অতি প্রযত্নে আঁচ বোলাতে থাকে নবীন। বুক টিপটিপ করে তার। টেরচা চোখে তাকিয়ে ধুল্লোউড়ির নির্জনতা বার বার দেখতে ভোলে না। তার এমন হয়, এক দেহ ঊর্ধ্বমুখে কিছু প্রার্থনা করে চলে—আরেক দেহ পায়ের তলে বসে অস্থির আর মিটিমিটি চোখে প্রার্থনা দেখে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতন প্রতীক্ষায়।

সূর্যমুখী এবার ঠোঁট কামড়ায় একবার। তারপর অস্ফুটে বলে, সেইটে কই?

নবীনের নাভিমূল থেকে প্রচণ্ড চিৎকারটা ঠোঁটে এসে মৃদু হয়, স্খলিত পাতার মতন সামান্য খসখস করে মাত্র। ...কোনটা, কোনটা গো সূর্যমুখী?

দু পা এগিয়ে সূর্যমুখী অল্প হেসে বলে, সেইটে—সেদিন এটা দেখেছিলাম।

নবীন দু'হাতে জামাগুলো ওলটপালট করতে করতে বলে, কী রঙ? হাতকাটা, না গোটা হাতা? সাইজ কত?

হাঁটু দুমড়ে নিঃসঙ্কোচে বোঁচকার ওপারে বসে পড়ে সূর্যমুখী। ...হাতকাটা গো, হাতকাটা। ওই তো পরছে সবাই আজকাল। বেশ দগদগে জবাফুলের রঙ। ...আলতো আঙুলে একটা করে ওলটপালট করে সেও, ঠোঁট বাঁকা, তাচ্ছিল্যের ভ্রূভঙ্গী।

নবীন ছটফট করে একটা মোড়ক প্রায় ছিঁড়ে ফেলে। রুদ্ধশ্বাসে বলে, এই হচ্ছে গে সবচেয়ে সরেস মাল। বাবুবাড়ির মেয়েদের জন্যে রাখা। দেখছ কী জিনিস! কী চেকন মিহি সুতো। জেল্লাখানা দেখ। ম্লান রোদে একটা ব্লাউজ তুলে ধরে সে। প্রজাপতি যেন ছটফট করে হাতে-ধরা। প্রচণ্ড আশায় ফুলে ওঠে নবীন।

সূর্যমুখীও তাকিয়ে থাকে। একবার ছোঁয়। তারপর ফের বোঁচকার বিশৃঙ্খল রঙের বাগানে ঢুকে পড়ে। ছোট্ট কপালে লালচে রোদ সুখে খেলা করতে থাকে। কাচপোকার কালো টিপ ঝলমল করে।

নবীন আপসোসে বলে, এতেও মন ভরল না? সূর্যমুখী, তোমার চোখ নেই, তুমি কানা। ...এবং নবীনের মনে রাগ ফুঁসে ওঠে। ছোটলোকের মেয়ে! তুই কী বুঝবি এর মর্ম মাগী। তোকে ফুল শোঁকানোও যা, গু-গোবর শোঁকালেও তাই। তোর কাছে সব সমান।

সূর্যমুখী সব ওলটপালট করে দিচ্ছে। কখনও কোনও একটা ব্লাউজ তুলে বুকের ওপর ধরে রাখছে। ফেলে দিচ্ছে অবহেলায়। তার চোখে তীব্র অনুসন্ধান টলমল করছে, দেখতে পায় নবীন। ফের একটা তুলে বুকের ওপর মেলে নবীন তার দু'কাঁধের ওপর আঙুল চেপে বলে ওঠে, আহা! টানটান করে ধর। তবেই তো সাইজ বোঝা যাবে।

ইচ্ছে করেই ব্লাউজটা ফেলে দেয় সূর্যমুখী। ঝাঁজে বলে, খুব হয়েছে! ...তারপর দেখে নবীন তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। তক্ষুনি চকিতে বুকের কাপড় ঠিকঠাক করে সে তেড়ে ওঠে, এই কাপুড়ে! কী দেখা হচ্ছে, শুনি?

সাইজ। তোমার চৌত্রিশ লাগবে। ...নবীন অপ্রস্তুত হাসে।

কিন্তু সেই জামাটা কই? সেদিন যেটা দেখেছিলাম?

এতগুলোর কোনওটাতেও মান উঠল না?

নাঃ।

আবার বল তো, কী রঙ? হাতকাটা?

হাতকাটা। জবাফুলের মতন দগদগে রঙ।

এইটে?

নাঃ।

এইটে।

না, না।

নিশ্চয় এইটে।

না, না, না।

নবীন কাপুড়ের হাতে রক্তলাল হাতকাটা চৌত্রিশ ব্লাউজ এক প্রচণ্ড সোনলি ঝড়ের দাপটে থরথর করে কাঁপে। দু'চোখে করুণ কামনা টলটল করে। রক্ত-মাংসে ছটফট করে সে। একটু ঝুঁকে আসে। ফিসফিস করে বলে, নাও। দাম নেবে না নবীন। তুমি নাও। এটাই নাও।

মুখ নামিয়ে নাকছাবি খোঁটে সূর্যমুখী। মাথাটা সামান্য দোলায়। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলে, ক্যানে? এমনি এমনি দেবে ক্যানে?

ক্যানে? ....নবীন জবাব খুঁজে পায় না। তার মুঠো শক্ত হয়ে যায়। জামাগুলো ঘামে ভেজে। এই বিরাট পৃথিবীতে নবীন কাপুড়ের জীবনটা কী ব্যর্থ, আজও তার নারীসঙ্গ হয়নি, সে স্বভাবত ভীতু, দুর্বলচেতা, নির্বান্ধব আর কৃপণ মানুষ। গ্রামের একপ্রান্তে একা থাকে সে। কেউ তাকে ভালবাসে না। সবাই জানে, ভীষণ বদমেজাজি আর হাড়ে হাড়ে কৃপণতা আছে নবীনের। সামান্য পুঁজি নিয়ে গাঁওয়ালে কাপড় বেচে বেড়ানো পেশা যার, তাকে কোনও বাপ মেয়ে দিতে চায়নি। সব বাপই বলেছে, ওর পাল্লায় পড়লে মেয়ে আমার না খেয়ে মরবে। প্রাণে ধরে দু'মুঠো খেতে-পরতে দেবার লোক নাকি ও? দ্যাখো না, ঘরের চাল ফুটো—বর্ষায় জল পড়ে মেঝেয়। তাও পয়সা খরচের ভয়ে সারাতে চায় না ব্যাটা। উঠোনে আগাছার বন। সবখানে মাকড়সার ঝুল, চামচিকের নাদি, টিকটিকি ডিম পাড়ে। তবু কি হুঁশ আছে লোকটার? শুধু পয়সা ছাড়া আর কিছু চিনলেই না সংসারে। কখন দাঁতকপাটি খেয়ে পড়ে থাকবি ঘরে, তখন দেখবি—পয়সা সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিস নাকি!

এত বেরসিক বদমেজাজি নবীন কাপুড়ে গাঁওয়ালে গিয়ে কিন্তু অন্য রকম। তার বুলি শুনলে অবাক লাগে। কিন্তু সেও তো চালাকি তার। পয়সার জন্যে ওটুকু না করলেই নয়। বোঁচকা বেঁধে ফেরার পথে মুখখানা দেখলেই চমকে উঠতে হয়। এ মানুষ কি সেই মানুষ? এই তিরিক্ষি ভুরু বাঁকানো নিস্পৃহ মুখই আসল মুখ নবীনের।

আজ হঠাৎ এতদিন পরে ধুল্লোউড়ির মাঠে একটা বিকেল সেই নবীন কাপুড়েকে গুরুতরভাবে বদলে দিয়েছে। পিছনে আচমকা ধুপধুপ শব্দ শুনে মুখ ফেরামাত্র সে শুনছে—ও কাপুড়ে দাঁড়াও দাঁড়াও—আমি তোমার সঙ্গে যাব।

আর মুহূর্তে নবীন বদলে গেছে। ধুল্লোউড়ির বিশাল নির্জন মাঠ, পড়ন্ত বিকেল, এই ঢলাঢল ডাগর মেয়ে।...

আবাব নবীন হাঁসফাঁস করে বলে ক্যানে? সূর্যমুখী, তা কি কষ্ট করে বলতে পারি? পারি না। আমার মন বললে, সূর্যমুখী বলে যাকে ডেকেছি—তাকে বিনি দামেই দিই।

তোমার দিব্যি তোমাকে বিনি দামে দিলেই যেন সার্থক হই। হ্যাঁ, মন বললে এ কথা।

পা দুটো শুকনো ঘাসে একটু দুলিয়ে এবার হঠাৎ ফিক করে হেসে ওঠে সূর্যমুখী। ...দেবে যদি, সেইটে দাও। আমার পছন্দ সেটা।

ভাঙা গলায় নবীন বলে, সেটা—সেটা হয়ত নাই। সেটা যে নাই!

তা হলে আর কী? ওঠ, বেলা পড়ে এল। ...বলে সে উঠে দাঁড়ায়। দু'হাত মাথার ওপর তুলে একবার আড় ভেঙে নেয় দেহের। আবার বলে, কই ওঠ কাপুড়ে!

নবীন ব্যস্ত চোখে মাঠের চারদিকটা দেখে নেয়। এ কী হতে লাগল—হঠকারী প্রাকৃতিক উপদ্রব! শান্ত নিঃসাড় তার ভীতু যৌবন বিকেলের ধুল্লোউড়ির মাঠের মতন চুপচাপ শুয়ে ছিল এতদিন। ফেটেফুটে একটা উগ্র দুপুর বেরিয়ে এল। ঝাঁঝাল লু হাওয়া বইতে লাগল। সোনালি ধুলোর ঘূর্ণি এল একটার পর একটা—মাথায় তাদের খড়কুটো, শুকনো পাতা, পাখির পালক আর সাপের খোলসের রহস্যময় 'মটুক'। জ্বরজ্বর নবীন কাপুড়ে আবার তাকাল মেয়েটির দিকে। ও ঠোঁট কামড়াচ্ছে। নাসারন্ধ্র কাঁপছে। নাকছাবিটা জ্বলছে। সিঁদুরটা ভয়ঙ্কর ধুধু ধোঁয়াচ্ছে। আর বুকে এক সোনালি ঝড়ের ঝাপটানি লেগে সুখবৃক্ষের দুটি স্বাদু ফল দুলছে, দুলছে। আর দেহে ওর নাগিনীছন্দ। ধুল্লোউড়ির মাঠে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়ে চৈত্র বিকেলের মরমী হাওয়া।

নবীন ওঠে। পায়ের নিচে রঙের বাজারে আজ চড়া নিলামের ওলটপালট। নবীন একবার জামা তুলে পেট চুলকোয়। একটা ব্লাউজ ভুল গাঁয়ে চলে গেছে—কোন গাঁয়ে কোন অন্যমনস্ক দুপুরবেলায়। সেই ব্লাউজটার জন্যে আক্ষেপে গলায় বোবা ধরে। হায়, অজান্তে বিকিয়ে গেছে তার জীবন যৌবনের শ্রেষ্ঠ আস্বাদ! যদি জানত নবীন, তা হলে ধুল্লোউড়ির মাঠের এই বিকেলের জন্যে মজুত রেখে দিত। নবীন কাপুড়ে গলা ঝেড়ে বলে, সেইটে থাকলে নিতে?

নিতাম বইকি।

বিনি দামেই নিতে?

নিতাম। তুমি দিতে চাইছ বড় মুখ করে, আর আমি নেব না? অত ছোট মন নই, কাপুড়ে।

নবীনের চোখ জ্বলে। নাক মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরোয়। ...সেটার বদলে যদি এইগুলো—যা আছে, সব—সব দিই? ...চাপা ফিসফিস আওয়াজ আসে তার গলা থেকে। ...নেবে, নেবে সূর্যমুখী?

না! ...ভুরু কুঁচকে সাঁত করে ফণা তোলে ধুল্লোউড়ি মাঠের মোহিনী সাপ। হুহু করে ধুলোর ঘূর্ণি চলে যায় গায়ের ওপর দিয়ে। খোঁপা খসে পড়ে। রুক্ষ চুল ওড়ে। শাড়ি সরে লাল শায়ার দেয়াল দেখা যায়। তারপর সে নবীনের নিলামের বাজার এবং নবীনকে রেখে হনহন করে এগিয়ে যায়।

নবীন ভারি গায়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তাকিয়ে তাকিয়ে তার চলে যাওয়া দেখে। তারপর দুর্বল কাঁপা হাতে বোঁচকাটা গুছিয়ে নেয়। এত ওজন বেড়ে গেছে বোঝাটার!! পিঠে ফেলতে কষ্ট হয়। তখন সে উঁচু আল থেকে ক্ষেতে নামে। অনেক কষ্টে বগলের ফাঁক গলিয়ে পিঠে নেয়। হাঁচড়-পাঁচড় করে আহত জন্তুর মতন হাঁফাতে হাঁফাতে আলপথে উঠে দাঁড়ায়। পা বাড়ায় নবীন কাপুড়ে।

সেই সময় হঠাৎ কোত্থেকে অবেলায় নিম ফুলের গন্ধ ভেসে এল।

সে নাক উঁচু করে শোঁকে। ধুল্লোউড়ির মাঠে গাছ নেই, কোত্থেকে এল এই উপদ্রব? এ কি মিথ্যে নিম ফুলের গন্ধ—নাকি সত্যিকার নিম ফুলের গন্ধ? তার গা শিউরে ওঠে। অপার নিরালায় চিকন মিহি রোদ। চৈত্রের হাওয়া বয়ে যায়। ধুলো ওড়ে মৃদু মৃদু। দূরে ধূসর হয়ে যায় সূর্যমুখী সেই কি রেখে গেল ওই গন্ধটা?

ক্লান্ত বিষণ্ণ নবীন কাপুড়ে আবার নাক উঁচু করে অসম্ভব নিম ফুলের গন্ধটা হাতড়াতে হাতড়াতে ধুলোর মাঠ পেরোতে থাকে।

....'ধুল্লোউড়ির মাঠে রে ভাই রোদ ঝিলমিল করে।

নিম ফুলের গন্ধে আমার মন চনমন করে।।'

...'আর যাব না আর যাব না ধুল্লোউড়ির মাঠে।

কানের সোনা হারিয়ে এলাম মুখ দেখাব কাকে।।'

আবার বয়ে যায় অন্যমনস্ক হাওয়া। আবার খড়কুটো পাখির পালক শুকনো পাতা আর সাপের খোলসের 'মটুক' পরা ঘূর্ণি আসে ছুটে। ধুলোমাখা ছেঁড়া দুটো স্যান্ডেলের বিষণ্ণ শব্দ ওঠে দিনশেষে।

---

* মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের প্রবাদ। লালবাগ মহকুমার একটা রানা নবগ্রাম বা নগাঁ। তার পাশেই সিঙাড় নামে একটা গ্রাম আছে। কেন এ প্রবাদ চালু জানা নেই। কোনওকালে বুঝি ওখানে প্রচুর বর কিংবা স্বামী সুলভ ছিল! —লেখক।

আত্মজ

সোনাবাবুর বৃত্তান্ত শুনে গদীতে সবাই হেসে খুন। এ আর নতুন কথা কী, সবাই জানে শ্রীমান পাঁচু ওরফে পঞ্চানন্দ কী ছেলে। মাল ফেরত দিয়েছে এই যথেষ্ট। বোঝা যাচ্ছে, সোনাবাবুকে ভীষণ ভয় ভক্তি করে। তা না হলে এতক্ষণ দুতিনদিনের মতো কোথায় উধাও হয়ে যেত। ফিরে এসে মার খেলেই বা কী? ওর গায়ের চামড়া কালক্রমে দারুণ শক্ত হয়ে গেছে। পাঁচু বরং খুশি হয়ে বলে ভালো হল। অনেকটা খারাপ রক্ত জমেছিল—সব বেরিয়ে গেল! এখন আমার কী মজা!

সেই সঙ্গে দুহাত তুলে ধেই ধেই নৃত্য করাও ওর অভ্যাস। ফের তাড়া করলে দৌড়ে পালিয়ে যায়। সে-বেলার মত দুমাইল দূরে একটা ব্রীজে গিয়ে বসে থাকে। জলের দিকে তাকিয়ে নিজের প্রতিবিম্বকে ভ্যাংচায়। থুথু ফেলে। নাক ঝাড়ে। ঢিল ছোঁড়ে।

সোনাবাবু এটা আবিষ্কার করল বিকেলের দিকে। আচমকা পিছন থেকে জামার কলার ধরতেই পাঁচু তন্ময়তা ভেঙে বলে উঠল, আবার কী দাদু?

ও এত নির্বিকার। সেইজন্যে সোনাবাবুর মাথা খারাপ হয়ে যায়। উঠন্ত হাতের মুঠো খুলে অবশ শরীরে সোনাবাবু হাসে।... ব্যাটা জ্যান্ত মানুষ নয়, সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি।

তবে এই প্রতিমূর্তিটির চেহারা বড় সুন্দর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে এবং ফরসা জামাকাপড় পরলে ওকে ভদ্রপরিবারের ছেলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। বেথুয়াডহরির জ্যাঠশ্বশুর সেদিন সোনাবাবুর বাড়ি এসেছিলেন। পাঁচু তাকে কিংবা তিনি পাঁচুকে এমনভাবে গ্রাস করেছিলেন যে সামান্যতেই 'সতী, তোর দেওরটি কোথা রে' বলে সারাটি দিন হাঁক-ডাক। সোনাবাবু যথারীতি ততবার জানিয়ে দিচ্ছিলেন, ও আমাদের ইয়ে—বয়...মানে চাকর ফাইফরমাস খাটে। তার বউ সতী মুখ টিপে হাসছিল। আড়ালে সোনাবাবু তাকে ধমকেছিল—হেসোনা ত, গা জ্বালা করে! যেমন উনি, তেমনি এই শুয়ারটা, আর তেমনি হচ্ছ তুমি! আজই ওর ঘাড় ধরে বের করে দেব!

সেটা সম্ভব হয়নি। সোনাবাবুর পায়ে সবে বাত ধরেছে। রাত্রের দিকে পাঁচু হাঁটুর নীচে থেকে পায়ের আঙুল অব্দি ম্যাসেজ করে দেয়। চোখ বুজে সোনাবাবু বলে, আঃ, বাঁচালি বাবা! রাত্তিরটা ঘুমুতে পারব মনে হচ্ছে।

ওদিকে সতীর কোমরে বেদনা আছে আজ সাত বছর। তার ওই জ্যাঠা আবার হোমিওপ্যাথির ডাক্তার। তিনি বলেছিলেন, পিকচঞ্চু অস্থিপ্রদাহ। ফস্ফরাস থেকে শুরু করা যাক। কিন্তু ফস্ফরাস থেকে সুরু হয়ে ফস্ফরাসেই শেষ হয়ে গেল। সোনাবাবুর বুকে এসে সতী দেখেছে, সেই টু হান্ড্রেড এক্স ফস্ফরাস (হোমিওপ্যাথি গুরু হ্যানিম্যান মতে) আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে শক্তি বাড়তে-বাড়তে থাউজেন্ড এক্স হয়ে উঠেছে। তুষের আগুন কোষে ধিকধিকি জ্বলে।

সে রাতে অন্য রাতের মতই সতী উপুড় হয়ে শুলে চিরকিশোর পঞ্চানন কোমরে পালোয়ানি করছে, সোনাবাবু আড়চোখে জুলজুল চোখে তাকিয়ে দেখছে—যেন সবুজ মখমল ঘাসের জমিতে চিতা বাঘের বাচ্চা খেলা করছে আপন মনে। রাগ হয়, ভয় করে আবার ভালোও লাগে।

মনসাতলা ব্রীজ থেকে ওকে নিয়ে যখন সোনাবাবু ফিরে এল, সতী ঘর বার করছিল এতক্ষণ যেন। বিকেলে পশ্চিমের আকাশে থাকে থাকে রাঙা মেঘ জমে আছে। ইট ভাটার ওদিকে খোলামেলায় মজুরনীরা উনুন জ্বেলেছে—সেই ধোঁয়া উঠছে সবুজ গাছপালায় মাখামাখি। খাল পোলের কাছে রেলিঙে হেলান দিয়ে রিকশোওলারা চায়ে গ্লাস হাতে জালে মাছ পড়া দেখছে। রাস্তার দুপাশে সারবাঁধা দোকান পাটে আশেপাশের গ্রামের লোকেরা আড্ডা দিচ্ছে। দত্তর গদির সামনে একটা লরি দাঁড় করানো। পাটের গাঁট বোঝাই করছে কুলিরা। দালাল হবিবুর সোনাবাবুকে দেখে বলল, পেলেন? যাবে আর কোথা? তবে সবই বরাতের ফের সোনাবাবু বুঝলেন? হয়ত কোন সদ্বংশের ছেলে—তার নসীবে কী ছিল দেখে নিন। ...হবিবুর পানখেকো লাল বিচ্ছিরি মুখব্যাদান করে হাসল। ....চেষ্টা করে দেখুন, স্বভাব চরিত্তির শোধরায় নাকি। তবে সাবধান হতে ভুলবেন না কিন্তু।

সোনাবাবু গজগজ করে উঠল। ...আমার দায় পড়েছে! যাদের দায়, তাদের হাতেই তুলে দেব ব্যাটাকে। রামধোলাই খেলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মানুষের আত্মাসুদ্ধ তারা ধুয়ে সাফ করে দেয়।

টের পেয়ে সুরসিক পাঁচু খিলখিল করে হাসল। ...তাতেও পাঁচু মরবে না! আমার আত্মাটা খুব চালাক। আমিই হয়রান হয়ে যাই। বাপরে! বাপ!

সোনাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে বদরাগী মোষের মত পাঁচুর মুখটা দেখে নিয়ে বলল, ব্যাটা বিদ্যেদিগগজ। আত্মা! আত্মা কী দেখেছিস? জানিস?

পাঁচু তা জানে না। দেখতেও পায় না। শুধু বোঝে। বুঝতে পারে আত্মা আছে একটা। পাঁচু খুশি হয়ে বলল, দাদাবাবু হই যে—দেখুন, নিশানা করে দেখুন—দেখতে পাচ্ছেন—চাঁইপাড়ার কাছে খালের ওপারে একটা লঙ্কার ক্ষেত—দেখতে পেলেন?

হাঁ করে সোনাবাবু বলল, তা কী হয়েছে?

গম্ভীর—ঈষৎ বিষণ্ণ পাঁচু ভ্রূ কুঁচকে সেইদিকে তাকিয়ে বলল, এ্যাদ্দুর থেকে আমি দেখি দাদাবাবু—পষ্ট দেখি। কি না, একখানা লঙ্কার খেত। ঝাড়গুলো সব মস্তো বড়। থোকা থোকা লঙ্কা ধরেছে।

সোনাবাবু অবাক। এত অবাক যে কথা বলতে ভুলে যান।

পাঁচু বলে...এ্যাদ্দুর থেকে পষ্ট দেখছি। নোলায় জল ঝরছে দাদাবাবু। আঃ!

ব্যাটা হনুমান! সোনাবাবু ওর হাত ধরে টানেন। অদূরে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সতী। সেইদিকে চোখ গেছে। হাতে চিরুণী, এলানো চুল বুকের ওপর। কপালে লাল টিপ। সাদা ঝকঝকে তাঁতের শাড়ী পরেছে। হাতাকাটা লাল জামার দুপ্রান্তে দুটো নিটোল বাহুতে আগুন জ্বলছে। মাথা কাত করে চুলে চিরুণী চালিয়ে ঠোঁটটা চাপা হাসির বাঁকা ছাঁদে রেখে সতী এদের দেখছে। হঠাৎ সোনাবাবুর মনে হয়, জীবনের সব ব্যাপারেই সতী বড় নিশ্চিন্ত যেন। যেন কী কী হবে বা না হবে, সব জেনে বসে আছে ও।

দরজার মুখে এসে সোনাবাবু বলেন, লঙ্কাকাণ্ড করবে তোমার হনুমান। সামলে রেখো। ওখানে কোথায় কার লঙ্কাখেত রয়েছে—ওর দৃষ্টি এবার সেইখানে। দেখো, কাল আবার চাঁইপাড়া থেকে কেউ নালিশ না আনলে বাঁচি।

সতী জবাব না দিয়ে ভিতরে ঢুকল। একটুকরো উঠোন—দুকামরা সেকেলে একতালা ঘর, বারান্দায় দরমা-বেড়া দিয়ে তৈরী রান্নাঘর। পিছনে পেত্নীঝোপ নাটাকাঁটা ভাঁড়ুলে

গাছে ভরা একটুকরো পোড়ো জমি পেরোলেই খাল। এখন সেচদপ্তরের দৌলতে খাল বলা হয়। আগে ছিল ছোট্ট নদী—বাঁকে বাঁকে চলে গঙ্গাবাহিনী দ্বারকায় মিশেছে বহু দূরে। উত্তরে দিগন্তবিস্তৃত বিল তেলকার থেকে জল নিষ্কাশনের জন্যে নদীটা ভদ্রচেহারা পেয়েছে একালে।

হাইওয়ের দুপাশে এমনি সব বাড়ি আর দোকানপাট। খুব বেশি নয়—ত্রিশ থেকে চল্লিশ বড় জোড় সংখ্যায়। ক্রমশ বাড়ছে বসতির সীমানা। এলাকার সেরা ব্যবসাকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এরা সবাই বাইরের লোক। অবাঙালীর সংখ্যা কম নয়। সোনাবাবু লছমনজীর গদীতে চাকরী নিয়ে এখানে এসেছে। বহরমপুরে মূল আড়ত—এখানে তার নতুন শাখা। খৈল তেল লঙ্কা ডাল—নানান পাইকারী কারবার। লছমনজীর ভাইপো নন্দলাল এখানে দেখাশোনা করে। সোনাবাবু সদর থেকে একরকম বদলী হয়েই এখানে এসেছে।

নন্দলালের জীপ আছে। বয়সে নবীন এবং খামখেয়ালী। মাঝে মাঝে প্রায়ই কোথায় উধাও হয়ে যায়। সব জিম্মা দিয়ে যায় সোনাবাবুকে। প্রবীণ বিশ্বাসী কর্মচারী। পাই পয়সাও গরমিল হয় না। সেই পুরস্কারে বাড়িভাড়া লাগে না তার। বাড়িটা কোম্পানী কিনেছিল পাশের গ্রামের রাজীব ডাক্তারের কাছে। ওটা ছিল তার ডিসপেনসারি। ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হয়নি। হয়েছে প্রাইমারি শিক্ষক। অভাবে বেচে ফেলেছিল।

বাড়ি ঢুকে সোনাবাবু বলল, নাও, মানিককে দেখ। আমি গদীতে যাই। আর...এবেলা কী রান্না করছ?

কয়েকমিনিট অপেক্ষা করেও কোন জবাব না পেয়ে বিরক্তমুখে সোনাবাবু চলে যান। এবার সতী আঁচড়ানো চুল গুছিয়ে খোঁপামত করে পাঁচুকে বলে, কী রে রাজপুত্তুর? দুপুরে খেলি কোথায়? হুঁ...মুখ দেখেই বুঝেছি, কোথায় কার ঘাড় ভাঙা হয়েছে।

আল্হহলাদিত পাঁচু কলতলায় সযত্নে হাত পা ধুতে ধুতে বলে, আমার মুখখানাই এরকম।

সতী একটু এগিয়ে আসে। ...প্যাণ্টটা কী করেছিস রে! ছি, ছি! ধুলোয় ঘষেছিস হতভাগা?

চোঙা প্যাণ্টের পাছা ঝাড়ে পাঁচু—শশব্যস্তে। কাঁচুমাচু হাসে। তারপর পা ধুয়ে সাবধানে হাওয়াই স্লিপার তুলে নেয়। এবার তার আচরণে বেশ ভদ্রতার লক্ষণ ক্রমশ প্রকট হবে।

সতী হঠাৎ জামাটা খামছে ধরেছে।...কালকের কাচা জামার এ—ই ছিরি করেছিস? তুই কি কচি ছেলে, গাল টিপলে দুধ বেরোয়?

পাঁচু মাথা দুলিয়ে জানায়, বেরোয়।

জামা ছেড়ে মাথায় আলতো চাঁটি মারে সতী। বলে, ঘড়ি পরার খুব সখ হয়েছে তো বললেই পারতিস! মিছেমিছি মারধোর খেলি।

তুমি দিতে বুঝি? পাঁচু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলে।

সতী হাসে মাত্র।

পাঁচু বলে, চুরি তো করিনি। আমি চুরি করি নে। চোর নই।

কী করিস তবে? সতী সকৌতুকে বলে।

পাঁচুর জবাব : ফক্কুরি।

সেটা অন্তত আজকের ব্যাপারে ঠিকই। ভোরবেলা থেকে বাড়ির জিনিসপত্র ওলটপালট করে ফেলা হচ্ছে, সোনাবাবু ষাঁড়ের মত সবখানে গুঁতো মেরে চলেছেন, হাতঘড়িটার পাত্তা নেই। হঠাৎ পাঁচুর দিকে চোখ যেতেই মনে পড়ে গিয়েছিল, আরে তাই তো! পাঁচু ছাড়া এ কীর্তি আবার কার? জীবন্তীবাজারে পাঁচু এ কারণে বিখ্যাত। জেনেশুনেই জায়গা দেওয়া হয়েছে তাকে—নিতান্ত মায়ার বশে। অত সুন্দর ছেলেটা শুধু মারধোর খায় আর টো টো করে ঘোরে! হয়ত নেয় তুচ্ছ সামান্য কিছু জিনিস—মার খায় অসামান্য। ও রাতের চোর নয়,—ওর প্রকৃতি ভিন্ন। যাকে বলে হাত-লপকা, কিঞ্চিৎ ছিঁচকেমি মাত্র। তার জন্যে দত্তরা ওর মুখে রক্ত তুলে দিচ্ছিল দেখে ঝোঁকের মুখে সোনাবাবু—কতকটা জেদেও বটে, ওকে নিজের বাড়ি এনে রেখেছিল। টুকিটাকি ফরমাস খাটবে আর থাকবে। অল্পস্বল্প সখআহ্লাদ বা সাজপোশাক যা লাগবে, দেবে। তিনকূলে কে আছে, হদিস নেই। ছেলেবেলায় কোন লরির ড্রাইভার ওকে কোত্থেকে এনে এখানে নামিয়ে দিয়েছিল, সেই থেকে এখানে ও বেঁচে আছে। মুখ দেখলে মায়া হয়—কী একটা আছে ওর মুখে। লোকে জ্বালায় পড়ে মারেও যত, ভালবাসেও ততখানি। আর পাঁচুও জীবন্তী ছেড়ে কোথাও যাবার নাম করে না। সোনাবাবু ভেবেছিল, মানুষের এই একটা ব্যাপার আছে। ঘর পাওয়ার ব্যাপার। মানুষের জীবনটা কেবল ঘর খোঁজার তালেই কেটে যায়। ভাগ্যে কারুর মিলে গেলে তার আর নড়া হয় না—গাছের মত শেকড় বসিয়ে স্থির থেকে যায় আমরণ। পাঁচু তার ঘর পেয়েছে। সেই ড্রাইভারকে তার প্রণাম করা উচিত। ...আর আমি? আমি সোনাবাবু কি পেয়েছি? পেলাম ঘর? পাগল! ও ঘর তো সতীর। সতী তাই নিশ্চিন্ত—পাঁচুর মতই।

হ্যাঁ, পাঁচু ঘড়ি ফেরত দিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। হেসে না ফেললে হয়ত কবুল করানো যেত না। দিব্যি তলপেটের কাছে ঝুলিয়ে রেখেছিল প্যান্টের আড়ালে। বলল, মজা দেখছিলাম এতক্ষণ।

ওই কথাটা না বললে মার খেতো না সে। এমন কি সতীও দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখত না। সতীর হাতে ছিল ঝুলঝাড়াটা—সেই দিয়ে যতখানি পারা যায়, পাঁচুর খারাপ রক্ত বের করা হল। এক ফাঁকে পাঁচু উধাও। তখন খবর গেল গদীতে। সোনাবাবু এল। খুঁজতে বেরল। সতী চোখমুখ লাল করে বসে আছে।

জেনেশুনেই তো বিষ গিলছি। সোনাবাবু বলছিল। স্বগতোক্তি কতকটা। আর একটা ছড়া কাটল শেষে।...বেদের মরণ সাপের হাতে। নির্ঘাৎ!

সন্ধ্যার দিকে সতী যখন রান্না করছে, পাঁচু পাশে বসে ময়রামালির বাড়ি ফুলফলের গাছপালা দেখার কথা বলছে, কারণ ওখানে বসেই সে অবিকল সব দেখতে পাচ্ছে তার খুঁটিনাটি বর্ণনা—সেইসময় একবার হন্তদন্ত সোনাবাবু বাড়ি এল। সোজা ঘরে ঢুকে খুটখাট কী নাড়াচাড়া করে ফিরে গেল। সতীর ওপর তখন থেকে সম্ভবত কিঞ্চিৎ অভিমান—কী রাঁধবে বলেনি সে।

সোনাবাবুর চলে যাওয়া দেখে পাঁচু বলে, কী হল দাদাবাবুর?

সেদ্ধডিমের খোসা ছাড়াচ্ছিল সতী। চোখ তুলে তাকায়। কী হবে?

পাঁচু কেমন হাসে।... কেমন যেন! খুব তোলপাড়—জলে ঢিল পড়ে দেখেছ?

সতী গম্ভীরমুখে বলে, তুই দেখিস, তাহলেই হবে। আদিখ্যেতা।

এ বেলা খাঁকি একটা হাফপ্যাণ্ট পরেছে পাঁচু। গায়ে একসাইজ গেঞ্জী। উবু হয়ে বসে আছে—হনুমানের মত। ফরসা উরু বা হাঁটুর নীচে অব্দি কালচে লোম। সতী চোখ

ফিরিয়ে নেয়। কোমর কটকট করছে সারাটা দিন। সকাল থেকে বিকেল ওই ঝামেলা—পাঁচুর পাত্তা ছিল না। রান্না হয়ে গেলে শোবে একবার। তখন টিপিয়ে নেবে। সতী হঠাৎ চমকে উঠল। পাঁচু তার দিকে তাকিয়ে আছে এতক্ষণ! কী দেখছে?

চাউনি দেখে পাঁচু আমতা হাসে। বলে, দাদাবাবুর কথা ভাবছি।

সতী ধমকায়।...খুব ভাবুক তুই!

হ্যাঁ। দাদাবাবুকে মোমবাতির মতন লাগছে। কেন গো বউদি?

কিসের মত?

মোমবাতি।

মুহূর্তে হেসে গড়াগড়ি সতী। বড় মজার-মজার কথা বলে ছোঁড়াটা। হাঁরে, এতসব শিখলি কোথায়?

গুরুমশায়ের পাঠশালায়। পাঁচুর সপ্রতিভ জবাব।

সে আবার কোথায়? সতীর সকৌতুক প্রশ্ন ফের।

পাঁচু বলে, জানো বউদি—আমি যা ইচ্ছে দেখতে পাই। এই যে তুমি বসে রয়েছ, কথা বলছ—পষ্ট দেখছি তোমার মনটা।

সতী বলে, ইস! কই, বল তো কী দেখছিস?

তুমি—তুমি আজ অনেকক্ষণ কোমর টেপাবে। কিন্তু আমার হাতের আঙ্গুল মেরে ফাটিয়ে দিয়েছ—এই দ্যাখো না—পাঁচু দেখায়। তারপর বলে, তাই ভাবছ। আর...

আর কী রে?

দাদাবাবু কাল একগাদা টাকা এনেছেন গদী থেকে—বালিশে ভরা আছে। ভাবছ, তাই তো পেঁচো রয়েছে...

কী বললি? সতীর হাতের কাজ কাজ থেমে গেছে।

হুঁ। আমি জানি।

জানিস? দেখেছিস?

হুঁউ।

সতী চুপ করে যায়। গত পরশু, নন্দলাল গদীতে নেই, ক্যাশের টাকা এনে রেখেছে সোনাবাবু। বুদ্ধি করে বালিশের ভিতর রাখাই সঙ্গত মনে করেছিল ওরা। কিন্তু তাও পাঁচু টের পেল কোন মন্ত্রবলে?

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ডিমের খোসা ছাড়িয়ে সতী ওঠে। পা বাড়াতে গিয়ে কি ভেবে এনামেলের গামলায় একটা থালা চাপিয়ে দেয়। তারপর বলে, গুঁড়ো হলুদ ফুরিয়েছে। এক্ষুনি এনে দে। এই নে পয়সা।

পাঁচু উঠে কাঁচুমাচু মুখে বলে, পাঁচটা পয়সা দেবে?

সিগ্রেট খাবি তো? সতী চোখ পাকায়।...ওই থেকে নিস। আর দ্যাখ, পটলীর মাকে একবার ডেকে দিস। বলিস, ভীষণ দরকার, বউদি ডাকছে। এক্ষুনি। কেমন?

কিছু সন্দেহাকুল দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে পাঁচু বেরোয়। সতীর বুকে হাতুড়ি পড়ছিল। কী সুন্দর চাউনি—অথচ এ কী চোখ ছেলেটার? যেন হৃৎপিণ্ডটা দেখছে ধুকধুক করতে। আর তার হাত? সেও কম ডাকাত নয়। অনেক গভীরকে ছোঁয় যেন। সেই তো কোমর টেপার আরাম!

ঘরে ঢুকে আগে বালিশ নিয়ে পড়ে সতী। ওয়াড় খুলে ক্ষিপ্র হাতে তুলোর ওপরটা টেপে। এক...দুই...তিন...চার...পাঁচ! ঠিক সাজানো আছে বাণ্ডিলগুলো। ভাগ্যিস নেয়নি! বেডকভারের নীচে বালিশটা ঠেসে দিয়ে (ওটা সোনাবাবুর বালিশ) সে বেরিয়ে আসে। দরজায় তালা দেয়। চাবির গোছা ব্লাউজের ভিতর রাখে।

তবু অনেকক্ষণ বুক কাঁপে সতীর। জ্বরোভাব সর্বাঙ্গে—এ কী অচেনা আড়ষ্টতা—মাথা ধরা বমির উদ্রেক। বড় বিচ্ছিরি একটা অস্বস্তি!

একটু পরেই পাঁচু এল। নিজের মনে হলুদের কৌটো খুলে প্যাকেটের হলুদ ঢালে সে। ঢালতে ঢালতে বলে, পটলীর মাকে কেন? আবার বাবার বাড়ী যাবে নাকি? সর্বনাশ!

সতী মধ্যে মধ্যে বাবার বাড়ী গেলে পটলীর মা এসে থাকে। রান্না বান্না কাজ কর্ম করে। সোনাবাবু তো কুটো ভেঙ্গে দুটো করবে না—এমন গোঁফখেজুরে মানুষ। পাঁচুর প্রশ্ন শুনে সতী মুখ টিপে হাসছে। বলে, গেলে তোর খেতে দেতে কষ্ট হয় নাকি রে?

হাত দুটোয় বিকট গলাটেপা ভঙ্গী করে পাঁচু বলে, হাত নিসপিস করে। মাইরি বউদি!

নিসপিস করলে দাদাবাবু তো আছেন।

মাথা নাড়ে পাঁচু। বলে, ধুস! শুধু হাড়—মটমট করে যে!

সতী কেমন হাসে নিষ্পলক তাকিয়ে। কথা বলে না।

পাঁচু তিরিক্ষি গলায় বলে ওঠে, হেসো না—গলা জ্বলে যায়!

জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে সোনাবাবু দেখছে—টেবিল বাতির অল্প আলোর মৃদু আভা ঘরে, উপুড় হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে সতী, পীঠে হাঁটু গেড়ে বসেছে অসুরের মত চিরকিশোর পঞ্চানন্দ, এবং ফাটা আঙ্গুলে সাবধানে পিকচঞ্চু অস্থিটিতে চাপ দিচ্ছে। ঘন ঘন করে নোংরা ফ্যানটা ঘুরছে বিছানার ওপর। শরতের প্যাচপ্যাচে গরম। নন্দলালের সবিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া ঘুমানো দায় হত। আর ওই পেঁচোটা—চোর ছ্যাঁচোড় যাই হোক, না জুটলে অনেক অশান্তি থাকত জীবনে। এখন তো মোটামুটি সুখী সোনাবাবু। সুখী—তবে নিশ্চিন্ত নয়। হতে পারছে না নিশ্চিন্ত। ওই তো সতী আরামে ঘুমিয়ে গেল হয়ত, গভীর ঘুম তার—সোনাবাবুর ঘুম কুরে খায় সে এক অদ্ভুত ঘুণপোকা। কটাস কটাস শব্দ ওঠে মাথার ভিতর দিকে।

পা দুটো ক্রমশ অতিষ্ঠ। সোনাবাবু ডাকল, পাঁচু আয়। পাঁচু মুখ নামিয়ে বউদির মুখটা পরীক্ষা করে উঠে এল পাশের শরীরে। পায়ে হাত দিলে সোনাবাবুর চমক লাগছিল আজ। হাত-লপকা ছিঁচকে ছেলে—কত কী হাতিয়ে নিতে পটু। সতী যেমন, তেমনি তার স্বামীরও কত হালকা তুচ্ছ জিনিস মেরে দিচ্ছে কে না জানে!

কিছুক্ষণ পরে ভারী গলায় সোনাবাবু ডাকে, পাঁচু?

উঁ?

ধর, আমরা যদি কোথাও চলে যাই, তুই আমাদের সঙ্গে যাবি?

টেপা থামিয়ে পাঁচু একটু হাসে।...কোথায় যাবেন?

যেখানেই যাই—তুই কি যাবি?

কবে?

আজই। বলতে গলাটা কেঁপে যায় সোনাবাবুর। অতিকষ্টে ফের বলে, একটু পরেই।

পাঁচুর হাত চলে। শুধু মাথা নাড়ে।

সোনাবাবু চমকে ওঠে।.....যাবিনে তুই?

নাঃ।

একটু ইতস্তত করে সোনাবাবু বলে, যদি তোর বউদি বলে যেতে?

তাও না। পাঁচুর সোজা জবাব।

কেন যাবিনে বল তো?

পাঁচু নির্দ্বিধায় বলে, আপনারা টাকা মেরে পালাচ্ছেন যে। ওরে বাবা!

মুখের ওপর আচমকা মুগুর খেয়ে সোনাবাবু চুপ। ভোঁতা নাকে শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়। রক্ত ঠাণ্ডা একেবারে। পা গুটিয়ে নিয়ে বলে, শো গে যা। তোর মন যাচাই করছিলাম—বুঝলি পাঁচু? তুই আমাদের কতটা ভালবাসিস—মেপে দেখছিলাম।

তবু বেজার মুখে পাঁচু চলে যায়। বাইরে বারান্দায় খাটিয়া আছে। সেখানেই শোবে সে। মশারিও দেওয়া আছে। পরস্পর দয়া করেই মানুষ বেঁচে আছে পৃথিবীতে।

দরজায় খিল এঁটে সোনাবাবু ডাকে—ঘুমোলে?

সতী ঘুমকাতুরে হলেও ঘুমোয়নি আজ। বলে, না।

শুনলে তো কথা?

শুনলাম। কিন্তু হঠাৎ ওকে এসব আজেবাজে কথা বলবার কী দরকার হল আবার?

ইচ্ছে গেল বলতে। যদি—ধরো যদি, তাই হত!

তার মানে? সতী সাপের মত ফণা তোলে।

আমতা জবাব দেয় সোনাবাবু—না, মানে—এমনি বলছিলাম। এমন হতেও তো পারত!

আদিখ্যেতা!...ব'লে সতী পাশ ফেরে। পাশ ফিরেও রাগ পড়ে না। ফের বলে, তুমি খুব নীচমনা! কান না করে সোনাবাবু বিষণ্ণকণ্ঠে বলে, থাক, কালই টাকাটা জমা দিয়ে আসব সদরের আড়তে। নন্দ তো আজও ফিরল না। এমন করে ব্যবসাতে লালবাতি জ্বলে যাবে। একা আর কতদিক সামলাই!

তারপর দুজনে পাশাপাশি শুয়ে থাকে কিছুক্ষণ। এবার সতীর গলা শোনা যায়।...শুধু টাকা দিয়ে আসা নয়, কালই বিদেয় করো ছোঁড়াটাকে—নৈলে মাথা খুঁড়ে মরব বলে দিচ্ছি।

সোনাবাবু বলে, পাগল! ওকে একটু রয়েসয়ে নিও—ছেলেমানুষ তো! এবং মনশ্চক্ষে একখণ্ড সবুজ মখমল ঘাসে ঢাকা জমির ওপর একটা সুন্দর চিতাবাঘের বাচ্চাকে আপনমনে খেলা করতে দ্যাখে। গা ছমছম করে সোনাবাবুর। রাগ হয়—আবার ভালোও লাগে।

বেঙ্গমা-বেঙ্গমির গপ্প

বেঙ্গমি বলে, ও বুড়ো! জেগে আছ কি!

বেঙ্গমা বলে, আছি।

ছেলে আসছে।

মেয়েটা?

আসবে'খন। না এসে পারে?........

ধনুকবাঁকা ঝিলের ধারে বিশাল এক বটের গাছ। অজস্র-ঝুরি নামিয়ে শেকড়বাকড় ছড়িয়ে মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকের ডালপালায় স্বাধীনতার ব্যাপ্তি। এই চৈত্রে চিকন পাতাগুলি আবহমণ্ডল থেকে কার্বনকণিকা শুষে নিচ্ছে ফেটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায়। আর এ গাছেই বাস করে দুই আদ্যিকালের পক্ষী।

পুরাবিদ স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এই বটতলা থেকেই কুড়িয়ে নিয়ে যান নাকভাঙা একটি মৌর্যযুগের বুদ্ধমূর্তি। এখনও টুকরো-টুকরো পাথর আটকে আছে শেকড়ের তলায়। এখানে-ওখানে ছড়ানো লাইমকংক্রিটের চাপড়ায় বসে ক্ষেতমজুররা দিনদুপুরের জিরেন এবং পান্তা খায়। গুঁড়ির ভেতর খাঁজে-ফোকরে আরও চাপ-চাপ লাইমকংক্রিটের চাপড়া বেয়ে আঁকাবাঁকা একটি ঢেমনা সাপ একবার ওপর একবার নিচে জ্বলজ্বলে চোখে কিছু খোঁজে। কিছু ভেবে কুল পায় না, উঠবে নাকি নামবে। কখনও সে দারুণ চমক খেয়ে কোটরে লুকিয়ে পড়ে। তীরধনুক নিয়ে ওই এগিয়ে আসে কষ্টিপাথরে গড়া এক মানুষ। অতি নিঃশব্দ তার হাঁটাচলা। হঠাৎ ঝুঁকে সে কুড়িয়ে নেয় আধপোড়া ফিল্টারটিপড একটি সিগারেট। আনমনে ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুলের ভেতর কানের ওপরদিকটায় সেটা গুঁজে রাখে। তারপর মুখ তুলে ডালপালার ভেতর পাখি খোঁজে। কিছুক্ষণ পরে হতাশ সেই কষ্টিপাথর মানুষটি নিচের ঝিলের দিকে নেমে যায়। ঝিলের ধারে-ধারে হাঁটতে থাকে। ঝিলের জলে শাকতোলানি মাছধরুনি মেয়েদের ভিড় দিনমান। আকলুর মেয়ে গৌরবা, গরবিনীকে বাংলার ছয় ঋতুর জলকাদা রোদবৃষ্টি শীত এভাবেই অপভ্রষ্টা করে ফেলেছে, হাঁসের মতো ডুবে-ডুবে গুগলি তোলে। রাতকানা বাপকে সে রোজ গুগলির ঝোল খাওয়াবেই। এদিকে তার রাতকানা বাপের স্বভাব, বিকেল হলেই ঠুকুস ঠুকুস করে খেয়াজাল আর খালুই হাতে ঝিলের দিকে আসবেই। তখন গৌরবা স্টেশনবাজারে হারাধনবাবুর বাড়ি কোমরে আঁচল বেঁধে দুপুরের এঁটো থালাবাসন মাজছে। বাড়ি ফিরতে ঝিলের ওপারে বাবলাবনের কাঁধে নাদুসনুদুস চাঁদবাবুর দেখনহাসি রূপ। ঝিকমিকোচ্ছে ঝিলের জল জ্যোৎস্নাগুঁড়ো মেখে। ঝপাস করে ব্যর্থ শেষ জাল ফেলে আকলু বলে, ধুস শালা! রাতকানা মানুষ বটে, ঝিলের তল্লাটে ইঞ্চি-ইঞ্চি মাটি মুখস্থ তার। পাড় বেয়ে ঠিকই ওপরে উঠে যায় এবং সঠিক পা ফেলে সঠিক দিকেই হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরে। রাতকানা হওয়ার পর তার বাড়তি একটি ইন্দ্রিয়ের আঁকুর গজিয়েছে। জীবজগতের খুব ভেতরদিকের, এমন কী জীবন্মৃত্যুর সীমান্তরেখাটিও তার চেনা হতে চলেছে। এক নতুন মানচিত্র তার সামনে যাচ্ছে খুলে। সাপের মতোই মাটিতে পায়ের

শব্দের স্পন্দন প্রতিধ্বনিত হয় তার ওই অতীন্দ্রিয়জাত বোধে। সে হাঁক দিয়ে বলে, কে যায় গো?

আমি।

চাপা, রুক্ষ, বিরক্ত এই শব্দটি রাতকানা লোকটিকে কোমল ও বিনীত করে। সে গোপনে হেসে বলে, ছোটবাবু নাকি? সনজেবেলা চললেন কতি গো ছোটবাবু?

যেখানেই যাই, তোমার কী?

আকলু ধীবর অভিমানে চুপ করে যায়। আবার ঠাহর করে পা ফেলে। চষা মাটির চাঙ্গড়ে কদিন আগেকার এক কালবোশেখি একটুখানি বর্ষে গেছে। তাই মুখিয়ে উঠেছে হাতিশুঁড়ো, কুকুরশুঁকো দুব্বোঘাসের ছানাপোনা। থপথপিয়ে পা ফেলে অভিমানী ধীবর ভিজে জাল আর খালি খালুই হাতে বাড়ি ফেরে।

আর বাড়ি ফিরেই গৈরবার মুখোমুখি পড়ে বকা খায়। মরবে, তুমি মরবে। হয় কালে ডংশাবে, নয়তো ভূতপেরেতে ঘাড় মটকাবে।

আমোদিনীও গালমন্দ দেয় মরদকে। শেষে বলে, স্বভাব যাবে কতি?

আকলু গ্রাহ্য করে না। খ্যা খ্যা করে হাসে। তা মরণ যখন আসবে, আসবে। তবে কথা কী, লোচনবাবুর ছেলেটা উদিকে কতি যায়, বুঝি না। পেরায় সনজেবেলা দেখি বুড়োতলাবাগে যাচ্ছে।

গৈরবা আস্তে বলে, যে-যেখানে যাক, তুমার কী? মুখ খিল এঁটে বসে থাকোদিকিনি।

তবু আকলু বলে, বড় খটকা লাগে।.....

সুবচনী দাওয়ার কোণায় উনুনে শুকনো পাতা ঠেলে দিচ্ছিলেন। টগবগিয়ে ভাত ফুটছিল এনামেলের হাঁড়িতে। রোজ রাতে রুটিই খাওয়া হয়। নেহাত কোনও রাতে দিনের বাড়তি ভাত। আজ দুপুরে কাটোয়া থেকে দেওর অবনী হাজির। শিউলির জন্য আবার পাত্র ঠিক করেছে। দেওয়া থোওয়ার বালাই নেই। মেয়ে পছন্দ হলেই তুলে নিয়ে যাবে।

অবনীকে তার বিশ্বাস হয় না সুবচনীর। এই নিয়ে তিন-তিনবার কথা আনল। কিন্তু কোথায় কী? আসলে কুরুখণ্ডীতে আপিসের কী কাজে এসেছিল। মা-মেয়ের অন্নে ভাগ বসিয়ে গেল। আর খায়ও বটে অবনী। অবেলায় আবার কে ভাত বসাবে? শিউলি বলে গেছে সন্ধ্যাবেলা, রাত্তিরে আজ ভাত চাই মা। আলুভাত তো আলুভাতই!

সন্ধ্যার দিকে একটা টিউশনি জুটিয়েছে শিউলি স্টেশনবাজারে। দিনকাল খারাপ। তার ওপর এই পাড়াটায় বিদ্যুৎ জোটেনি। জীর্ণ একতলা দালানবাড়ি আর মাটির ঘরে ঠাসা। ফাঁকে-ফোঁকরে পোড়ো ভিটেয় আগাছার জঙ্গল। মেয়ের জন্য মাঝে উদ্বেগ বোধ করেন সুবচনী। কিন্তু বললেই তো বলবে, টর্চ আছে না?

টর্চের আলোয় সামনেটা দেখা যায়। পেছনে কী আছে কেমন করে দেখতে পাবে শিউলি! কিন্তু ওকে কিছু বলতেই আজকাল ভয় পান সুবচিনী। দিনে-দিনে তার মেজাজ কেমন রুক্ষ হয়ে উঠেছে। টিউশনির টাকায় সংসার চালাচ্ছে বলেই কি এমন মেজাজ হবে মেয়ের? ওর বাবা ছিলেন প্রাইমারি শিক্ষক। বড় তক্কবাজ মানুষ ছিলেন পাঁচুগোপাল। তেমনি জেদী রাগীও। এতকাল পরে মেয়ের মধ্যে যেন বাবার সেই খর মেজাজটি জেগে উঠেছে।

ভাঙা পাঁচিলের আব্রু ঢেকেছে যে-বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি, তার ওপর ফিকে জ্যোৎস্না এসে ধাক্কা দিল। সেইদিকে তাকিয়ে গা ছমছম করল সুবচনীর। এখনও শিউলি ফিরছে না কেন?....

বেঙ্গমি ডাকে, ও বুড়ো! জেগে আছে কি?

বেঙ্গমা বলে, আছি।

মেয়েটা আসছে।

কৈ, দেখি! দেখি!....

বরুণের সিগারেটের আগুন জুগজুগ করেছিল। দূর থেকে দেখে শিউলি মিটিমিটি হাসে। চমকে দেবে নাকি সেদিনকার মতো ঝুরির আড়াল থেকে? পরে ভাবে, থাক। ভূতপেরেতের ভয় না মেনে বুড়োতলায় তার জন্য এমন করে যে এসে অপেক্ষা করে, তার সঙ্গে জোক করা ঠিক নয়। ভয় তো প্রথম-প্রথম শিউলিরও করত। তারপর কেটে গেছে। সন্ধ্যারাতের মাঠ পেরিয়ে ঝিলের ধারে বুড়োতলায় আসতে তার একটুও গা বাজে না। বরং কী এক আবেগ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় বটগাছটির দিকে। সে অভিসারিকা। অভিসারিকারা রাতবিরেতে ভয় পায় না।

হাল্কা জ্যোৎস্নায় ছায়ামূর্তি দেখে বরুণ সিগারেট ঘষটে নিভিয়েছে। ছায়ার দিকে সরে গেছে একটুখানি। তারপর সে চিনতে পারে। সাড়া দিয়ে বলে, কী? এত দেরি যে?

শিউলি বলে, স্টেশন ঘুরে এলাম।

কেন?

রোজ এক রাস্তায় আসি আর আকলুবুড়োর চোখে পড়ি! বুঝেও না বোঝার ন্যাকামি করো খালি!

ধুস! ও ব্যাটা রাতকানা জানো না?

শিউলি এদিক-ওদিক তাকিয়ে গুঁড়িয়ে পেছনদিকটায় যায়। সেখানে গাঢ় ছায়া। বলে, কী হল? এখানে এস।

তোমাকে দেখতে পাব না ওখানে। মনে হবে অন্য কেউ।

বরুণ ছায়ায় ঢুকে শিউলির মুখোমুখি দাঁড়ায়। শিউলি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, অন্য কেউ! তাহলে অন্য কেউও আছে তোমার?

ধুস! তুমি মাইরি জোক বোঝো না! বরুণ প্রেমিকের গলায় ফের বলে, চাঁদের আলোয় তোমাকে দেখলে দারুণ লাগে। বিলিভ মি—মাকালীর দিব্যি!

সে তার প্রেমিকাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। একটুখানি ছটফটানির পর প্রেমিকাটি শান্ত হয়। প্রেমিকের চুম্বন গ্রহণ করে। তারপর আস্তে বলে, বসো এখানে। দুষ্টুমি কোরো না।

প্রেমিক তার প্রেমিকাকে দু' হাতে তুলে নেয়। নগ্ন শক্ত মাটিতে শুইয়ে দেয়। প্রেমিকা বলে, আঃ! পিঠে ব্যথা করছে।

প্রেমিক বলে, চুপ! এখন কথা বলে না।

আমি বলব। আমার অনেক—অনেক কথা আছে বলার।

মনে-মনে বলো। আমি মনে-মনে শুনি!...

বেঙ্গমি বলে, লজ্জা করে না উঁকিঝুঁকি মারতে? সরে এস দিকিন।

বেঙ্গমা বলে, বুড়ো হয়েছি। আজকাল তত নজর চলে না।

বেঙ্গমি আনমনে বলে, আমার এ পোড়া চোখের দোষ!

কেন গো?

মেয়েটাকে দেখি, আর খালি ভাবি এ কাকে দেখছি!

কাকে বলো তো?

তোমার বড় ভুলো মন! মনে পড়ে না সেই ঘুঁটেকুড়ুনি মেয়ে আর রাজপুত্তুরের কথা?

বেঙ্গমা শ্বাস ফেলে বলে, হুঁ।....

নিচের ঘরে একটি কালার টিভি ঘিরে মৌমাছির মতো ঝাঁক। কাছের সদর শহরে রিলেসেণ্টার বসেছে। তবে কলকাতা আসে না। সটান দিল্লি এসে ঝলমলায়। ইংরিজি বকবকানি থাকলেই চ্যানেল পাঁচে ঢাকা এসে পড়ে। বাংলা গান শোনো প্রাণ ভরে। ইংরিজি ছবি দ্যাখো। কথাবার্তা না বুঝলেও কাণ্ডকারখানা দেখে তাক লেগে যাবে।

ওপরের ঘরে লোচনবাবু সিগারেট টানছিলেন। সামনে ইতিহাসের শিক্ষক এবং শ্যালক ভবচরণ। তাঁর হাতেও সিগারেট। খাট ওপর বসে আছেন গৃহিনী অনুপমা। পা দুখানি ঝুলন্ত এবং স্থির। কচরমচর করে পান চিবুচ্ছেন। দাদার দিকে সপ্রশংস চাউনি। পায়ের তলা দিয়ে গলিয়ে এসে নাদুসনুদুস বেড়ালটি তুড়ুক করে খাটে উঠলে অনুপমা তাকে আদরে কোলে তুলে নিলেন। তার কোমল পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কী একটা বললেন স্বামীর উদ্দেশে। কথাটায় কান করলেন না স্বামী।

শ্যালক বললেন, মেয়েটা গ্রাজুয়েট। বাবার একমাত্র সন্তান। ব্যাপারটা বুঝলে তো?

ভগ্নিপতি হাই তুলে বললেন, রাধু উকিলকে আমি চিনি না ভাবছ নাকি?

তাহলে আর কথা কী?

আছে।

অনুপমা মুখ বাঁকা করে বললেন, ঠং! অর্থাৎ ঢং।

লোচন বিরক্ত হয়ে বললেন, পিণ্টু যে স্কুলফাইনাল! তারওপর এ পাড়া গাঁয়ে—

কথা কেড়ে ভবচরণ বললেন, কুরুখণ্ডী আর পাড়াগাঁ আছে? আর স্কুলফাইনাল টাইনাল কথা নয়। রাধুবাবু রাজি। আসলে একটুখানি খুঁত, গায়ের রঙ। নাকমুখের গড়নও চমৎকার। তবে তার চেয়ে বড় কথা, রাধুবাবুর কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তি—সবই পিণ্টু পাবে। টাউনে তিন-তিনখানা বাড়ি। গঙ্গার ধারে নতুন যে বাড়িটা করেছেন, দেখলে মনে হবে লণ্ডন না প্যারিস!

লোচন অট্টহাসি হেসে বললেন, তুমি খালি—

খালি নয়! ক্ষুব্ধ ভবচরণ বললেন। খালি-টালি ছাড়ো তো তুমি। ফোটো তো দেখলে মেয়ের। কী অনু, মেয়ে দেখতে খারাপ?

বালো—কুব বালো! অনুপমা বললেন। ডাগর বেড়ালটি এবার ঝুপ করে লাফিয়ে গিয়ে লোচনের পায়ের ফাঁকে বসল।

লোচন বললেন, পিণ্টু কী বলছে শুনেছ নাকি? দেখিয়েছে পিণ্টুকে?

ভবচরণ বললেন, দেখিয়েছি। বলেছে, ভেবে দেখবে। তবে ওর দায়িত্ব আমার।

দ্যাখো ভবদা—লোচন আস্তে বললেন, আমার কেন যেন সন্দেহ হয়!

কী কী, ঝুঁকে এলেন ভবচরণ।

মানে—পিণ্টুর ভাবগতিক ভাল ঠেকছে না।

কেন, কেন?

কেমন যেন....ঠিক বোঝাতে পারলেন না লোচন। গলার ভেতর বললেন, কী একটা—

টামো! গৃহিণী গর্জন করলেন। মুখ থেকে পানের কুচি ছিটকে পড়ল। অধরোষ্ঠ হাতের চেটোয় মুছে ফের বললেন, ঠবটাটেই টোমার ঠন্দ!

রুষ্ট কর্তা বললেন, আগে মুখের ভেতর থেকে আবর্জনাগুলো ফেলে এসে কথা বলো দিকি। কী বলে ঠ ঠ করে।

গৃহিনী হেসে ফেললেন। তারপর ধুপসধাপুস শব্দে মোজককরা মেঝেয় শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন। মুখের আবর্জনা ফেলতেই গেলেন।

ভবচরণ ভুরু কুঁচকে চাপা স্বরে বললেন, পিণ্টু কোথাও প্রেমট্রেম করছে নাকি?

লোচন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, আই ডাউট।

মেয়েটি কে জানতে পেরেছে?

বেড়ালটিকে প্রায় লাথি মারার ভঙ্গীতে হটিয়ে লোচন ফিসফিসিয়ে বললেন, গেনু,—আমাদের গেনু আর কী! বুঝেছি। বলো

গেনু বলছিল, ছোটবাবু রোজ সন্ধ্যাবেলা বুড়োতলায় যায়।

বেশ তো। তাতে কী হয়েছে?

তুমি চিনতে না। পাঁচুমাস্টার—মানে পাঁচুগোপাল ছিল আমার ক্লাসফ্রেণ্ড। প্রাইমারি টিচার ছিল। বছর দুই আগে স্ট্রোকে মারা গেছে। তার একটি মেয়ে আছে। দেখতে-শুনতে মন্দ না। সেও স্কুলফাইনাল পাশ। খুব শার্প বুদ্ধিসুদ্ধিতে।

কাস্ট?

লোয়ার কাস্ট। সে ব্যাপারে গণ্ডগোল তো আছেই, তাছাড়া তোমার বোনকে তো চেনো।

অনু জানে?

মথা খারাপ? ওকে বলতে গিয়ে হিতে বিপরীত হোক।

ভবচরণ একটু ভেবে বলেন, কাস্ট-ফাস্ট আজকাল অবশ্য ফ্যাক্টর নয়। কিন্তু অবস্থা?

বুড়ো আঙুল নাড়েন লোচন। সেদিকে ঢু ঢু। রোজ দেখি, আমাদের বাগান থেকে পাঁচুর বউ শুকনো পাতা কুড়িয়ে জড়ো করছে। বুজলে না? কয়লার পয়সাও জোটে না।

ভবচরণ নড়েচড়ে বসেন। শক্ত মুখে বলেন, তোমার ঘরে তিন-তিনটে মেয়ে। খেয়াল আছে? তাদের বেলায় কে স্যাক্রিফাইস করবে, বলো? ব্যবসাতে লস খেয়ে ফতুর হতে বসেছিল। সন্টু পঁয়তাল্লিশ হাজার নগদ এনে দিল—এই শর্মার জোরে। নয় কী না বলো?

তুমি ঠিকই বলেছ ভবদা!

এখন তোমার পেট্রল পাম্প, ময়দাকল, ধানকল—আবার শুনলাম সণ্টু বলছিল, ঘানিকলও বসাবে।

লোচন ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলেন, তুমি একটু বোঝাও না পিণ্টুকে। আমার খালি ভয় করে, ভেতর-ভেতর রেজিস্ট্রি করে থাকলে তো কেলেঙ্কারি!

দেখছি। ভবচরণ আশ্বাস দিলেন। মুখটা বেজায় গম্ভীর। ফের সিগারেট ধরালেন। নেতাজির ছবির দিকে দুটি জ্বলজ্বলে চোখ।.......

বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি রাতের হাওয়া আর জ্যোৎস্নায় ভূতে-পাওয়া এলোকেশী মেয়ের মতো দুলছে আর দুলছে। দাওয়ায় বসে সুবচনী প্রতীক্ষা করছিলেন মেয়ের। বাড়ি ঢুকতেই ক্ষীণস্বরে বলেন, এত রাত করে রে?

শিউলি জবাব দেয় না। কুয়োতলায় যায়। ঢনঢন শব্দে বালতি নামায়।

সুবচনী বলেন, কেন! ভুটুবাবুকে বলে সকালবেলা টিউশনির ব্যবস্থা করতে পারিস নে?

শিউলি জলের শব্দে কণ্ঠস্বর মিশিয়ে বলে, প্রাইমারি সেকশন মর্নিংয়ে জানো না?

সুবচনী চুপ করে থাকেন। উঠোনে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে তার ভিজে শাড়ি মেলে দিচ্ছে শিউলি নজরে পড়লে অবাক হয়ে বলেন, চান করলি নাকি?

নাঃ। পিচরাস্তায় জলকাদা জমে আছে। ট্রাকের চাকা থেকে—ড্রাইভারগুলো আজকাল বড্ড....টুকরো টুকরো সব বাক্য। শায়াব্লাউজ-পরা শিউলি ভঙ্গীতে ঘরে ঢোকে। ঢোকার সময় দাওয়া থেকে লণ্ঠনটিও নিয়ে যায়।

একটু পরে শাড়ি বদলে বেরোয়। বলে, কাদায় ভূত করে দিয়েছে একেবারে। সব কাচতে থেকে লণ্ঠনটিও নিয়ে যায়।

একটু পরে শাড়ি বদলে বেরোয়। বলে, কাদায় ভূত করে দিয়েছে একেবারে। সব কাচতে হবে সায়াটাও।

সুবচনী বলেন, কুয়োতলা ভিজিয়ে রাখ বরং। সকালে কেচে দেব'খন।

শিউলি ফের কুয়োতলায় যায়। সুবচনী জানেন, মেয়ের যা জেদ। কথা না বাড়ানোই ভালো তবে পিচরাস্তার অবস্থা কী হয়েছে স্বচক্ষে দেখেছেন। কদিন আগে কলাবোশেখি এসে ঝরঝরিয়ে গেছে। খানাখন্দ জলকাদায় ভর্তি। ওদিকে তাহের কন্ট্রাক্টার জিপ হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে। ওই রাস্তা তারই তৈরী। তাহেরের বাবা ছিল চাষাভুষো লোক। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। কিন্তু অমন ঘরের অমন ছেলের রাতারাতি আঙুল ফুলে কী করে কলাগাছ হল, ভেবেই পান না সুবচনী। শিউলির বাবা বলতেন, তাহের পয়সা করেছে আসলে টেস্টরিলিফের সময়। পেমাস্টার হয়েছিল। ভুয়ো নামে চাল-গম বিলি হত। সেই চাল-গম রাত্তিরে ট্রাকে করে চালান যেত। স্বচক্ষে দেখেছি।

শিউলি শাড়ি ব্লাউজ মেলে দিচ্ছিল জ্যোৎস্নায়। বুড়োতলার মাটি এত ভেজা ছিল বুঝতে পারেনি। সুবচনী বলেন, আয়! ভাত বাড়ি।

কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না মা!

সে কী? দারুণ চমকে ওঠেন সুবচনী। তুই-ই তো বলে গেলি, রাত্তিরে আজ ভাত খাবি।

ভুটুবাবুর বাড়ি আজ কী যেন ব্রত-টত ছিল। একগাদা লুচি-আলুরদম, দুটো রসগোল্লা—মা, তুমি খেয়ে নাও! লক্ষ্মীটি।

তুই অন্তত দুমুঠো মুখে দে।

উঁহু! অম্বল হবে। একে তো অম্বলের ঠ্যালায় অস্থির। রোজ একগাদা করে অ্যান্টাসিড খাচ্ছি।

সুবচনী দাওয়ার কোণা ঘিরে তৈরী রান্নাঘরে ঢোকেন। লম্ভের দম বাড়িয়ে দেন। মেয়েটা অম্বলে ভুগছে কিছুদিন থেকে। গতকাল দুপুরে কুয়োতলায় ওয়াক তুলছিল।

অন্ন মুখে তুলে চিবুতে গিয়ে কিছুক্ষণ থেমে থাকেন সুবচনী। হঠাৎ—খুবই হঠাৎ মনে হয়, মেয়ের মধ্যে কী একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন চোখে পড়ছে যেন। সবসময় আনমনা ভাব। ঠোঁট কামড়ে ধরে বারবার। আজ সকালে খিড়কির ডোবার ধারে একলা বসে ছিল। ডাকলে মুখটা একটু ফেরাল। চোখের ভুলই কি? চোখ ভিজে মনে হচ্ছিল।

হয়তো বাবার কথা মনে পড়েই কাঁদে। সুবচনীর মায়ের মন হু হু করে ওঠে। অন্ন রোচে না। আঁচিয়ে এসে দ্যাখেন, লণ্ঠনের দম কমিয়ে তক্তাপোষের বিছানায় শুয়ে আছে পাশ ফিরে।

সুবচনী আস্তে বলেন, ট্যাবলেট নেই? অম্বল বোধ করলে—

সুবচনী থেমে যান। শিউলির পিঠটা কাঁপছে। দম-কমানো লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট বোঝা যায়। পাশে বসে পিঠে হাত রেখে বলেন, কী হয়েছে মা?

অমনি মেয়েটা ঘুরে মায়ের উরুর ওপর মাথা কোটে।.....

বেঙ্গমি বলে, ও বুড়ো! ঘুমোলে নাকি?

বেঙ্গমা বলে, নাঃ।

বুঝলে কিছু?

কী বুঝব? বুঝেই বা লাভ কী?

মেয়েটার পেটে বাচ্চা এসেছে।

সে কী কথা?

ন্যাকামি কোরো না তো! অতক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি হল, কানে ঢোকেনি?

বড্ড হাওয়া দিচ্ছে আজ।

চোতমাসে হাওয়া দেবে না রাতবিরেতে? তবে কথা কী, আমার কান মেয়ের কান।

কী বলছে ছেলেটা?

কী সব ইংরিজি বলছে, বুঝতে পারিনি। লোকেরা বড় খটমটো কথা বলে আজকাল।

তাহলে চুপ করে থাকো।

পারছি না গো! আমার বড় জ্বালা যে!

কেন গো?

মেয়ে হলে বুঝতে। তুমি যে পুরুষ।.......

ঝিলের দিক থেকে আবার ছুটে আসে চৈত্ররাতের হাওয়া। জ্যোৎস্নাগুঁড়ো মেখে ঝলমল করে ঝিলের বুক। চাঁদ এখন বুড়ো বটের কাঁধের ওপর। ওপারের ভরাটচর জমিতে বাবলা আর হিজলের জঙ্গল। সেদিকে কোথাও ডেকে ওঠে এক নিঃসঙ্গ হট্টিট্টি পাখি—টি টি টি! .....টি টি টি! বেঙ্গমী চাপা শ্বাস ছেড়ে বলে, বোকা মেয়েটা!.....

ভবচরণ ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন। স্টেশনের নির্জন ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে পুবের মাঠের দিকে তাকিয়ে বলেন, ঝিলে আজকাল আগের মতো হাঁসটাস আসে?

বরুণ আনমনে বলে, নাঃ!

ভবচরণ শহরের স্কুলে ইতিহাসের শিক্ষক। উদাত্ত কণ্ঠস্বরে বলেন, প্রাচীনযুগে গঙ্গা ওখান দিয়ে বয়ে যেত। ঝিলটি তারই স্মৃতিচিহ্ন। বুঝলে তো?

বরুণ ঝুঁকে সমান্তরাল রেললাইন দ্যাখে। কথা বলে না।

ইতিহাসের শিক্ষক বলেন, স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহামের নাম শুনেছ। বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। আমার লেখা এই জেলার ইতিহাস বইখানি অন্তত পাতা উল্টে দেখো। এই গ্রামের নাম ছিল কুলখাঁড়ি। সবে রেললাইন পাতা হয়েছে। স্টেশনের নামও দেওয়া হয়েছে কুলখাঁড়ি। স্টেশনমাস্টার ছিলেন। এক অ্যাংলো সায়েব—তখন বলা হত ইউরেশিয়ান। তো সেই সায়েবেরও খুব হিস্ট্রির বাতিক ছিল। তাঁর কাছে খবর পেয়ে ছুটে এলেন স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম। তিনিই অনেক স্টাডি করে বললেন, কথাটি আসলে কুরুখণ্ড—অপভ্রংশে কুরুখণ্ডী এবং তস্য অপভ্রংশে কুলখাঁড়ি। র ল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

হাহা করে হাসেন জেলার ইতিহাস লেখক। ফের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলেন, ইদানিং শুনছি, গঙ্গার মজাখাতের ওপারে নাকি বুনোকুলের জঙ্গল ছিল। আর খাড়ি নাকি খাত। সেই থেকে কুলখাঁড়ি। তাছাড়া রাঢ়ের লোকেরা সব তাতেই চন্দ্রবিন্দু বসাতে সিদ্ধহস্ত। হাঁসপাতাল বলে, জানো তো? ভাগ্যিস ইতিহাস বলে না!

বরুণ দেখতে পায়, দূরে কালো হয়ে একটি ট্রেন বা মালগাড়ি আসছে। কালো বৃত্তাকার গতিশীল বন্ধুটিকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখে তার গা ছমছম করে। সে কথা বলে না।

ইতিহাসের শিক্ষক জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলেন, আজকাল সব ফোক-স্টাডিওলা

জুটেছে। সদ্য গোঁফগজানো ছোকরা। এঁড়ে তক্ক করে বলে কী জানো? কথাটা কুলখাঁড়িই হবে। আবার জেলা-সমাচার কাগজেও কয়েকটা চিঠি বেরিয়েছে পড়লাম। এক মুসলমান ভদ্রলোক লিখেছেন, আসলে কোন এক পাঠান জায়গিরদার কুলি খাঁর নামে নাকি নাম। একজন লিখেছে, কথাটা হবে কলুর খাড়ি। কোন এক কলুভদ্রলোক নাকি গঙ্গার ওই মজা খাত ইজারা নিয়েছিলেন নবাববাহাদুরের কাছে। আচ্ছা, বলো তো পিণ্টু, কলুভদ্রলোক কি মজা খাত থেকে তৈলনিষ্কাশন করার জন্য—মানে, খাতে জলের বদলে তেল ....খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা!.....

সেই হাসি ঝড়ের মুখে ছেঁড়া পাতার কুচি উড়ে যাওয়ার মতো উড়ে গেল, ভেসে গেল ছত্রখান হয়ে। কামরূপ এক্সপ্রেস এসে ঢুকল প্ল্যাটফর্মে। ইতিহাসের শিক্ষক তবু দমে গেলেন না। ভাগ্নের কাঁধে স্নেহের থাবা হাঁকড়ে সবকিছু কোলাহল, ওভারব্রিজের কাঠের প্রচণ্ড কম্পন ও স্পন্দন, ধাবমান মানুষজনের ভিড়ের ভেতর স্বকীয়তা ও নির্জনতায়

নিজেদের কোণঠাসা করে নিয়ে তিনি কানে ফুসমন্তর দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, ওটা কুরুখণ্ডীই হবে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর পরাজিত এক পলাতক কুরুরাজপুত্র এখানে এসে বাস করেছিলেন। কুরুরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। যোদ্ধার জাত। তোমরা সেই ক্ষত্রিয় কুরুকুলজাত। ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট। তোমরা ফাইটার বংশ। হাজার-হাজার বছরের ফাইটিং ট্রাডিশান তোমাদের।

বরুণ মুখ তোলে। বিকেলের শেষ উজ্জ্বলতা ওভারব্রিজটিকে হঠাৎ জ্বালিয়ে দিতে থাকে। তার মুখে সেই জ্বালা সেই আকস্মিক তীব্রতার ঝকমকানি। মামার চোখে চোখ রাখে সে। তার মাথার ভেতর 'ফাইটিং ট্রাডিশন' কথাটি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আর তারপর ইতিহাসবিদ চোখে ঝিলিক তুলে বলেন, কী পিণ্টু? পারবে তো ফাইট দিতে পাঁচুগোপালবাবুর মেয়ের জন্যে?

বরুণ আস্তে বলে, পারতাম। কিন্তু বাবা যদি বা কিছু না বলেন, দাদা কেলেঙ্কারি বাধাবে। দাদা এখন এরিয়ার লিডার। সব গুণ্ডামস্তান ওর হাতে।

আহা, আফটার অল তুমি তার সহোদর ভাই!

বরুণ একটু চুপ করে থাকার পর বলে, শিউলির বাবা দাদার বেপার্টির লোক ছিলেন। দাদার বিরুদ্ধে পিটিশন করেছিলেন। দাদা জানতে পারলে খুব বিপদ হবে মামাবাবু!

হুঁ, তাহলে এটা একটা প্রব্লেম। ইতিহাসবিদ মামাবাবু সমব্যথী কণ্ঠস্বরে বলেন। বাই দা বাই, গোপনে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করোনি তো?

করছি।

করেছ? ভবচরণ ভুরু কুঁচকে বলেন ফের, কবে করেছ?

গতমাসে।

হুঁ। ভবচরণ ভাগ্নের কাঁধ আঁকড়ে পা বাড়ালেন। সত্য উদঘাটনে সমর্থ হয়েছেন, মনের ভেতর সেই জয়গৌরব কানায়-কানায় উপচে উঠছে। ভাগ্নেবাবাজি তাঁর ফাঁদে এত সহজে পা দেবে, ভাবতে পারেননি।

আর বরুণ ভাবছিল ভাবছিল তাহলে সে ফাইটার বংশ! দেবে নাকি একটা দুর্দান্ত ফাইট? কয়েক পা এগিয়ে ডাকল, মামাবাবু?

উঁ! অন্যমনস্ক মামাবাবু সাড়া দিলেন।

যদি আমি শিউলিকে আপনার বাসায় রেখে আসি?

থমকে দাঁড়ালেন মামাবাবু। গলার ভেতর বললেন, টু রুম ফ্ল্যাটে থাকি। কোনওরকমের ঠাসাঠাসি বসবাস। আমারও বড় প্রব্লেম বাবা! প্রচণ্ড প্রব্লেম-অফ স্পেস।

বরুণ শক্তগলায় বলে, কলকাতা-টলকাতা পালিয়ে যেতাম। কিন্তু তাহলে শিউলির মায়ের ওপর জুলুম হবে! সেই ভেবে সাহস পাচ্ছি না।

ওভারব্রিজ থেকে সিঁড়িতে নামতে নামতে ভবচরণ বলেন, সাংঘাতিক প্রব্লেম! ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস।

নিচে প্ল্যাটফর্মে নেমে বরুণ বলে, আমি এখন এক জায়গায় যাব, মামাবাবু!

হুঁ।

প্লিজ মামাবাবু, এখনই বাবা-মায়ের কানে যেন কথাটা তুলবেন না!

উঁ হুঁ হুঁ! ভবচরণ শক্ত মুঠোয় খপ করে ভাগ্নের হাতের কবজি ধরলেন। এর একটা নিষ্পত্তি করে ফেলা দরকার। তুমি এস আমার সঙ্গে।

বলে খ্যা খ্যা করে হাসেন। কুরুবংশ ফাইটার। এস—দেখি, কেমন ফাইট দিচ্ছ!

আশা-নিরাশায় কুরুবংশীয় যুবাপুরুষ মাতুলকে অনুসরণ করে।......

বটবৃক্ষের ডালে বসে বেঙ্গমি ডাকে, ও বুড়ো, ঘুমোলে নাকি?

বেঙ্গমা বলে, জেগে আছি।

মেয়েটা কখন থেকে বসে আছে।

তা তো দেখছি!

ছেলেটা এখনও আসছে না।

আসবে'খন। না এসে পারে?

দোতলার সেই ঘরে বসে হতবাক চারটি মুখ। একটি মুখ ঝুলে আছে, থুতনি গলার খাঁজে গোঁজা। পর্দার পেছনে আরও একজন। কোলে খোকামণি। চাঁদমামা দেখাচ্ছে খোকামণিকে। কিন্তু কান দুটি ঘরের দিকে ওত পেতে আছে।

অনুপমা কচরমচর পান চিবুচ্ছিলেন। কোলে নাদুস বেড়ালটি বারবার ওঠার চেষ্টা করছে। ঠেসে সরিয়ে দিচ্ছেন। শেষে উচ্চারণ করলেন, ঠণ্টুকে—

লোচন বললেন, চুপ। ওর কানে তুলো না।

ভবচরণ ম্লানহাস্যে বললেন, মণ্টুর চেয়ে প্রব্লেম হল তোমার ফ্যামিলির। তোমাদের রুর‍্যাল সোসাইটিতে এ জিনিস মেনে নেবে না—আই নো দ্যাট ভেরি ওয়েল।

লোচন বললেন, তা আর বলতে?

অনুপমা হাত নেড়ে বললেন, টা না।

পাটাকুড়োনির মেয়েকে আমি ঘরে টুলতে ডেব না।

বিরক্ত লোচন বললেন, মুখের রাবিশগুলো ফেলে এসো দিকি। তাপরে কথা বলো।

সুতরাং হাসলেন অনুপমা। বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বড় বউমা খোকাকে চাঁদমামা দেখাচ্ছে। খোকা কুঁই কুঁই করছে। নিচের উঠোনে মুখের রাবিশ ফেলে ফিসফিসিয়ে বললেন, শুনেছ বউমা—পিণ্টু.....

জয়া ঝটপট বলল, শুনেছি।

চলো, তোমার ঘরে চলো। সণ্টুকে গিয়ে বলি, বিহিত করুক শিগগির।

শাশুড়ি-বউ বারান্দা ধরে হাঁটতে থাকলেন। পুবদক্ষিণ কোণায় বউমার ঘর।.....

এ-ঘরে চুপচাপ তিনটি পুরুষমানুষ। শিলিং ফ্যান চক্কর খাচ্ছে। নিচের ঘর থেকে টিভির হিন্দি গান আবছা শোনা যাচ্ছে।

ভবচরণ সিগারেট অ্যাশট্রেতে ঘষে নেবালেন। বললেন, আমি বলি কী, সিচুয়েশন যখন এমন ক্রিটিক্যাল, তখন ফ্যামিলির স্বার্থে, এমন কী নিজের স্বার্থেও পিণ্টু স্যাক্রিফাইস করুক।

বরুণ মুখ তুলল। মামাবাবুর দিকে তাকাল।

মামাবাবু বললেন, তুমি মেয়েটিকে পরিত্যাগ করো পিণ্টু!

লোচন বললেন, রেজিস্ট্রি করে বসে আছে যে হতভাগা!

রাধু উকিল আছে। ভেবো না। ভবচরণ আশ্বাস দিলেন। পিণ্টু ডিভোর্সের পিটিশান করুক।

গ্রাউণ্ড?

গ্রাউণ্ড ক্যারেক্টার। মেয়েটি ব্যাডক্যারেক্টার।

হাসলেন লোচন।...কিন্তু তাহলে রাধুবাবু কি আর পিণ্টুর সঙ্গে মেয়ে দিতে চাইবেন?

হঁউ—চাইবেন।

কী সব বলো ভবদা! বিরক্ত মুখে লোচন বললেন। জেনেশুনে—

কথা কেড়ে ভবচরর বললেন, দেবে। কারণ মেয়ের একটুখানি খুঁত আছে—ভেবেছিলাম পরে বলব। এখনই বলে ফেলি। একখানা পা একটুখানি—মানে জন্ম থেকেই আর কী!

খোঁড়া?

না—না। খোঁড়া বলতে যা বোঝায়, তা ঠিক নয়। ভবচরণ তেড়েমেড়ে বললেন, ওই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য লক্ষ বর পেতে আছে। লুফে নেবে। কেন—তা তো আগেই বলেছি। লক্ষপতি লোক রাধু উকিল। শুধু দোষের মধ্যে বড্ড সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক। বড্ড খুঁতখুঁতে। কিন্তু আমার বলতে গেলে বুজম ফ্রেণ্ড। সারা টাউনে একমাত্র আমাকেই বিশ্বাস করে। এদিকে পিণ্টুর চেহারা ভাল। একেবারে ফিল্ম হিরোর মতো দেখতে। নিজের ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখো! দ্যাখো, দ্যাখো!

মামা ভাগ্নের নিচু মুখটিকে সজোরে উঁচু করে ধরেন দুই হাতে। পিণ্টু চোখে দুটো নিচু করে। কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করে। বলতে পারে না।

আর সেই সময় পর্দা তুলে তরুণের আবির্ভাব ঘটে। রাগী মুখ। নাসারন্ধ্র স্ফীত। ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকে, পিণ্টে!

বরুণ শুধু বলে, কী?

তরু এসে তার গালে চড় মারে। ভবচরণ ঝটপট মাঝখানে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বলে, কী হচ্ছে সণ্টু! ছিঃ!

সরে যান মামাবাবু। ওকে আমি মেরে শেষ করে ফেলব।

চড় খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল বরুণ। জোরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। তরুণ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, কালই দুই বেশ্যামাগিকে গ্রামছাড়া না করে ছাড়ছি না।

লোচন বলেন, আঃ! বড্ড বাড়াবাড়ি করিস বাপু তুই। খালি তিলকে তাল—

তুমি থামো! বাবাকে ধমক দেয় ছেলে। বাবা কাঁচুমাচু মুখে বসে থাকেন।

লোচন বড় ভাগ্নের দুই কাঁধ দরে বসিয়ে দেন খাটের ওপর। চাপা স্বরে বলেন, যা কেলেঙ্কারি হবার হয়েছে। আর মাথা ভাঙলেও তা ঘোরানো যাবে না। মাঝখান থেকে থানা পুলিশ হবে। কেলেঙ্কারিতে ঢিঢি পড়ে যাবে। তার ওপর কাগজ ওলারা বড়-বড় হরফে খবর ছাপবে; ওয়েস্টবেঙ্গলে এখনও কাস্টিজম? এ কি বিহারমুল্লুক হয়ে গেল?

বাবা সণ্টু, মাথা ঠাণ্ডা রেকে এগুতো হবে। তাছাড়া তুমি একজন পলিটিসিয়ান—পলিটিক্সে নেমেছ। সাবধানে পা না বাড়ালে তোমার পলিটিক্যাল কেরিয়ারটিরও বারোটা বেজে যাবে।

পলিটিসিয়ান বড় ভাগ্নের নাকের ফুটো ফুলে-ফুলে ওঠে। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ে।

অনুপমা ঘরে ঢুকে আর্ত চেঁচান, পিণ্টু অমন করে বেরিয়ে গেল কোথায়? তোমরা দ্যাখো—ওকে আটকাও গিয়ে। কী করে বসবে বাছা আমার ঝোঁকের বশে।

হু হু করে কাঁদেন ছেলের মা। তাঁর বিজ্ঞ দাদা বলেন, দেখছি। আমি দেখছি ওকে।

ভবচরণ বেরিয়ে যাবার সময় শ্যালককেও সঙ্গে নিয়ে যান। অনিচ্ছা সত্বেও শ্যালক ভারি শরীর বহন করে পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকেন।

রাস্তায় গিয়ে ভবচরণ বলেন, তোমাদের সেই পাঁচুবাবুর বাড়ি যাওয়া যাক। দেখি, কিছু নিষ্পত্তি করা যায় নাকি। পিণ্টু সম্ভবত সম্ভবত সেখানেই গেল। চলো, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো আমাকে।

সুবচনী দাওয়ায় বসে ছিলেন লণ্ঠনের দম কমিয়ে। লোচনবাবুর সাড়া পেয়ে চমকে ওঠেন। লোচনবাবুর সঙ্গে এক তাগড়াই চেহারার ভদ্রলোক। হকচকিয়ে বলেন, সুবচনী, কী হয়েছে?

ভবচরণ সহাস্যে বলেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনার। ইয়ে—পিণ্টু আছে নাকি?

সুবচনী আরও অবাক হয়ে বলেন, পিণ্টু? না তো! সে তো আমাদের বাড়ি কখনও আসে না।

লোচন বলেন, কেন মিথ্যা বলছ বাপু?

আপনার দিব্যি দাদা! সুবচনী হাঁসফাস করে বলেন। বিশ্বাস করুণ আপনার ছেলে—

কথার ওপর কথা রাখেন ভবচরণ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা একটা ইমপর্ট্যান্ট কথাবার্তা। বলতে এসেছি আপনার সঙ্গে। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে তো বলা যাবে না!

সুবচনী হঠাৎ শক্ত হয়ে ওঠেন। আস্তে বলেন, আসুন।

দাওয়ায় একখানি কম্বল বিছিয়ে দেন সুবচনী। শ্যালক-ভগ্নীপতি তাতে উপবেশন করেন। পদচতুষ্টয় দাওয়ার নিচে দোদুল্যমান হয়। ভবচরণ একটু হেসে বলেন, আপনার মেয়েকে ডাকুন!

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় সুবচনী বলেন, শিউলি তো নেই। ভুটুবাবুর বাড়ি টিউশনি করতে গেছে।....

বেঙ্গমি বলে, ও বুড়ো! দ্যাখো, দ্যাখো!

বেঙ্গমা নিচে উঁকি মেরে বলে, কী? ছেলেটা এল বুঝি এতক্ষণে?

বেঙ্গমি ফিসফিস করে বলে, না, না।

তবে কী হয়েছে?

মেয়েটা ইট-পাটকেল কুড়িয়ে জড়ো করছে।

সে কী? কেন বলো তো?

অই মা! পরনের শাড়ি খুলে ইটগুলান পুঁটুলি করে বাঁধছে যে! আমার বুক কাঁপছে।

কিছু বোঝা যায় না। কী হচ্ছে বলোদিকি?

দ্যাখো, দ্যাখো! ঝিলবাগে নেমে যাচ্ছে মেয়েটা!

তাই তো।......

বেঙ্গমী শ্বাস ফেলে। বেঙ্গমা শ্বাস ফেলে। চৈত্ররাতের একটা দমকা হাওয়া এসে সেই শ্বাসকে মিশিয়ে নেয় নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসে। ঝিলের ওপারে হিজল বাবলার ডালপালা বেয়ে এতক্ষণে চাঁদ পৃথিবীর শিয়রে দাঁড়াল। একলা হট্টিট্টি পাখিটা ডাকতে লাগল ট্টি ট্টি ট্টি....ট্টি ট্টি ট্টি। ঝিলের জলে জ্যোৎস্নাগুঁড়োর ঝিলিমিলি। আকলু ধীবর কখন বাড়ি ফিরে গেছে। আজ ধীবরবুড়ো গুটিকতক মৌরালা পেয়েছিল। তার ঘরে আনন্দলহরী।.......

বেঙ্গমি বলে ওঠে, ও বুড়ো! জেগে আছ কি?

বেঙ্গমা বলে, আছি। কী হয়েছে?

ছেলেটা আসছে।

অ।

কিন্তু মেয়েটা ইঁটের পুঁটুলি নিয়ে কোথায় গেল? কেন গেল?

আমার বড় ভয় করো গো!

আমারও।.......

বরুণ হনহন করে এগিয়ে আসে বুড়োতলায়। চাপা স্বরে ডাকে, শিউলি! কোনও সাড়া পায় না। সে ছায়ার ঢুকে পড়ে। শেকড়বাকড়ে টোক্কর খেতে খেতে বারবার ডাকে, শিউলি! ও শিউলি! শিউলি একরাতে এমনি লুকোচুরি খেলেছিল। আজ আর লুকোচুরির রাত নয়। সে বারকতক ডাকাডাকি করে জ্যোৎস্নায় ফেরে। শিউলি তাহলে তার দেরি দেখে বাড়ি ফিরে গেছে। বরুণ আনমনে চাঁদের দিকে তাকায়। শিউলি বলেছিল, ভাবা যায় না ওই চাঁদে মানুষ হেঁটেছে। সত্যিই ভাবা যায় না। শিউলি ঠিকই বলেছিল, হয়তো এ চাঁদ সে-চাঁদ নয়। ঠিকই বলেছিল।

আরেকবার ডাকবে ভাবে বরুন। ঠোঁট ফাঁক করে। কিন্তু ডাকে না। বরং সোজা শিউলিদের বাড়ি চলে যাবে। ওর মায়ের সামনে সব কথা খুলে বলবে। সে যদি কুরুবংশীয় হয়, সে যদি হয় ফাইটার—কেন ফাইট দিতে ভয় পাবে? আর যদি ভয় পায়, তাহলে মামাবাবুর ওই ইতিহাস মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে!

চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে বরুণের। সিগারেট ধরায়। হঠাৎ কেন বাতাস থেমে গেল! নিসর্গের গভীর থেকে ভেসে আসতে থাকল শ্রুতিপারের সব আশ্চর্য ধ্বনিপুঞ্জ। জীবন্মৃত্যুর সীমান্তরেখা থেকে কেউ কিছু বলার চেষ্টা করছে কি? বরুণ চষা নরম মাটিকে গুঁড়ো করে দিতে দিতে হাঁটতে থাকে।

গৈরবা এখন স্টেশনবাজারে হারাধনবাবুর বাড়ি দুপুরে এঁটো থালাবাসন মাজছে। ধীবরবুড়ো তার বউকে পরোয়া করে না। তাছাড়া গত সন্ধ্যায় মৌরলামাছের ঝোল দিয়ে

পান্তা খেতে খেতে আমোদিনী বলেছিল, ঝিলে এখনও বেরৎ-বেরৎ মাছ আছে। রাতবিরেতে ঘাই মারে শোনোনি?

আকলু জাল ফেলে। ঝপাস করে শব্দ হয়। এখানটায় গভীর খাত। দহ হয়ে আছে। কাল সন্ধ্যায় এখানেই মৌরালা পেয়েছিল। ঝিলের জলে দিনশেষের ছায়া। জলমাকড়সা তরতরিয়ে সাঁতার কেটে বেড়ায়। কিন্তু জাল কিসে আটকে গেল যেন! টানাটানি করে বুড়োধীবর। দম ফুরিয়ে যায় জাল টানতে। জালখানি ছিঁড়লে তার কী হবে?

তবু মরিয়া টানাটানি করতে থাকে। একটু পরে জাল গুটিয়ে আসে। এত ভারি কেন বুঝতে পারে না। কিনারায় জাল গুটিয়ে আসতেই একখানি ফিকে হলুদ হাত তার চোখে পড়ে। মানুষের হাত! তারপর কালো চুল একরাশ। আকলু থরথর করে কাঁপে। জালে মানুষ ধরা পড়েছে। মেয়েমানুষ!

বটের শেকড় নেমে এসেছে পাড়ের মাটি বেয়ে অজগর সাপের মতো। কাঁপা-কাঁপা হাতে খেয়াজালের মুঠোর দড়ি সেই শেকড়ে বাঁধে আকুল। এদিক-ওদিক তাকায়। দিনশেষে কেউ কোথাও নেই।

সে হাঁচড়-পাঁচড় করে পাড়ে ওঠে। থপথপিয়ে হাঁটে গ্রামের দিকে। এক্ষুনি খবর দিতে হবে। মরা মেয়েমানুষের চেয়ে তার জালখানির দাম তার কাছে অনেক বেশি।......

বেঙ্গমি ডাকে, ও বুড়ো। জেগে আছ কি?

বেঙ্গমা বলে, আছি, কী হয়েছে?

মেয়েটার জন্য মন কেমন করে গো!

হুঁ—আমারও।

দ্যাখো, দ্যাখো!

কী?

ছেলেটা আসছে!

এসে আর কী করবে? চুপচাপ বসে খালি সিগারেট টানবে।

ছেলেটার জন্য বড় কষ্ট হয়, জানো?

হুঁ—আমারও!.....